রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা
দ্বিতীয় খন্ড
আব্দুস সালাম মিতুল

রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা

(দ্বিতীয় খন্ড)

আবদুস সালাম মিতুল

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

মগবাজার, ঢাকা।

পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা

(দ্বিতীয় খন্ড)

আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশনায়ঃ
এ এম আমিনুল ইসলাম
প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স
মোবাইলঃ ০১৭১১ ১২৮৫৮৬, ০১৫৫২ ৩৫৪৫১৯

প্রকাশকালঃ
প্রথম প্রকাশঃজুন'১৯৯৭ইং
পঞ্চম প্রকাশঃজানু'২০০৯ইং
ষষ্ঠ প্রকাশঃআগষ্ট'২০১২ইং

মুদ্রণেঃ
ক্রিসেন্ট প্রিন্টিং প্রেস

ISBN NO. 9843114260

বিনিময় মূল্যঃ ১২০.০০ টাকা মাত্র ।

ROKTA PISSEL PATHER JATREE JARA BY ABDUS SALAM MITUL PUBLISHED BY PROFESSOR'S PUBLICATIONS, BORO MOGH BAZAR, DHAKA-1217. PRICE TK. 120.00 ONLY.

লেখকের কথা

মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রহমতে "রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যারা" নামক বইটির প্রথম খন্ড এবং দ্বিতীয় খন্ড পাঠকদের খেদমতে পেশ করতে পেরে মা'বুদের দরবারে আলীশানে শত কোটি শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। ইতিপূর্বে আমার লিখিত "রক্তাক্ত '৭১—ঘাতক কে"? বইটি সংগত কারনেই ছদ্মনামে প্রাকাশ করেছি। ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্ব নেতা নবী (স) এবং তাঁর সাহাবীবৃন্দ (রাঃ) ও ইসলামের অন্যান্য মর্দ্দে মুজাহিদদের বাতিল শক্তির সাথে সংগ্রাম মুখর বিশাল ইতিহাসের ছিটে ফোটা কাহীনি "রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যারা" নাম দিয়ে প্রথম খন্ড এবং দ্বিতীয় খন্ড আমার স্বনামেই পাঠকদের নিকটে নিবেদন করলাম।

বইটির পান্ডুলিপি প্রণয়নে যিনি গভীর রাত পর্যন্ত প্রচণ্ড ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে অসুস্থ শরীর নিয়ে আমাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা দান করেছেন তিনি হলেন আমার সহধর্মিনী মাকছুদা আক্তার মিতা। আমি তাঁর জন্যে এই দোয়া—ই করি, আল্লাহ যেন তাকে আখেরাতে জান্নাত দান করেই তাঁর শ্রমের বিনিময় দেন।

বইটি লেখা ও প্রকাশ করার যাবতীয় সরঞ্জামাদী সরবরাহ করে যিনি সহযোগীতা করেছেন তিনি হলেন প্রফেসর'স বুক কর্ণারের সত্বাধিকারী বন্ধুবর এ, এম, আমিনুল ইসলাম। আমি রাব্বুল আলামিনের দরবারে এই কামনা—ই করছি, তিনি যেন আমাকে ও ভাই এ, এম, আমিনুল ইসলামকে তাঁর দ্বীনের জন্যে কবুল করে শাহাদাতের মর্যাদা দেন।

আর পাঠকদের খেদমতে নিবেদন করবো, এই বইটি পড়ে ইসলামী আন্দোলনের উত্তপ্ত ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে যদি সামান্যতম অনুপ্রেরণাও লাভ করেন, তাহলে আমার মরহুম আব্বাজান এবং মরহুমা বড় আম্মাজান ও মরহুমা আম্মাজানের জন্যে মহান আল্লাহর কাছে একটু দোয়া করবেন, আল্লাহ তাদেরকে যেন জান্নাত নছিব করেন।

পৃথিবীর সমস্ত মুসলমানেরা-ই আল্লাহর জান্নাতের পিয়াসী। পক্ষান্তরে জান্নাতে যাবার পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়- কন্টকাকীর্ণ। জান্নাত লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হলো, নবী (সঃ) এর আদর্শ নিজ জীবনে বাস্তবায়ীত করা ও পৃথিবীতে বাস্তবায়ীত করার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা করা। মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (রঃ) পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন যে দায়িত্ব নিয়ে, সে দায়িত্ব তিনি (সঃ) আঞ্জাম দিয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেছেন।

নবী (সঃ) এর অবর্তমানে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা এবং তা কায়েম রাখা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরজ তথা অবশ্য করণীয়। একথা আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ইসলামী আন্দোলন আমরা কিভাবে এবং কতটুকু আঞ্জাম দিচ্ছি তার উপরই নির্ভর করবে আমাদের দুনিয়ার ও আখেরাতের মুক্তি। যদি আমরা যথার্তই এই মহান আন্দোলনের সেবক হতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হবে নতুবা এই দুনিয়ার জীবনও হবে গ্লানিকর এবং আখেরাতের ময়দানে শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। এই আন্দোলন করতে গিয়ে কি ধরনের পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে হবে তার দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন এই আন্দোলনের নেতা নবী (সঃ) এবং তার ছাহাবীগণ।

বর্তমান সময় থেকে শুরু করে বিগত কয়েক শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীরাও অসংখ্য দৃষ্টান্ত আগামী দিনের ইসলামী আন্দোলনের নেতা কর্মীদের জন্যে রেখে গেছেন ইতিহাসের পাতায়।

আব্দুস সালাম মিতুল

প্রকাশকের অভিমত

আল্লাহর সৃষ্টি এ সুন্দর পৃথিবীতে সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের ইতিহাস অতি প্রাচীন। আল্লাহর অনুগত বান্দাহরা সব সময়ই চেষ্টা করেছে সত্যকে উর্ধে তুলে ধরতে। অন্যদিকে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা সত্যের টুটি চেপে ধরতে চেয়েছে, ফুৎকারে নিভিয়ে দিতে চেয়েছে সত্যের উজ্জ্বল আলোক শিখাকে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী-তারা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। বাতিল শক্তির পৈচাশিক আঘাতে ইসলামী আন্দোলন ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে বিরাট সাহারায় পরিণত হয়েছে। লাখো কোটি মানুষের হৃদয় ইসলামী আন্দোলনের প্রজ্জ্বলিত আলোক শিখায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

সত্যের বাহকদের সাথে বাতিল শক্তির দ্বন্দ্ব শেষ হয়নি-হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত চলবে। ইব্রাহিম (আঃ)-এর সময়ে নমরুদের অস্তিত্ব, মুছা (আঃ)-এর সময়ে ফেরাউনের দম্ভ, মুহাম্মদুর রাছুলুল্লাহ (সঃ)-এর সময়ে আবু জেহেলেদের হুংকার যেমন ছিল আজও মোহাম্মাদ (সঃ) কর্তৃক সূচীত আন্দোলনের ধারক বাহকদের সাথে দ্বন্দ্ব চলছে নব্য নমরুদ, ফেরাউন ও আবু জেহেল, আবু লাহাবসহ অসংখ্য বাতিল শক্তির সাথে। আন্দোলনের বৃক্ষকে সতেজ-সজিব রাখার জন্যে বৃক্ষের গোড়ায় রক্ত সিঞ্চন করে চলেছে আল কোরআনের বিপ্লবী সৈনিকেরা। শহীদ হাসান আল-বান্না, শহীদ আব্দুল কাদের আওদাহ, শহীদ কুতুবের শাহাদাতের ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে।

বালাকোটের শহীদান, শহীদ তিতুমীর ও সিপাহী বিপ্লবের শহীদান এবং এদেশে ১৯৬৯ সনের ১২ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেকের শাহাদাত থেকে শুরু করে গত ২০/৯/৯৩ তারিখে খুলনার বিএল কলেজের মসজিদে নামাযরত অবস্থায় উক্ত কলেজের ইসলামী আন্দোলনের নেতা মুন্সী আব্দুল হালিম, রহমতুল্লাহ, ও আমানুল্লাহ সহ বিগত ২৩/২৪ বছরে অসংখ্য ভাই বোন শহীদ হলেন বাতিল শক্তির হাতে তাদের রক্তদানের

ইতিহাস এবং গত ২৬/৭/১৯৯৪ তারিখে ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার অধ্যাপক গোলাম আযমের জনসভাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের মাটিকে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা শাহাদাতের প্রেরনায় যেভাবে অকাতরে তাদের দেহের তপ্ত শোনিত ধারায় রঞ্জিত করেছে তার ইতিহাস এ কথারই সাক্ষ্য বহন করে, বাংলার জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়মের পথে কোন শক্তিই আর বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না ইনশাল্লাহ।

উপন্যাসিক ও তরুন ইসলামী চিন্তাবীদ এবং লেখক ভাই আব্দুস সালাম মিতুল ইতিপূর্বে জাতির খেদমতে পেশ করেছেন **'রক্তাক্ত '৭১– ঘাতক কে'?** উক্ত বইটি ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে বাতিল শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট বিভ্রান্তি দূর করতে বিরাট ভূমিকা রেখেছে। আমি আশা করি **"রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যারা"** নামক লেখকের দুই খন্ডে সমাপ্ত বইটি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মনে শাহাদাতের অদম্য কামনা সৃষ্টি করে আন্দোলনের অগ্নিঝরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করবে।

লেখক মাত্র ১৩/১৪ দিনে শত ঝামেলায় ব্যস্ত থেকেও যে শ্রম দিয়ে বইটির পান্ডুলিপি প্রণয়ন করেছেন, সে শ্রমের বিনিময় আমি তাকে দিতে পারবো না। এ জন্যে আমি ভাই আব্দুস সালামের মনের আকাংখার সাথে সঙ্গতি রেখেই আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, আল্লাহ যেন তাকে শাহাদাতের মর্যাদায় অভিষিক্ত করেন।

এ, এম, আমিনুল ইসলাম

সূচীপত্র

শহীদি গোলাপের স্নিগ্ধ সৌরভ

ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের কর্মীদেরকে নিজ প্রাণের চেয়েও অধিক আপন মনে করেন। বিপদ মুছিবতে নেতৃবৃন্দ উর্ধ্ব শ্বাসে ছুটে গিয়ে কর্মীদের পাশে দাঁড়ান। সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে কর্মীদের ফেলে নেতারা নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যান না। নেতারা কর্মীদের সাথে নিয়েই সামনের কাতারে থেকে বাতিলের আক্রমণের মুকাবিলা করেন। ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্বনেতা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বাতিল শক্তির আঘাতে রক্তাক্ত হওয়ার পরেও তাঁর প্রিয় কর্মী বাহিনীর খোঁজ খবর নিচ্ছেন।

তাঁর প্রিয় কর্মী জানবাজ মুজাহিদ হযরতে সা'দ ইবনে রাবীর কোন খোঁজ পাচ্ছেন না। তিনি অস্থির হয়ে পড়লেন। মারাত্মক আহত শরীর নিয়ে তিনি নিজে তাঁর প্রিয় কর্মী সা'দের খোঁজে যেতে পারলেন না। সংগঠনের অপর এক কর্মীকে সা'দের সন্ধানে পাঠালেন। তিনি ওহুদের রণপ্রান্তরের কোথাও সা'দের সন্ধান পেলেন না।

অবশেষে শহীদদের লাশের কাছে গিয়ে তিনি হযরতে সা'দ ইবনে রাবীর (রাঃ) নাম ধরে উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করতে লাগলেন। বাতিল শক্তির নির্মম আঘাতে হযরতে সা'দ (রাঃ) মুমূর্ষ অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছেন। তাঁর জিবনী শক্তি প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। নবীর (সাঃ) সাহাবীর ডাকে সা'দ (রাঃ) ক্ষীণ কণ্ঠে সাড়া দিলেন। সাহাবী (রাঃ) তাঁর কাছাকাছি এলে তিনি বললেনঃ

"আল্লাহ রব্বুল আলামীন কোন নবীকে তাঁর অনুসারীদের পক্ষ থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ যে পুরস্কার দান করেছেন, আল্লাহ যেন আমার পক্ষ থেকে প্রিয় নবী (সাঃ) কে তার চেয়েও উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর ইসলামী আন্দোলনের কর্মী মুসলমানদের কাছে আমার এ কথাগুলো পৌছে দিও যে, তাদের একটি প্রাণীও জীবিত থাকতে বাতিল শক্তি যদি নবী (সাঃ) এর কোন ক্ষতি করে, তাহলে আল্লাহর দরবারে তাঁরা তাদের মুক্তির জন্যে কোন অজুহাতই দেখাতে

পারবে না।" এ কথাগুলো বলেই বিশ্ব নবীর (সাঃ) সাহাবা হযরতে সা'দ ইবনে রাবী (রাঃ) শহীদি মিছিলে শামিল হয়ে গেলেন।

রক্তরাঙা দুর্গম পথের নির্ভীক যাত্রী হযরতে সা'দ (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব, গতি প্রকৃতি ও সাংগঠনিক কাঠামো পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি অনুভব করতেন আন্দোলনের শিশু অবস্থায় আন্দোলন যদি নেতৃত্বহারা হয়, তাহলে সে আন্দোলন যৌক্তিক পরিণতি লাভ করে না। শতকোটি কর্মীর প্রাণের বিনিময়েও একজন দক্ষ নেতৃত্ব, সংগঠক তৈরী হয় না। একটা ইঞ্জিন কয়েক শত ট্রেনের বগীকে নিয়ে সামনের দিকে ছুটতে পারে। কিন্তু একটা বগী ইঞ্জিনের সাহায্য ছাড়া তার নিজের স্থান থেকেই নড়তে পারে না।

সংগঠনের মাঠ পর্যায়ের অধিকাংশ কর্মী বাতিল শক্তির নির্যাতনে শহীদ হয়ে গেলেও নেতৃত্ব বর্তমান থাকলে আন্দোলন আবার গতিশীল হয়। নেতা আন্দোলনে প্রাণের স্পন্দন ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে এ জন্যে দেখা যায় তাঁরা নিজের প্রাণের বিনিময়ে হলেও সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে হেফাজত করেন। বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে এ ধরনের ত্যাগের দৃষ্টান্ত অজস্র।

১৯৮৬ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। ভারতীয় জড়বাদী ব্রাহ্মন্যবাদের ঘৃণ্য অনুসারী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নির্লজ্জ ধ্বজাধারীদের কাপুরুষোচিত হামলায় ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসৈনিক ছাত্রনেতা জাফর জাহাঙ্গীর ও বাকী উল্লাহ নির্মমভাবে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তী বছর ১৯৮৭ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম লাল দিঘীর ময়দানে এক ছাত্র গণজমায়েত আহবান করা হয়। তার পূর্বে শহীদি মিছিলের পদভারে কম্পিত বীর চট্টলার আন্দর কিল্লার মোড়ে ছাত্রসভা। শহীদদের সাথীরা ছুটে আসছে গণজমায়েতের দিকে। গণজমায়েতের প্রধান অতিথি ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র শাখার বিপ্লবী সিপাহসালার ডাঃ সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ তাহের।

সংগঠনের ছাত্র কর্মীরা চোখে মুখে ইসলামী বিপ্লবের দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে মিছিল করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। মিছিলের যাত্রীদের অনেকের হাতেই বই পুস্তক। সবার হৃদয়ে শাহাদাতের অদম্য কামনা। তাঁরা কালজয়ী শ্লোগানঃ "মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী, আমরা সবাই মরতে রাজী" ধ্বনি দিয়ে আন্দর কিল্লার মোড় থেকে লাল দিঘীর ময়দানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ইসলামী

আন্দোলনের তরুণ কর্মী হাফেজ আব্দুর রহিম ও আমীর হোসাইন তাওহীদের আওয়াজকে বুলন্দ করার বজ্র শপথে মিছিলে শামিল হয়েছেন।

অগণিত শহীদদের রক্তস্নাত চট্টগ্রামের পবিত্র মাটির বুকে ক্ষিপ্র পদক্ষেপে গগন বিদারী শ্লোগানে রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রীদের বিশাল মিছিল চলেছে লাল দীঘির ময়দানের দিকে। মিছিলের সামনের সারিতে রয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের ছাত্র শাখার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ। আর পিছনে অগণিত শ্লোগান মুখর কর্মীবাহিনী। মিছিলের ডান পার্শ্বে অবস্থিত চট্টগ্রাম শাহী জামে মসজিদ। বাম পার্শ্বে জেনারেল হাসপাতাল। মিছিল ছুটছে সমুদ্রের বিশাল বিক্ষুব্ধ উর্মিমালার মত।

ইসলামী আন্দোলনের গণজোয়ার দেখে জড়বাদী ভারতের ব্রাহ্মণ্যবাদের তল্পীবাহক ধর্মনিরপেক্ষতার আলখেল্লাধারীদের কলিজায় আগুন ধরে গেল। মিছিলের দুর্বার গতি আর গগন বিদারী শ্লোগানের মধ্যে তাঁরা তাদের মৃত্যুর ঘন্টা বাজতে দেখলো। বেছে নিল তাঁরা লজ্জাজনক ঘৃণ্য পন্থা। এ আন্দোলনকে আদর্শিকভাবে মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে বাতিল শক্তি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা মেতে উঠলো হত্যার পৈচাশিক নগ্ন উল্লাসে। আন্দোলনের কর্মীদেরকে সামনা সামনি মোকাবিলার শক্তি তাদের নেই। তাই তাঁরা কাপুরুষের মতই লোকচক্ষুর অন্তরাল থেকে আল্লাহর সৈনিকদের উপরে শুরু করে ঘৃণ্য হামলা। বোমা আর বুলেটের মাধ্যমে তাঁরা স্তব্ধ করে দিতে চাইলো সত্যের বজ্রকণ্ঠ। ষড়যন্ত্রের চোরাগলির অধিবাসী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ইসলামের সৈনিকদের উপরে ছুড়ে দিল মৃত্যুদূত বোমা আর ষ্টেন গানের এক ঝাঁক তপ্ত শিশা। ইসলামী আন্দোলনের তরুণ নেতৃবৃন্দকে শহীদ করা তাদের ঘৃণ্য লক্ষ্য।

ষ্টেন গানের ব্রাশ ফায়ার আর বোমার প্রচন্ড শব্দে চট্টগ্রামের শহীদি রক্তস্নাত মাটি থর থর করে কেঁপে উঠলো। কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল আন্দর কিল্লার মোড়। বাতিলের বোমা আর ষ্টেনগানের তপ্ত শিশার প্রচন্ড আওয়াজকে ম্লান করে দিয়ে অযূত কণ্ঠে তখনো ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' শ্লোগান। ইসলামী আন্দোলনের সুশৃংখল মিছিলে ক্ষণিকের জন্য দেখা দিল বিশৃংখলতা। নেতৃবৃন্দ মিছিলের শৃংখলতা ফিরিয়ে আনায় ব্যস্ত।

তরুণ মুজাহিদ হাফেজ আব্দুর রহিম আর আমীর হোসাইন শহীদি কাফেলার বন্ধুদের সাথে নিয়ে মিছিলের তৃতীয় সারিতে বজ্রকণ্ঠে বাতিলের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে দৃপ্ত কদমে সামনের দিকে ছুটে চলেছেন। ভীতিশূণ্য মন আর শংকামুক্ত তরুণ হৃদয়ে ইসলামী বিপ্লবের স্বপ্ন। দৃষ্টি তাদের সামনের

সারিতে নেতৃবৃন্দের উপর। হাফেজ আব্দুর রহিম দেখতে পেলেন বোমার একটি গোলাকার পিন্ড ছুটে আসছে আন্দোলনের ছাত্র শাখার বিপ্লবী সিপাহসালার ডাঃ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহেরের দিকে।

মূহুর্তেই আব্দুর রহিমের পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। তিনি স্পষ্ট বুঝলেন বাতিলের বোমা- নেতাকে হত্যা করতে ছুটে আসছে। তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন নিজ প্রাণের বিনিময়ে হলেও নেতাকে অক্ষত রাখবেন। তিনি ক্ষিপ্র গতিতে সামনের দিকে ছুটে গিয়ে নেতাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজে বোমাসহ লুটিয়ে পড়লেন। হাফেজে কুরআন আব্দুর রহিমের দেহের উপর প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হলো বোমা। ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল সাহসী তরুণের নশ্বর কান্তি দেহ। পীচ্ঢালা কালোপথ হাফেজে কুরআনের রক্তে লাল হয়ে গেল। কিন্তু তার সুষমা মন্ডিত মুখমন্ডল অবিকৃতই রয়ে গেলো। দেখে মনে হচ্ছে যেন সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপ। পীচ্ঢালা পথে রক্ত শয্যায় শায়িত শহীদি বাগানের লাল গোলাপ হাফেজ আবদুর রহিম। মূহুর্ত পূর্বের বজ্রকণ্ঠ চিরতরে স্তব্দ করে দিয়েছে বাতিলের নিষ্ঠুর বোমা। আরো একটি বোমার আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেহ নিয়ে পীচ্ঢালা কালোপথে লুটিয়ে পড়লেন আমীর হোসাইন। হাত থেকে তাঁর পাঠ্য পুস্তকগুলো ছিটকে পড়লো রাস্তায়। দেহের ক্ষয়িষ্ণু শক্তির সবটুকু একত্রিত করে তিনি শেষবারের মত মাথা তুলে অস্ফুটে বাতিল শক্তিকে যেন বলে গেলেনঃ

আমরা শাহাদাত বরণ করতে জানি কিন্তু বাতিলের কাছে মাথানত করতে জানি না। আমাদের দেহকে বোমার আঘাতে ঝাঁজরা করতে পারলেও কালজয়ী আদর্শ ইসলামকে ঝাঁজরা করতে পারবে না। আমাদের রক্তের প্লাবনে তোমাদের দূর্গের ভিত্তি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়বে আর সেই ধ্বংসস্তুপের উপরে উড়বে মহাসত্য আল-ইসলামের বিজয় পতাকা।

নেতার দৃঢ়তা হিমালয়সম

বাতিলশক্তির আক্রমণের মুখে হুনাইনের রণপ্রান্তরে মুসলিম বাহিনী সাময়িকের জন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। যুদ্ধ প্রান্তরের এক কোণে হযরত ওমর (রাঃ) দাঁড়িয়ে আছেন। হযরত আবু কাতাদাহ্ (রাঃ) তাঁর তরবারী থেকে কাফের সৈন্যের রক্ত পরিষ্কার করতে করতে এসে ফারুকে আযমের কাছে প্রশ্ন করলেনঃ "মুসলিম বাহিনীর অবস্থা কি?" সিংহবীর হযরত ওমর (রাঃ)

আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি অটল বিশ্বাসে অকম্পিত কণ্ঠে বললেনঃ "যা দেখছো, এটাই আল্লাহর ফয়ছালা ছিল।"

বাতিল শক্তির নিক্ষিপ্ত শত সহস্র তীর বৃষ্টির মত ছুটে আসছে। ইসলাম বিরোধী শক্তি মরণআঘাত হানার লক্ষ্যে তাদের রুপালী তরবারী কোষমুক্ত করে ছত্রভঙ্গ মুসলিম বাহিনীর দিকে ছুটে আসছে। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকেই আজকের যুদ্ধের সিপাহসালার নবী সম্রাট জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যেখানে তাঁর বাহনসহ যুদ্ধ পরিদর্শন করছিলেন, এখনো তিনি সেখানেই হিমালয়ের মতই অটল ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন।

বাতিল শক্তির তীর বৃষ্টি তাওহীদের অনড় পর্বত নবী (সাঃ) কে বিন্দু পরিমাণ পিছু হটাতে পারেনি। তাঁর দৃষ্টিতে নেই কোন উৎকণ্ঠা। গোটা মুখমন্ডলে হতাশার বদলে তৌহিদের তরঙ্গায়িত আলোকপ্রভা। মুসলিম শুণ্য রণপ্রান্তরে বাতিল শক্তির বিশাল বাহিনীর দিকে ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নেতার (সাঃ) দৃষ্টি নিবদ্ধ। সে দৃষ্টিতে পরাজয়ের গ্লানির বদলে আল্লাহর প্রতি অবিচল নির্ভরতার দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছে। মৃদুমন্দ সমীরণে ঢেউ খেলা কোমল লতার মতই নবী (সাঃ) এর মাথা মোবারক ডান দিকে সাবলিল ভঙ্গিতে ঘুরে গেল। নেতার (সাঃ) জলদগম্ভির কন্ঠ যুদ্ধ প্রান্তরের প্রতিটি বালুকা বিন্দু, প্রস্তরখন্ড, বৃক্ষ তরুলতা ও পাহাড়-পর্বত অতিক্রম করে তাওহীদের ছত্রভঙ্গ বাহিনীর কর্ণকুহরে প্রবেশ করলোঃ "হে আনসার বৃন্দ!" সমবেত কণ্ঠে আওয়াজ এলোঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আমরা হাজির।" নবী (সাঃ) এর পবিত্র মাথা মোবারক বাম দিকে ঘুরলো। নবুওতী কন্ঠ ইথারে তরঙ্গমালার সৃষ্টি করলোঃ "হে আল্লাহর সাহায্যকারীরা!" বাতিল শক্তির রক্তহীম করা কলিজা কাঁপানো আওয়াজ এলোঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) আমরাও হাজির।"

এমন সময় রাইসুল মোফাচ্ছিরিন হযরত আব্বাস (রাঃ) ছুটে এসে প্রিয় নেতা নবী (সাঃ) এর পাশে দাঁড়ালেন। নবী (সাঃ) তাঁর বাহন থেকে যুদ্ধ ময়দানে অবতরণ করলেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) নবী (সাঃ) এর নির্দেশে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ দিলেনঃ "তোমরা যারা প্রিয় নেতা নবী (সাঃ) এর হাতে হাত দিয়ে বৃক্ষের নীচে শপথ করেছিলে জানমাল দিয়ে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করবে বলে, তাঁরা এখন কোথায়?"

এই হৃদয়স্পর্শী আহবান তাওহীদের সৈনিকদের কর্ণকুহরে প্রবেশের সাথে সাথেই উল্কার গতিতে ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সৈনিকেরা হুনাইনের রণপ্রান্তরে ফিরে এলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ফিরে আসার প্রতিযোগীতায় কেউ ঘোড়া,

ছেড়ে দৌড়িয়ে এলো, কেউবা বর্মের ভার দৌড়াতে বাধার সৃষ্টি করছে বলে বর্ম খুলে ফেলে দিয়ে হালকা শরীরে উল্কার বেগে ছুটে এসে নেতার পাশে দাঁড়ালেন। এবার দুর্বলচিত্ত সৈন্য মুক্ত ইসলামের মুজাহিদ বাহিনী বদরের কালজয়ী রূপধারণ করে প্রচন্ড আক্রমণের মুখে বাতিল শক্তিকে তৃণ খন্ডের মত রণপ্রান্তর ছেড়ে উড়ে যেতে বাধ্য করলেন। নেতার অবিচল দৃঢ়তা-ই কর্মীদের সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ভিত্তি। আল্লাহর তৈরী এই দ্বন্দ্বমুখর পৃথিবী দুর্বল চিত্ত মানসিক শক্তিহীন, ক্ষণে ক্ষণে সিদ্ধান্ত পরিবর্তনকারী, হাতাশাগ্রস্থ কোন কাপুরুষকে বিজয়ের মাল্যে ভূষিত করে নেতৃত্বের আসন দান করেনা। নেতৃত্বের আসন কেবল তাদেরকেই স্বাগত জানায়, যারা শত প্রতিকূলতার বাধার বিন্ধাচল নিষ্ঠুর কদমে পদদলিত করে বিরুদ্ধবাদীদের প্রবল তরঙ্গের মুখে অজেয় মানসিক শক্তি নিয়ে ঐ তুষার আবৃত হিমালয়ের গগনচুম্বি উচ্চ শৃঙ্গের মতই অবিচল অটলভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

নির্যাতনের কবলে যুন-নূরাইন

ইসলামী আন্দোলনের দাবীই হলো, এ আন্দোলনে যে-বা যারাই শামিল হবে তাদের ঈমানী দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায় আন্দোলন বহির্ভূত ভাই-বোনদেরকে এ আন্দোলনের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য বোঝানো এবং আন্দোলনে শামিল করা। ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী এ দায়িত্ব পালন না করলে আদালতে আখিরাতে ভয়াবহ আযাবের মুখোমুখী হবেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এ আন্দোলনে শামিল হয়েই অপর ভাই-বোনদেরকে আন্দোলনের কর্মী তৈরীর লক্ষ্যে পেরেশান হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর আশেপাশের মানুষদের মধ্যে থেকে বিভিন্ন ব্যক্তিকে টার্গেট করে দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করলেন। অনেকেই তাঁর দাওয়াত কবুল করে ইসলামী আন্দোলনের জানবাজ মুজাহিদে পরিণত হলেন।

নিজ সন্তান কলিজার টুকরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে পিতামাতা যেমন তাদের নয়নের পুতুলির আরোগ্যের জন্যে পেরেশান হয়ে পড়ে, আবু বকর (রাঃ)ও তেমনি অপর ভাই-বোনদেরকে জাহান্নামের পথ থেকে জান্নাতের পথে ফিরাবার জন্যে অস্থির হয়ে পড়েছেন। তিনি আন্দোলনের দাওয়াত নিয়ে হযরত উসমানের কাছে গেলেন। তদানিন্তন আরব সমাজে উসমান নামটি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উচ্চারিত হতো। লোকেরা তাকে ন্যায় পরায়ণ, চরিত্রবান, ধনী, দানশীল,

জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে অত্যন্ত সম্মান করতো। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি অত্যন্ত হৃদয়বান ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যের অধিকারী যুবক উসমান বন্ধু আবু বকরের মুখ থেকে ইসলামের অনুপম সৌন্দর্যের বর্ণনা শুনে আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন রেসালাতে মুহাম্মাদীর (সাঃ) কাছে। দীক্ষা নিলেন তাওহীদের নতুন মন্ত্রে। উসমানের হৃদয় আকাশ নবারুণের আলোকে উদ্ভাসিত। দৃষ্টির সামনে গোটা প্রকৃতির অপরূপ নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্যরাশি নতুন রূপে প্রকাশ হলো। হৃদয়ের মনি কোঠায় লুকায়িত তাওহীদের অনল শিখা আলো ছড়িয়ে দিল। মক্কার অন্ধকারপুরের অধিবাসীরা হিংস্র হায়েনার মত সক্রিয় হয়ে উঠলো। তাঁরা হযরত উসমান (রাঃ)কে গ্রেফতার করে শুরু করলো অবর্ণনীয় নির্যাতন। উসমানের মত সম্মানিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আজ ইসলামী আন্দোলনের কর্মী হওয়ার অপরাধে(?) নির্যাতিত হচ্ছেন।

তাঁকে রশি দিয়ে অত্যন্ত শক্ত করে বেঁধে তাঁর সুন্দর শরীরে আঘাত করা হচ্ছে। আঘাতে আঘাতে তাঁর গৌরবর্ণের শরীর কালচে হয়ে গেছে। বাতিল শক্তির প্রতিভূরা আঘাত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে উসমান (রাঃ)কে বলছেঃ উসমান–এর থেকেও ভয়ংকর অত্যাচার করা হবে, এখনো ইসলাম ত্যাগ কর। হযরতে উসমান (রাঃ) কঠিন নির্যাতনের পরেও বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললেনঃ তোমাদের যা খুশী করতে পারো, আমার প্রাণ থাকতে ইসলামী আন্দোলন ত্যাগ করবো না।

ইসলাম যখন হৃদয়ের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হৃদয়ের অধিকারী দেহ, যে কোন পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। তাওহীদের সৌরভে সুরভিত হযরত উসমানের দেহ বাতিল শক্তির শত অত্যাচার সহ্য করে ইসলামী আন্দোলনে অটল হয়ে রইলো। তিনি মক্কায় মুক্তমনে আল্লাহর দাসত্ব করতে না পেরে ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ প্রদত্ত নেতা নবী মুহাম্মাদুর রাছুলুল্লাহ (সাঃ) এর অনুমতি নিয়ে হাবশায় হিজরত করেন। পরে তিনি মদিনাতে হিজরত করেন। এ জন্যে তাকে "যুল–হিজরাতাইন" বলা হয়। তিনি নবী (সাঃ) এর মেয়ে হযরতে রুকাইয়া (রাঃ) কে বিয়ে করেন। রুকাইয়া (রাঃ) এর ইন্তেকালের পরে রাসূল (সাঃ) পুনরায় তাঁর অপর কন্যা উম্মে কুলছুম (রাঃ) কে তাঁর সাথে বিয়ে দেন। এ জন্যে তাকে "যুন–নূরাইন" বা 'দুই জ্যোতির' অধিকারী বলা হয়।

তিনি অত্যন্ত ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে তিনি মুক্ত হস্তে তাঁর ধন–সম্পদ ব্যয় করেন। হক– বাতিলের সাথে যুদ্ধে, যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্যে যখন নবী (সাঃ) ''যুদ্ধ তহবিল" (WAR FUND) গঠন করতেন তখন হযরত উসমান (রাঃ) সবচেয়ে বেশী অর্থ সম্পদ যুদ্ধ তহবিলে দান করতেন। এক তাবুকের যুদ্ধেই তিনি সৈন্যবাহিনীর এক তৃতীয়াংশের যাবতীয় ব্যয়ভার নিজ কাঁধে উঠিয়ে নেন। তাছাড়াও তিনি এ যুদ্ধে ৯৫০টি উট ও ৫০টি ঘোড়া দান করেন। তিনি অনেক গোলাম খরিদ করে তাদেরকে স্বাধীন করে দেন। রাত্রে তিনি চাকরদেরকে দিয়ে কোন কাজ করাতেন না। নিজ হাতে সমস্ত কাজ করতেন। দেশের মানুষের পানির অভাব দূর করার জন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করে পানির অভাব দূর করেন।

বিধাতার কি নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস! যিনি জাতির পানির অভাব দূর করার জন্যে নিজের পরিশ্রম লব্ধ অর্থব্যয় করে জাতির পানির তৃষ্ণা দূর করলেন, আর তিনিই শাহাদাতের পূর্বে রোজা অবস্থায় ইফতার করার জন্যে বিন্দু পরিমাণ পানি পাননি। বিরোধী শক্তি তার বাড়ীতে পানি সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। আল্লাহর নবী (সাঃ) অনেক সময় অভাবী মানুষদেরকে হযরত উসমান (রাঃ) এর কাছে সাহায্যের জন্য পাঠাতেন।

আল্লাহর নবী (সাঃ) এর কাছে একদিন একটি লোক এসে নিজের অভাবের কথা প্রকাশ করলো। তিনি (সাঃ) অভাবী ব্যক্তিকে উসমান (রাঃ) এর কাছে পাঠালেন সাহায্যের জন্যে। লোকটি উসমান (রাঃ) এর বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, তিনি কিছু তুলা রৌদ্রে শুকাচ্ছেন। বাতাসে সামান্য সামান্য তুলা উড়ে যাচ্ছে আর তিনি তা দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে ধরে নিয়ে এসে যথাস্থানে রাখছেন। অভাবী লোকটি এই দৃশ্য দেখে চিন্তা করলোঃ সর্বনাশ! যে লোক এত বড় কৃপণ, সামান্য তুলা বাতাসের কবল থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জন্যে দৌড়াদৌড়ি করেন, আর তাঁর কাছেই রাসূল আমাকে আমার অভাবের কথা জানাতে বলেছেন? অসম্ভব! এ লোক আমাকে সাহায্য করতে পারে না। লোকটি এ চিন্তা করে চলে গেল। পরের দিন আবার অভাবী লোকটি রাসূল (সাঃ)–এর কাছে গেল। রাসূল পুনরায় তাকে হযরতে উসমান (রাঃ)–এর নিকট পাঠালেন। লোকটি পুনরায় উসমান (রাঃ)–এর বাড়ীতে গিয়ে দেখলেন, তিনি রৌদ্রে গুড় শুকাচ্ছেন। মাছি ও পিঁপড়া এসে গুড় খাওয়ার চেষ্টা করছে আর উসমান (রাঃ) সেগুলোকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন।

আজ লোকটি চিন্তা করলোঃ যে মানুষ, মাছি ও পিঁপড়ায় গুড় খাবে তাই সহ্য করতে পারে না– আর সেই মানুষ আমাকে অর্থ সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবে? নাহ্, রাসূল (সাঃ)–এর কাছেই যাই। রাসূলের কাছে ফিরে এলে রাসূল (সাঃ) তৃতীয়বারের মত তাকে উসমান (রাঃ)–এর কাছে পাঠালেন। এবার অভাবী লোকটি তার কাছে নিজের অভাবের কথা ব্যক্ত করলেন। হযরত উসমান (রাঃ) অভাবী লোকটির কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে কোন কথা না বলে কপালে হাত দিয়ে সূর্য্য আড়াল করে মরুভূমির পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। তিনি দেখতে পেলেন একটি বিরাট উটের বাণিজ্য কাফেলা তাঁর বাড়ীর দিকেই আসছে।

তিনি অভাবী লোকটিকে বললেনঃ একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমি আমার বাণিজ্য কাফেলা বিদেশে পাঠিয়ে ছিলাম ব্যবসার উদ্দেশ্যে আজ তাঁরা ফিরে আসছে। কাফেলা থেকে সম্পদ বোঝাই উট যে টি আপনার পছন্দ, আপনি বেছে নিয়ে যান। উটের কাফেলা নিকটে এলে অভাবী লোকটি কাফেলার সম্পদ বোঝাই সর্দার উটটিকেই পছন্দ করে নিয়ে যেতে লাগলো। সমস্যা দেখা দিল, পথ প্রদর্শক উটটি যেদিকেই যায় কাফেলার সম্পদ বোঝাই অবশিষ্ট উটগুলোও সেদিকেই যেতে লাগলো। ইসলামী আন্দোলনের নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদ হযরত উসমান (রাঃ) দারিদ্র্য লোকটিকে বললেনঃ আপনি গোটা উটের বাণিজ্য কাফেলাটিই নিয়ে যান। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর রাস্তায় সব দান করে দিলাম।

অভাবী লোকটি আশ্চার্য্য হয়ে তাঁর পূর্বের দেখা তুলা ও গুড়ের ব্যাপারটি উসমান (রাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে উসমান (রাঃ) বললেনঃ তুলা ও গুড়গুলো আমার নিজের নয়, মানুষের। ওগুলো লোকজন আমার কাছে আমানত রেখেছে। দ্রব্যগুলো নষ্ট হওয়ার ভয়ে আমি তা রৌদ্রে দিয়ে পাহারায় বসেছিলাম। ওগুলো বাতাসে উড়িয়ে নিলে এবং মাছি ও পিঁপড়ায় খেলে আমানতের খেয়ানত হতো। তাই আমি দ্রব্যগুলো বাতাস, মাছি ও পিঁপড়ার কবল থেকে রক্ষা করছিলাম।

দ্রব্যগুলো বিন্দু পরিমাণ নষ্ট হলে আল্লাহর কাছে কেয়ামতের ভয়াবহ ময়দানে জবাবদিহী করতে হবে। এই ভয়ে উসমান (রাঃ) মরুভূমির প্রচন্ড তাপ উপেক্ষা করে রৌদ্রে বসে পাহারা দিচ্ছিলেন অপরের দ্রব্যের যাতে কোন ক্ষতি না হয়। আল্লাহর পথের এই সৈনিকের সেদিকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। আর তাঁর দানশীলতার তো কোন তুলনা–ই হয় না। সংগঠনের প্রাণ–ই হলো অর্থ। অর্থ

সম্পদ পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকলে সংগঠন ময়দানে কোন তৎপরতা–ই চালু রাখতে পারবে না। ফলে বাতিল শক্তি ময়দান দখল করে নিবে। কোন ব্যক্তির শরীরে যেমন রক্ত না থাকলে ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকতে পারে না। তেমনি অর্থ সম্পদ হলো ইসলামী আন্দোলনের চালিকা শক্তি। পরিমিত পরিমাণ অর্থ সম্পদ কর্মীরা সংগঠনকে না দিলে ইসলামী আন্দোলন ময়দানে বাধাগ্রস্ত হবে। ফলে কর্মীদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের প্রতিটি স্তরের কর্মীদেরকে হযরত উসমান (রাঃ)–এর ন্যায় মন মানসিকতা সৃষ্টি করতে হবে। এ জন্যে ইমাম মওদূদী (রাহঃ) বলেছেনঃ শুধু নিজেকেই মুসলমান বানালে চলবে না। নিজের পকেটকেও মুসলমান বানাতে হবে।

হৃদয় যেথায় শংকাহীন

মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ রব্বুল আলামীন শোষণ নিপীড়ন বঞ্চনার কালো থাবা থেকে মানব মন্ডলীকে মুক্তির সোপানে পৌছে দেওয়ার জন্যে তাঁর প্রিয় হাবিবের নিকট যে মহাসত্য অবতীর্ণ করেছেন, তার অন্তরনিহিত শক্তির স্ফুরণ সত্য গ্রহণকারীদেরকে নির্ভীক করে তোলে। যারাই এই সত্যের সংস্পর্শে এসেছে তাঁরা সত্যের সহজাত গুণাবলীর কারণে তা প্রচার ও প্রসার না করে অলস জীবন গ্রহণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। মহাসত্যের বিদ্যুৎছটা সত্যের বাহককে নীরব থাকতে দেয়নি। সত্যের চিরন্তন নীতিই হলো দিক–দিগন্তে প্রসারিত হওয়া, বদ্ধ কুঠুরীতে গোপনে অবস্থান করা নয়। মহামুক্তির মহাবাণীর আগমন পৃথিবীতে ঘটেছেই তার প্রতিটি অক্ষর পথহারা মানব মন্ডলীর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে জাগরণ সৃষ্টির জন্যে।

মক্কায় উদিত মহাসত্যের উজ্জল আলোকরশ্মি দিকচক্রবাল উজ্জল করে মিথ্যার তমশাবৃত ধরণীর অন্ধকারের প্রতিটি স্তরের দিকে দূর্বার বেগে ধাবিত হচ্ছে। মক্কা থেকে অনেক অনেক দূরে অবস্থান করেও হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) মহা সত্যের সূর্য কিরণ দেখতে পেলেন। এই সূর্যের উৎসমূল সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্যে তাঁর সত্যানুসন্ধিৎসু হৃদয় ব্যকুল হয়ে উঠলো। চারিপাশের মিথ্যের ঘনঅন্ধকার তাঁর কাছে অসহনীয়। আর্তমানবতার করুণ আর্তনাদ তাঁর চোখ দু'টো ক্ষণে ক্ষণে অশ্রুসজল করে তোলে। মানব মন্ডলীকে মিথ্যে আলেয়ার পিছনে মুক্তির সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরতে দেখে তাঁর সত্য পিয়াসী হৃদয়ে বোবাকান্না গুমরে ফিরে।

নিজে মহাসত্যের অনুসারী হয়ে গোটা মানবমন্ডলীকে সেই সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে তাঁর মন-মস্তিস্ক তাকে সত্য অনুসন্ধানে অস্থির করে তোলে। তিনি তাঁর আপন সহোদর ওনায়েছকে মক্কায় প্রেরণ করলেন মহাসত্যের উৎসমূল সম্পর্কে বিস্তারিত তত্ব ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষ্যে। ওনায়েছ মহাসত্যের বাণী বাহক বিশ্ব নেতা নবী (সাঃ) সম্পর্কে সংগৃহিত তথ্যাদি আবুযর গিফারীর কাছে বর্ণনা করে বললেনঃ

আমি দেখতে পেলাম মুহাম্মদ (সাঃ) মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব গ্রহণ করার জন্যে আহবান জানাচ্ছেন। অসৎ পথ ত্যাগ করে সৎ পথ অবলম্বনের জন্যে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমি তাঁর পবিত্র মুখ নিঃসৃত যে সমস্ত মহামূল্যবান বাণী শ্রবণ করলাম, তা কোন কবি সাহিত্যিকের কল্পিত রচনা নয়। গোটা পৃথিবীর সাহিত্য ভান্ডারে আমার শোনা বাণীর অনুরূপ একটি বাণীরও অস্তিত্ব নেই।

সত্যানুসন্ধিৎসু আবুযর গিফারী তাঁর সহোদর কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্যাদি অবগত হয়ে নিশ্চিত হতে পারলেন না। মরু সাইমুম তাড়িত পিপাসার্ত পথিকের এক অঞ্জলী পানি যেমন তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে তেমনি সত্য সম্পর্কিত স্বল্প তথ্যে আবুযর গিফারীর হৃদয়ের চঞ্চলতা শতগুণ বৃদ্ধি হলো। তিনি মানব মুক্তির মহাসম্পদ আল-ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জামার পথে রওয়ানা হলেন।

তিনি নবী মুহাম্মদকে (সাঃ) নিজ চোখে কোন দিন দেখেননি। দরবারে নবুওয়তের সন্ধানও তিনি জানতেন না। তিনি শুনেছিলেন মিথ্যার পূজাড়ীরা সত্যের বাহক নবী (সাঃ) এর প্রাণের শত্রুতে পরিণত হয়েছে। এ জন্যে তিনি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে মক্কার হেরেম শরীফে সারাদিন অতিবাহিত করলেন। রেছালাতে নববীকে দেখার জন্যে তাঁর চিত্তের চঞ্চলতা মুখমন্ডলে প্রকাশমান। কিন্তু কারো কাছে নবী (সাঃ) সম্পর্কে কিছু জানতে চাইবেন- অথবা চাইবেন না, এ ধরনের দোদূল্যমানতায় তার মন অস্থির।

হযরত আলী (রাঃ) সন্ধ্যার পরে কাবা শরীফে বিদেশী মেহমান দেখে তাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে পরম সমাদরে মেহমানের আহার ও রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন। এভাবে তিনদিন তিনরাত্রি অতিবাহিত হতে চললো। আবুযরও হযরত আলীকে কিছু জিজ্ঞাসা করেন না, আলী (রাঃ)ও উপযাচক হয়ে মেহমানকে মক্কায় তাঁর আগমনের হেতু জানতে চাননা। পক্ষান্তরে আরবের প্রথানুযায়ী তিনদিনের বেশী কোন অপরিচিত অতিথি কারো বাড়ীতে অবস্থান

করেন না। হযরত আলী (রাঃ) তৃতীয় রাত্রে আহারাদীর পরে বিনয়ের সাথে অতিথিকে প্রশ্ন করলেনঃ

"আপনি কে ভাই? কোথায় থেকে কি উদ্দেশ্যে এখানে আগমন করেছেন? আপনার যদি কোন অসুবিধা না থাকে তাহলে আপনার এখানে আগমনের উদ্দেশ্য আমার কাছে অকপটে বলতে পারেন। আপনার উদ্দেশ্য সাধনে আমি আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা করবো। আপনি নির্ভয়ে আমার কাছে আপনার প্রয়োজনের কথা বলুন।" আশ্রয়দাতার আন্তরিকতা দেখে হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বললেনঃ "আমাকে আপনি যদি সহযোগীতা করতে না পারেন তাহলে অনুগ্রহ পূর্বক আমার আগমনের কারণ আপনি অন্য কারো কাছে বলবেন না।"

হযরত আলী মেহমানের আগমনের কারণ সম্পর্কে জানতে পেরে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি আবুযরকে বললেনঃ "ভাই আপনাকে আমি আগামীকাল সকালে আপনার কাংখিত ব্যক্তির কাছে নিয়ে যাবো। তবে পথে যেতে আপনি এমন সতর্কতার সাথে আমাকে অনুসরণ করবেন যাতে অন্য কোন ব্যক্তি যেন বুঝতে না পারে যে আপনি আমার সাথেই যাচ্ছেন। কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সামনা সামনি পড়ে গেলে আমি কোন কজের ছল করে দূরে সরে পড়বো, আর আপনি কোন দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সোজা হাঁটতে থাকবেন।"

আবযুর গিফারীর হৃদয়ের অস্থিরতা আজ এতই বৃদ্ধি পেল যে, একটি রাত তাঁর কাছে মনে হলো কয়েক যুগের সমান। তিনি সত্য জানার মানসিক অস্থিরতার কারণে রাত্রে না ঘুমিয়ে বিছানায় এপাশ ওপাশ করে রাত্রি অতিবাহিত করলেন। অবশেষে বিরক্তকর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর এলো সেই বাঞ্চিত সকাল। তিনি কম্পিত বুকে হযরত আলীকে অনুসরণ করলেন। দরবারে নবুওতে পৌঁছিয়ে তিনি তাঁর আকাংখিত মহাসত্যের সন্ধান পেলেন। সত্যের অমিয় বারি বর্ষণের অভাবে আবুযরের হৃদয় শুষ্ক মরুভূমির মতই মেঘের আশে বিভোর ছিল। আজ মহাসত্যের স্বর্গীয় বারি বর্ষণে তাঁর হৃদয় উর্বর হয়ে উঠলো। তিনি কালক্ষেপণ না করে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর পবিত্র হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে দ্বীনি আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলেন।

ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্বনেতা মহানবী (সাঃ) তাঁর সংগঠনে সদ্য আগত কর্মী আবুযর গিফারী (রাঃ) কে সতর্ক করে দিয়ে বললেনঃ ইসলামী আদর্শ গ্রহণের কথা কারো কাছে বর্তমান সময়ে প্রকাশ না

করো তুমি দেশে ফিরে যাও। কিন্তু হযরত আবুযর (রাঃ) সত্যের স্পর্শে নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলেন না। যে সত্য গ্রহণের জন্যে তাঁর হৃদয়–মন উন্মাদের মত হন্যে হয়ে ফিরছিল, আজ সে সত্য গ্রহণ করে তা মানব জাতির কাছে প্রচারের জন্যে তাঁর মন ব্যকুল হয়ে উঠলো। তিনি চিন্তা করলেন, আমি সত্যের সন্ধান পেয়েও পথভ্রান্ত মানুষদের কাছে ঐ মহাসত্যের সন্ধান দিবনা এমন তো হতে পারে না? আমি যে আন্দোলন, সংগঠনকে নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করি, সেই সংগঠন ও আন্দোলনের দিকে মানুষদেরকে ডাকবো না–এটা তো চরম স্বার্থপরতা? আর কুসুমাস্তীর্ণ আরামশয্যায় কাল কাটানোর জন্যে তো আমি সত্য গ্রহণ করিনি? এ সমস্ত চিন্তা তাকে পাগল পারা করে তুললো। তিনি প্রিয় নবী (সাঃ) এর কাছে নিবেদন করলেনঃ

"ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)। তাওহীদের এই আন্দোলনের অগ্নিশিখা আমি মানুষের মধ্যে যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও ছড়িয়ে দিবই।" বাতিল শক্তির ভয়ে যে আবুযর মহাসত্যের বাহক মহানবীর (সাঃ) নাম পর্যন্ত উচ্চারণ করতে মক্কায় সাহস করেননি, বিরুদ্ধবাদীদের শ্যেন দৃষ্টির অন্তরালে নিজেকে গোপন রেখেছেন, তিনদিন ধরে চরম মানষিক দ্বিধা–দ্বন্দের মধ্যে সময় অতিবাহিত করেছেন,আর আজ তাওহীদের প্রখর কিরণচ্ছটা তাঁর হৃদয় আকাশ থেকে ভীতি, জড়তা ও দ্বিধা–দ্বন্ধের কালো মেঘ কেটে নিয়ে তাকে শংকামুক্ত করেছে। সকল জুলুম, নিস্পেষণ, নির্যাতন এমন কি মৃত্যুর মহাভীতিও তাকে সত্য প্রচারে বাধার সৃষ্টি করতে পারলোনা। তাওহীদের বিপ্লবী চেতনা তাকে শংকামুক্ত নতুন জীবন দান করলো। তাওহীদের বিপ্লবী আওয়াজকে বুলন্দ করার অদম্য কামনায় তিনি ছুটে এলেন বায়তুল্লাহর উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে।

বায়তুল্লাহ তখন ইসলামী আন্দোলনের দুশমন বাতিল শক্তির কেন্দ্রীয় মিলনায়তন। বাতিলের অন্ধ পূজাড়ীরা বায়তুল্লাহর মধ্যে যখন ইসলামী আন্দোলনকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার শলা–পরামর্শে ব্যস্ত ঠিক সেই মূহুর্তেই মহাসত্যের বিপ্লবী কর্মী হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) বাতিলের সমাবেশের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেনঃ "আল্লাহ ব্যতিত দাসত্ব গ্রহণের কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই, আর মুহাম্মাদ (সাঃ) হলেন আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত রাসূল–নবী ও ইসলামী আন্দোলনের বিশ্বনেতা।"

সত্যের চিরশত্রু বাতিল শক্তির কর্ণকুহরে তাওহীদের বিপ্লবী আওয়াজ মৃত্যুঘন্টার মতই আঘাত হানলো। তাঁরা ক্ষণিকের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। মিথ্যার ধ্বজাধারীরা বিস্ময় মিশ্রিত বিস্ফারিত নেত্রে সত্যের বিপ্লবী

বীর আবুযরের দিকে চেয়ে থাকলো। তাঁরা তাদের আড়ষ্টতা কাটিয়ে বন্য হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো তাওহীদের সৈনিক আবুযর গিফারীর উপরে। বাতিল শক্তির নির্মম নিষ্ঠুর প্রহারে তাঁর দেহ ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল। তিনি প্রায় মুমূর্ষাবস্থায় রক্তাক্ত দেহে কা'বার প্রাঙ্গনে লুটিয়ে পড়লেন। হযরত আব্বাস (রাঃ) তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। তবুও তিনি আবুযরকে রক্ষায় এগিয়ে গেলেন, তাঁর দেহ দিয়ে আবুযরকে আড়াল করে বললেনঃ

এ ব্যক্তি গিফারী গোত্রের লোক, আর সিরিয়া যাওয়ার পথে এদের বাড়ী। এরা যদি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তাহলে সিরিয়ার সাথে তোমাদের যাবতীয় ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাবে। হযরত আব্বাসের হস্তক্ষেপে তখনকার মত আবুযর গিফারী (রাঃ) নির্যাতন থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু সত্যের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ তো আর প্রতিবন্ধকতা দেখে তার লাভা উদগীরণে বিরত থাকতে পারেনা। ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী বীর হযরত আবুযর গিফারী (রাঃ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দুর্বার আকাংখায় বাতিলের কঠোর নির্যাতন উপেক্ষা করে পুনরায় বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে তাওহীদের বিপ্লবী বাণী নির্ভীক চিত্তে ঘোষণা করলেন। সত্যের শত্রুদের পক্ষ থেকে নির্যাতনেরও পুনরাবৃত্তি ঘটলো। এভাবে তিনি কয়েকবার বাতিলদের নির্যাতনের নিষ্ঠুর শিকারে পরিণত হলেন।

যারা মহাসত্যের সন্ধান লাভ করেন তাঁরা বিরুদ্ধবাদীদের বিদ্রুপ, অপপ্রচার, নির্যাতন, লোভ-লালসা কোন কিছুরই পরোয়া করেন না। কারণ তাদের উপরে এটা ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে অর্পিত হয় যে, "দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির মাধ্যম মনে করে যে আন্দোলন, সংগঠন ও আদর্শকে বাতিলের মুকাবিলায় ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, সে আন্দোলন, সংগঠন ও আদর্শের দিকে মানবজাতিকে আহবান করা।" এটা সত্য গ্রহণকারীদের ঈমানী দায়িত্ব। ইসলামী আন্দোলনের কোন কর্মী উল্লেখিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অলসতা, অবহেলা, বিদ্রুপ, নির্যাতন, শারীরিক-মানসিক ও আর্থিক সমস্যাকে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বাধা বলে মনে করে অজুহাত দেখিয়ে যদি দায়িত্ব পালন না করেন, তাহলে আখিরাতের ময়দানে মুক্তির জন্যে কোন অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবেনা।

সততা মুক্তি আর সাম্যকে কেন্দ্র করে যে শক্তি ময়দানে আবির্ভূত হয় সে শক্তি অপরের ব্যক্তি স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করাকে অন্যায় বলে মনে করে। নিজে যেমন তাদের আদর্শ উদ্দেশ্য লক্ষ্য ও কর্মসূচী নিয়ে মানুষের সামনে পেশ করে অপরকেও সে সুযোগ তাঁরা সৃষ্টি করে দেয়।

আর যে শক্তি মিথ্যা, স্বার্থপরতা, পেশী শক্তি, একনায়ক স্বৈরতন্ত্র, ব্যক্তি কেন্দ্রিকতা, বিশৃংখলা অসত্যতার উপরে ভিত্তি করে ময়দানে আবির্ভূত হয়, সে শক্তির প্রথম কর্তব্যই হয় প্রতিপক্ষের কন্ঠনালী কেটে দিয়ে বাকস্বাধীনতা হরণ করা। স্বভাবতই তাঁরা হয় অসহিষ্ণু, সমালোচনা তাঁরা বরদাশ্‌ত করতে পারেনা।

প্রতিপক্ষ সংগঠনের লোক দেখলেই তাঁরা তাকে নিজেদের অস্তিত্বের প্রতি হুমকী মনে করে। এই স্বৈরাচারী বাতিলশক্তি গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামাবলীর অন্তরালে, জাতীয়তাবাদের আলখেল্লার আড়ালে তথা বিভিন্নরূপে সত্যের পথে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাতিল শক্তি সত্যপন্থিদের উত্যক্ত বিরক্ত তথা উস্কানী দিয়ে একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি করে ঘোলাপানিতে মাছ শিকারের জন্যে তাঁরা ন্যক্কারজনক পথ অবলম্বন করে। অতিতেও বাতিল শক্তি প্রতিপক্ষের শ্লোগান, প্রচার, সমাবেশ মত প্রকাশ সহ্য করতে পারেনি বর্তমানেও পারছেনা। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের হিমালয়সম সহিষ্ণুতাকে এরা দুর্বলতা বলে মনে করে। এরা ভুলে যায় যে, তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী আন্দোলন একটি কালজয়ী বিশ্বজনীন অপরাজেয় দুর্বিনিত মহাশক্তি।

কে বলে নারী অবলা?

পৃথিবীতে নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবলা, দুর্বল চিত্তের অধিকারিনী, মায়াবিনী, কুহকিনী, ছলনাময়ী ইত্যাদি নামেই অভিহিত করা হয়েছে। কোন সভ্যতার ধারক বাহকেরা নারীকে অবরোধ পুরের অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আবার কোন সভ্যতার নির্মাতারা নারীকে শুধুমাত্র ভোগের সামগ্রী তথা পুরুষের মনোরঞ্জনের উপকরণ হিসেবে বিবেচনা করেছে। আবার কোন আদর্শের পূজাড়ীরা নারীকে "শয়তানের প্রবেশ দ্বার," সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব হিসেবে বিশ্ব সমাজে মনোনয়ন দিয়েছে। প্রাচীন রোমক সভ্যতা, গ্রীক সভ্যতা, পারস্য সভ্যতা, ইউরোপীয় সভ্যতা ও জড়বাদী ভারতীয় সভ্যতায় ও নারীকে নিয়ে টানা হেচঁড়ার এক লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় ইতিহাসে। অন্ধকারের তমশাবৃত আবরণ ছিন্ন করে সভ্যতার সুনীল আকাশে ইসলামী সভ্যতার উদয়ে মহামুক্তির সিংহদ্বার উন্মোচিত হয় নারীর জন্যে।

ঘৃণা ও লাঞ্ছনার অতল তলদেশ থেকে নারীকে উঠিয়ে সম্মানের আসনে আসীন করে দেয় ইসলাম। ইসলাম নারীকে কন্যা, জায়া ও জননী হিসেবে আলাদা আলাদা মর্যাদা প্রদান করেছে। 'মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশ্‌ত' এতো ইসলামেরই ঘোষণা। জাগতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবদান রাখার– নারীকে সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় ইসলাম। আদর্শ রক্ষার প্রশিক্ষণ দিয়ে নারীকে আল কুরআনের অতন্ত্র প্রহরী তৈরী করে দেয় ইসলাম। এমনি এক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নারী তাওহীদের নির্ভীক মহিলা সৈনিক হযরত উম্মে আম্মারা বিনতে কা'ব (রাঃ)। তিনি ওহুদের রণপ্রান্তরে পুত্রদের সাথে বাতিল শক্তির মুকাবিলা করার জন্যে এসেছেন।

যুদ্ধের ময়দানে তাঁর নির্ভীক পদচারণায় বাতিল শক্তি স্তম্ভিত হয়ে যায়। ইসলামী আন্দোলনের আহত সৈন্যদেরকে তিনি যখন সেবা শুশ্রূষা করছিলেন, তখন হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন বাতিলেরা ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত নেতা নবী মুহাম্মদ (সাঃ)কে ঘিরে ফেলেছে। নবী (সাঃ) কে শত্রু পরিবেষ্টিত দেখে তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। নিজের জীবনের থেকে আল্লাহর নবীর জীবনের মূল্য অনেক বেশী। ইসলামে দীক্ষিত প্রতিটি নর–নারীর অবশ্য কর্তব্য নবী (সাঃ)–এর জীবন, মান মর্যাদা নীজের জীবন দিয়ে হলেও হেফাজত করা। পানির পাত্র হাতে থেকে ফেলে দিয়ে তরবারী কোষমুক্ত করে উম্মে আম্মারা (রাঃ) উল্কার বেগে ছুটলেন আল্লাহর রাসূলের দিকে।

উম্মে আম্মারের (রাঃ) কোমল হাতের তরবারী দিয়ে ওহুদের রণপ্রান্তরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তাঁর নিজের প্রতি সামান্যতম লক্ষ্য নেই। আল্লাহর রাছুল (সাঃ) কে হেফাজত করার জন্যে তিনি পাগলের মত বাতিলের বিরুদ্ধে তরবারী চালাচ্ছেন। যারাই রাসূলের উপরে হামলা করার জন্যে ছুটে আসছে, আল্লাহর এই সিংহী তাদেরকেই তরবারী দিয়ে আঘাত করে পিছু হটতে বাধ্য করছেন। বাতিল শক্তির অজস্র আঘাতে তাঁর কোমল দেহ থেকে রুধিরের ধারা ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে আসছে। সেদিকে তাঁর কোন চেতনাই নেই। ওহুদের ময়দানে বাতিল শক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো উম্মে আম্মারাকে (রাঃ) দুনিয়া থেকে বিদায় করে দিতে হবে। কেননা এই মহিলা মুহাম্মদ (সাঃ)–এর সামনে প্রাচীরের ন্যায় ভূমিকা পালন করছে। এই মহিলার তরবারীর ক্ষিপ্রতায় মুহাম্মাদ (সাঃ)কে আঘাত করা যাচ্ছে না।

এক অশ্বারোহী কাফের সৈন্য এসে উম্মে আম্মারা (রাঃ) কে লক্ষ্য করে তরবারী দিয়ে প্রচন্ড জোরে আঘাত করলো। তিনি ঢাল দিয়ে সে আঘাত প্রতিহত করে তরবারীর এক আঘাতেই কাফের সৈন্যটির ঘোড়ার পা কেটে ফেললেন। সে মাটিতে পড়ে গেল। নবী (সাঃ) তাঁর এই জানবাজ মহিলা কর্মীর বীরত্ব দেখছিলেন। তিনি উম্মে আম্মারার (রাঃ) দুই পুত্রকে ডেকে তাদের মা'কে সাহায্য করার জন্যে বললেন। তাঁরা এসে মাটিতে পতিত কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। ওহুদ যুদ্ধে কাফেরদের আক্রমণের তীব্রতা এত ভয়াবহ ছিল যে, অনেক বড় বড় পুরুষ বীরেরাও সে দিন যুদ্ধের ময়দানে দৃঢ়পদ থাকতে পারেননি।

কিন্তু আল্লাহর বাঘিনী উম্মে আম্মারা (রাঃ) অতুলনীয় বিক্রমে বাতিলের গতিরোধ করছিলেন। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ (রাঃ) যখন যুদ্ধে মারাত্মকভাবে আহত হলেন তখন নবী (সাঃ) উম্মে আম্মারাকে (রাঃ) পুত্রের ক্ষতস্থানে ব্যান্ডেজ বেঁধে দেওয়ার আদেশ দিলেন। আহতদের ক্ষত স্থানে ব্যান্ডেজ বাঁধার জন্যে তাঁর কোমরে অনেক কাপড় থাকতো। তিনি নিজ হাতে পুত্রের ক্ষতস্থান বেঁধে দিলেন। আপন কলিজার টুকরার দেহে গভীর ক্ষত দেখে তিনি এতটুকু আক্ষেপও করলেন না। পুত্রকে কোন রূপ শান্তনাও দিলেন না। রক্ত পিচ্ছিল পথের এই নির্ভীক মহিলা যাত্রী গম্ভীর কণ্ঠে আহত পুত্রকে আদেশ দিলেন যাও বাতিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

তাঁর পুত্রকে যে কাফেরটি আঘাত করেছিল সেই কাফেরটি তাকেও আঘাত করার জন্যে উদ্যত হয়। আল্লাহর নবী (সাঃ) এই দৃশ্য দেখে উম্মে আম্মারা (রাঃ) কে সতর্ক করে বললেনঃ "উম্মে আম্মারা সাবধান। এ হতভাগা তোমার পুত্রকে আহত করেছে''। উম্মে আম্মারা (রাঃ) তরবারীর আঘাত দিয়ে কাফের সৈন্যটিকে দু'টুকরো করে মাটিতে ফেলে দিলেন। ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মী উম্মে আম্মারা (রাঃ) নবী (সাঃ) এর প্রতি আঘাতকারী নরাধম ইবনে কামিয়ার উপর তরবারী দিয়ে দেহের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে প্রচন্ড জোরে আঘাত করেন। কিন্তু পাপীষ্ঠ কামিয়ার শরীর বর্মাবৃত থাকার ফলে উম্মে আম্মারার (রাঃ) তরবারী ভেঙ্গে যায়। এই সুযোগে আল্লাহর দুশমন ইবনে কামিয়া তাঁর উপরে হামলা করে। উম্মে আম্মারার (রাঃ) কাঁধে মারাত্মক ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সে ক্ষত আরোগ্য হতে এক বছরেরও অধিক সময় লাগে। মারাত্মক আহত হওয়ার পরও ঈমানের শক্তিতে বলিয়ান আল্লাহর দ্বীনের এই মহিলা মুজাহিদ তাঁর ভাঙ্গা তরবারী দিয়েই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগলেন।

আরবের বিখ্যাত বীর ইবনে কামিয়া ইসলামী আন্দোলনের এক মহিলার ভাঙ্গা তরবারীর সামনে টিকতে না পেরে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

যুদ্ধ শেষে তাঁর শরীরে বারটি আঘাতের চিহ্ন দেখা যায়। উম্মে আম্মারা (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে সংসারের চার দেওয়ালে আবদ্ধ হয়ে থাকেননি। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করার লক্ষ্যে শহীদি কাফেলার এই সাহসীনি যাত্রী বাতিলের মুকাবিলায় তাঁর কোমল হস্তে কঠিন লৌহ নির্মিত অস্ত্র উঠিয়ে নেন। তিনি আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করার বাসনায় হাসিমুখে বরণ করেছিলেন বাতিল শক্তির তরবারী ও বর্শার আঘাত। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে আহত পুত্রকে বাতিলের মুকাবিলায় যুদ্ধের রক্তঝরা ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিলেন তিনি।

ওহুদের যুদ্ধ ব্যতিত তিনি খায়বর, ইয়ামামা প্রভৃতি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে ইসলামের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন। খলিফাতুর রাসূল হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর শাসনামলে এ যুগের ভন্ড নবী কাফের মির্যা গোলাম আহাম্মদ কাদিয়ানীর গোশাই ঠাকুর মিথ্যাবাদী ভন্ডনবী মুসাইলামাতুল কাযযাব উম্মে আম্মারার (রাঃ) এক পুত্র হযরত হাবিব বিন যায়েদ (রাঃ)কে আম্মান থেকে মদিনা আসার পথে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসা করেঃ মুহাম্মাদ (সাঃ)কে তুমি নবী বলে স্বীকৃতি দাও কি–না? তিনি বললেনঃ অবশ্যই তিনি আল্লাহর রাছুল। মুসাইলামা পুনরায় প্রশ্ন করেঃ আমাকে আল্লাহর নবী বলে তুমি বিশ্বাস কর কি–না? বীর প্রসূবিনীর মুজাহিদ পুত্র হাবিব (রাঃ) তীব্র কণ্ঠে প্রতিবাদ করেন, তুমি অবশ্যই মিথ্যাবাদী কাফের।

ভন্ডনবী মুসাইলামা, হাবিব (রাঃ) এর এক হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাঁর প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করে। এবারও তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বললেনঃ মুহাম্মদ (সাঃ)–ই শেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী আসবে না। কাফের মুসাইলামা তাঁর অপর হাতও কেটে ফেলে। এভাবে হযরত হাবিবের (রাঃ) দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একে একে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয় তবুও তিনি মুসাইলামাতুল কায্‌যাবকে নবী বলে স্বীকৃতি দেননি। বাতিলের শত নির্যাতনের মুখেও হযরত হাবিব (রাঃ) নিজ আদর্শের উপরে অটল অবিচল থাকেন। রক্ত পিচ্ছিল পথের এই সাহসী যাত্রী শহীদি মিছিলের সংখ্যা ভারী করেছেন তবুও মিথ্যা নবুওতের দাবীদার মুসাইলামার কাছে মাথানত করেননি। তাঁর রক্ত বৃথা যায়নি। শহীদের

রক্ত বৃথা যেতে পারে না। তাঁর উত্তরসূরী মুসলমানেরা প্রতিটি যুগেই খতমে নবুওতের উপরে হামলাকারীদেরকে প্রতিহত করে আসছে।

হযরতে আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) মুসাইলামার বিরুদ্ধে যে বাহিনী প্রেরণ করেন সেই বাহিনীতে হযরত হাবিব (রাঃ) এর মা বীর মুজাহিদ হযরত উম্মে আম্মারা (রাঃ)ও শামিল ছিলেন। তিনি জীবনের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছিয়েছেন। মাথার ভ্রমর কৃষ্ণ কুন্তল রাশি শ্বেত শুভ্র আকার ধারণ করেছে। বয়সের ভারে তিনি যেন নুয়ে পড়েছেন। দৃষ্টি শক্তিও বোধ হয় তাঁর ক্ষীন হয়ে এসেছে। কিন্তু ইসলামী আদর্শের উপরে হামলা এসেছে। একথা শোনার সাথে সাথেই তিনি যেন ওহুদের ময়দানের বিগত যৌবনের অতুলণীয় বীরত্ব শৌর্যবীর্য ফিরে পেলেন। যুদ্ধের ময়দানে আল্লাহর এই সিংহী নাঙ্গা তরবারী নিয়ে ছুটলেন মুসাইলামার পিছনে। বাতিলের তরবারীর আঘাতে তাঁর একটি হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। সে যন্ত্রণা তাঁর উদ্যমে বাধা দিতে পারলো না।

রক্তাক্ত শরীর নিয়ে আল্লাহর পথের এই বৃদ্ধা সৈনিক মুসাইল্যামার পিছনে ছুটে চলেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর অপর পুত্র আব্দুল্লাহ ও ওয়াহ্সী (রাঃ) মুসাইলামার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে এই কাফেরকে জাহান্নামে পাঠিয়ে দেন। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর একটি হাত আল্লাহর রাস্তায় দান করেন। তাঁর শরীরে অসংখ্য আঘাত লাগে। হযরতে খালদ (রাঃ) তার সেবা শুশ্রূষা করেন।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলনে মহিলারাও কোন যুগে পিছিয়ে থাকেনি। স্বামী সন্তানকে ইসলামী আন্দোলনের রক্ত পিচ্ছিল পথে পাঠিয়ে তাঁরা অবরোধপুরে আরাম আয়েশের জেন্দেগী পছন্দ করেননি। বাতিলের মুকাবিলায় তাঁরাও তাদের কোমল শরীরকে সময়ের প্রয়োজনে কঠিন শিলায় পরিণত করেছেন।

ইসলামী আন্দোলনের দাবীর প্রয়োজনে তাদের কোমল হৃদয়ের কঠিন পাষাণরূপ দেখে বাতিল শক্তিও স্তম্ভিত হয়ে গেছে। হযরত আবু বকর (রাঃ)–এর কন্যা হযরতে আসমা (রাঃ) ইসলামী আন্দোলনের প্রয়োজনে নির্যাতনের প্রাচীর অতিক্রম করে গোয়েন্দার কার্যক্রম পরিচালিত করেছেন। তাঁর গর্ভের সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রামের এক পর্যায়ে গর্ভধারিনী মাতার কাছে পরামর্শ গ্রহণের জন্যে আগমন করলে তিনি তাঁর প্রিয় সন্তানকে বললেনঃ হে আমার পুত্র! মৃত্যুর ভয়ে লাঞ্ছনার জীবন বাতিলের কাছে থেকে ভিক্ষা নেওয়ার চেয়ে সম্মানের সাথে বাতিলের তরবারীর আঘাতে শাহাদাত বরণ করা বেশী শ্রেয়। আল্লাহর পথের নির্ভীক

সৈনিক হযরত আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁর মা'কে বলেনঃ মা' আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। আমি চিন্তা করছি শত্রু পক্ষ আমার মৃত্যুর পরে আমার লাশকে যদি শূলে ঝুলিয়ে রাখে তাহলে আপনি ভীষণ কষ্ট পাবেন।

বীরপুত্রের তেজস্বিনী মা দৃঢ়কণ্ঠে বললেনঃ ছাগল জবেহ করে তার চামড়া টেনে-হিঁচড়ে খুলে ফেললে বা টুকরা টুকরা করে কেটে ফেললে ছাগলের কোন কিছু যায় আসেনা। আল্লাহর উপরে ভরসা করে জালিমের মুকাবিলা কর। বাতিলের গোলামী করার চেয়ে তরবারীর নিচে টুকরা টুকরা হওয়া অনেক বেশী সম্মানের। মৃত্যুর ভয়ে গোলামীর জীবন গ্রহণ করবেনা।" মায়ের অনুপ্রেরণায় যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন হযরত আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ)। জালিম শক্তি তাকে নির্মম ভাবে শহীদ করে ফেললো। জালিমেরা তাকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তাঁর লাশ প্রথমে কয়েকদিন গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়। তারপর ইহুদীদের কবরস্থানে ফেলে দেওয়া হয়।

হযরত আসমা (রাঃ) যখন তাঁর পুত্রের এই মর্মান্তিক অবস্থা জানতে পারেন তখন তিনি সামান্যতম ব্যাথা বেদনাও প্রকাশ করেননি। এমনকি তিনি তাঁর বীর মুজাহিদ পুত্রের গলিত লাশ নিজ হাতে দাফন কাফন করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের এই মহিলা কর্মীর জীবনের একমাত্র লক্ষ্যই ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। এজন্যে তিনি কৈশর থেকে শুরু করে প্রায় একশত বছর বয়সে বৃদ্ধা অবস্থাতেও আল্লাহর পথে চরম ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ক্ষণিকের জন্যেও ইসলামী আন্দালনের রক্তঝরা পথ থেকে সরে দাঁড়াননি।

এ আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে পুরুষেরাই শুধু তাদের পদচিহ্ন এঁকে দেয়নি। অবলা নারীদের দৃপ্ত পদচারণাতেও যুদ্ধের ময়দানে বাতিল শক্তির হৃদকম্পন সৃষ্টি হয়েছে। ওহুদের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ মুসলিম সৈন্যদের সামনে দাঁড়িয়ে হযরত সুফিয়া (রাঃ) তাদেরকে যুদ্ধের ময়দানে ফিরে যাওয়ার জন্যে অনুপ্রেরণা দেন। তিনি খন্দকের যুদ্ধে যে ধরণের সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেন তা ইতিহাসে দেদীপ্যমান। বিশ্বনেতা নবী (সাঃ) সংগঠনের মহিলা কর্মীদের একত্রিত করে একটি দূর্গে তাদেরকে অবস্থান করতে বলেন। তিনি (সাঃ) এই দূর্গের দায়িত্বশীল নিযুক্ত করেন সে যুগের প্রখ্যাত কবি হযরত হাস্সান (রা) কে।

ইসলামী আন্দোলনের দুশমনেরা ধারণা করলো এ দূর্গে কোন পুরুষ নেই। অতএব আক্রমণ করার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। তারা দূর্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে একজন ইহুদীকে গোয়েন্দা হিসেবে প্রেরণ

করলো। দুর্গ তোরণের কাছে তথ্য সংগ্রহকারী গোয়েন্দাকে দেখে হযরত সুফিয়া (রাঃ) হযরত হাস্‌সান (রাঃ) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেনঃ ঐ লোকটি আমাদের দুর্গ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য শত্রুপক্ষকে প্রদান করবে, সুতরাং আপনি গিয়ে লোকটিকে হত্যা করুন। বার্ধক্য জনিত কারণে হযরত হাসসান (রাঃ) অপারগতা জ্ঞাপন করে বললেনঃ আমি যদি কাওকে হত্যা করতে সক্ষম হতাম তাহলে এখানে আসতামনা, যুদ্ধের ময়দানেই যেতাম।

হযরত সুফিয়া (রাঃ) কাঠের একটা শক্ত লাঠি হাতে নিয়ে অতি সতর্কতার সাথে গোয়েন্দার কাছাকাছি গিয়ে তাঁর মাথায় প্রচন্ড আঘাত করেন। সাথে সাথে আল্লাহর এই দুশমন জাহান্নামে গমন করে। সুফিয়া (রাঃ) এবার হাস্‌সান (রাঃ) কে এসে বললেনঃ আমি শত্রুকে হত্যা করেছি। আপনি গিয়ে তাঁর দেহ থেকে যুদ্ধ পোশাক ও সমরাস্ত্রগুলো নিয়ে আসুন। হাস্‌সান (রাঃ) বললেনঃ আমার পক্ষে তা–ও সম্ভব না। তিনি পুনরায় বললেনঃ তাহলে আপনি তাঁর মাথা কেটে দুর্গের বাইরে শত্রুদের মধ্যে নিক্ষেপ করুন, তাহলে শত্রুপক্ষ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে। হাস্‌সান (রাঃ) এবারেও অসম্মতি জ্ঞাপন করলে শহীদি মিছিলের সাহসী যাত্রী হযরতে হামযা (রাঃ) এর বোন আল্লাহর সিংহী গর্জন করে গিয়ে ইহুদী গোয়েন্দার মাথা কেটে দুর্গের বাইরে নিক্ষেপ করেন। ফলে দুর্গ আক্রমনকারী বাতিল শক্তি ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।

যেথা নেই প্রভেদ শাসক আর শাসিতের

পৃথিবী থেকে অন্যায় জুলুম নির্যাতন দূর করে একটি শোষণমুক্ত, ভীতিহীন, নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করতে হলে আন্দোলনকারীদেরকে আদর্শের বাস্তব নমুনা হতে হয়। যে আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ ও রাষ্ট্রের আমূল পরিবর্তন করার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়, সে আদর্শ যদি উদ্যোগ গ্রহণকারীদের জীবনের সার্বিক দিকে প্রতিষ্ঠালাভ না করে, তাহলে শত চেষ্টাতেও জাতিকে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্র উপহার দেওয়া সম্ভব নয়। যারা পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের আন্দোলন করে, তাদেরকে সর্বপ্রথমে নিজ জীবনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়িত করে সমাজে সর্বোৎকৃষ্ট সৎব্যক্তিতে পরিণত হতে হবে। সাহসীকতায়, বীরত্বে, নৈতিকতায়, দানশীলতায় দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। হতে হবে বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বজ্র কঠোর আর সত্যের প্রতি বিনয়ী। সমাজের আপামর জনসাধারণ তাকে দেখছে

পাবে একজন জনহিতৈষী ব্যক্তি হিসেবে। সমাজের মানুষের সুখ–দুঃখের সাথে নিজেকে ওৎপ্রোতভাবে জড়িয়ে তাদের ব্যাথার সমভাগী হতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের বীর সিপাহসালার হযরত আলী (রাঃ) এর কাঁধে মুসলিম জাতি যখন ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব তুলে দিল, তখন তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাজপ্রাসাদে ঘুমিয়ে সময় অতিবাহিত করেননি।

দায়িত্বের বোঝা বহন করতে গিয়ে কোন ধরনের ভুল ত্রুটি হয়ে যায় কি–না, এ ভয়ে তিনি নামাজে দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপতেন। দেশের মানুষের জীবন যাত্রা স্বচক্ষে দেখার জন্যে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতেন। পথহারা পথিকদের তিনি পথের সন্ধান দিতেন। তাঁর সামনে দিয়ে কোন মানুষ যদি বহনের অতিরিক্ত বোঝা বহন করে কষ্টের সাথে পথ চলতো, তখন তিনি সাথে সাথে নিজ মাথায় বোঝার কিছু অংশ গ্রহণ করে বোঝা বহনকারীকে ভারমুক্ত করতেন। কখনো যদি কোন ব্যক্তির হাত থেকে মূল্যহীন তুচ্ছ জিনিসও পড়ে যেত, তিনি রাষ্ট্রপতি হয়েও কোন দ্বিধা সংকোচ না করে তা যত্নের সাথে তুলে দিতেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েও তিনি নিজের কাজগুলো নিজেই করতেন। কোন জিনিস কেনার প্রয়োজন হলে তিনি নিজেই বাজারে যেতেন। একবার তিনি সন্তানদের জন্যে বাজার থেকে কিছু খাদ্য ক্রয় করে তা নিজের কাঁধে উঠিয়ে নিচ্ছেন। এমন সময় একটি লোক তাঁর দিকে এগিয়ে এসে বললেনঃ আমিরুল মুমেনীন, এগুলো আমার কাঁধে দিন, আমি আপনার বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়ে আসি। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি হযরত আলী (রাঃ) হাসিমুখে বললেনঃ সন্তানদের জন্য বোঝা বহন করা পিতার জন্যে গৌরবের বিষয়।

দুনিয়া ও আখিরাতের মহান সম্রাট জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ছিলেন যার প্রিয়তমা স্ত্রীর পিতা, তিনি ইচ্ছে করলে পৃথিবীতে সম্পদের পাহাড় সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু যার জীবনের পরম লক্ষ্যই হলো পরকালের অনন্ত সুখ শান্তি লাভ করা, তিনি কি আর দুনিয়ার সামান্য কয়েক দিনের জিন্দেগীর জন্যে সম্পদের পাহাড় গড়তে পারেন। পার্থিব সুখ সম্ভোগকে দু'পায়ে পদদলিত করে চরম কষ্টের জীবন বেছে নেন। দিনের পর দিন তার ঘরে উনুন জ্বলেনি। একদিন তিনি ক্ষুধার তীব্র যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে খাদ্যের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েন। তিনি দেখলেন এক ইহুদী মহিলা তাঁর ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্যে একজন মজুর তালাশ করছেন। হযরত আলী (রাঃ) প্রতি বালতি পানির

বিনিময়ে একটি খেজুর মজুরী হিসেবে পাবেন– ইহুদী মহিলার সাথে এ চুক্তির বিনিময়ে তিনি খাদ্য লাভ করেন। পানির বালতি সারাদিন ধরে বহন করার ফলে তাঁর হাতের তালুতে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল।

তাঁর ঘরে ঘুমানোর মত কোন বিছানা ছিল না। একটি মাত্র চামড়ার চাটাই ছিল যার উপর তিনি স্ত্রী–পুত্র নিয়ে রাত্রি যাপন করতেন আর দিনের বেলা ঐ চাটাইয়ের উপরে উটের খাবার বিছিয়ে দিতেন। তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে জীবন পছন্দ করতেন। খলিফাতুল মুসলেমীন হিসেবে বাজারের দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায় কি–না, তা যাচাইয়ের লক্ষ্যে তিনি বাজারে বাজারে ঘুরতেন। এমনিভাবে তিনি একদিন বাজারের উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, লোকেরা জানতে পারলো মুসলিম জাহানের খলিফা অমুক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। মানুষেরা দল বেঁধে হযরত আলী (রাঃ) এর পিছনে পিছনে চলতে শুরু করলো। মানুষের পদশব্দে তিনি পিছনে তাকিয়ে দেখলেন জনতার ভীড়। তাকেই দেখার উদ্দেশ্যে জনগণ তাদের দৈনন্দিন কাজ কর্ম ফেলে তাঁর পিছু নিয়েছে। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে জনতাকে লক্ষ্য করে বললেনঃ কোন রাষ্ট্র প্রধানের পিছে এভাবে আসবে না। এতে করে তাঁর মনে অহংকার ও ক্ষমতার প্রতি লোভ সৃষ্টি হতে পারে। আর অহংকারী ও ক্ষমতালোভী সরকারী ব্যক্তি রাষ্ট্রযন্ত্রের জন্যে কল্যাণকর হয় না।

খলিফাতুল মুসলেমীন হযরত আলী (রাঃ) এর দৈনন্দিন খাদ্য খাবার ছিল অত্যন্ত সাদাসিধে। আল্লাহর নবী (সাঃ)–এর এক সাহাবী তাঁর কাছে এসে দেখেন, খলিফা একটি শতছিন্ন খেজুর পাতার তৈরী মাদুর মসজিদে বিছিয়ে বসে আছেন। তিনি বর্ণনা করেন, "খলিফার পাশে তখন পানি পান করার একটি পাত্র ছিল। তিনি আমাকে দেখে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। একটু পরে একটি পাত্র হাতে তিনি ফিরে এলেন। আমি ধারণা করলাম পাত্রের মধ্যে নিশ্চয় সুস্বাদু খাবার আছে। কিন্তু আমার ধারণা মিথ্যে প্রতিপন্ন করে খলিফা পাত্রের মধ্যে থেকে সামান্য কিছু ছাতু বের করে পানির সাথে মিশিয়ে ফেললেন। গোটা মুসলিম জাহানের দুর্দন্ড প্রতাবশালী শাসক, নবী (সাঃ) এর জামাতার খাদ্যের অবস্থা দেখে আমি নিজেকে আর স্থির রাখতে পারলাম না। আমি বললামঃ "আমীরুল মুমেনীন, এই ইরাক শহর সুস্বাদু খাদ্যের জন্যে বিখ্যাত। আর আপনি কি– না এই ইরাকে অবস্থান করেও শুধুমাত্র ছাতু পানিতে মিশিয়ে খাচ্ছেন"?

হযরত আলী (রাঃ) মৃদু হেসে জবাব দিলেনঃ "আমার জীবন বাঁচিয়ে রাখার জন্যে যতটুকু খাদ্যের প্রয়োজন আমি তার বেশী আহার করি না। আর আমার

খাবারের পাত্রটি এ জন্যেই বন্ধ রাখি যাতে কেউ অন্য কোন খাবার এর মধ্যে না রাখতে পারে।" অন্য আর একদিন তাঁর খাদ্যের অবস্থা সম্পর্কে এক সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আমি একদিন আহারের সময় খলিফার কাছে উপস্থিত হয়ে দেখলাম' তিনি রুটি আর দুধ নিয়ে আহারে বসেছেন। রুটিগুলো এতই শক্ত যে, খলিফা তা দাঁত দিয়ে ছিড়ে টুকরো করে দুধের মধ্যে ফেলছেন। এভাবে তিনি কোন দিন দুধ, কোন দিন লবণ বা সির্কা দিয়ে শুকনো রুটি খেতেন। কদাচিৎ তাঁকে গোস্ত খেতে দেখা যেত।"

বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও তিনি একজন ভিখারীর মত পোশাক পরিধান করতেন। এক সাহাবী (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ "আমি একদিন শীতের সকালে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখি, তিনি স্বল্প মূল্যের সাধারণ একটি পুরাতন চাদর গায়ে দিয়ে বসে আছেন। প্রচন্ড শীতে খলিফার শরীর থর থর করে কাঁপছে। আমি খলিফাকে বললামঃ আমীরুল মুমেনীন, রাষ্ট্রীয় তহবিলে আপনারও হক আছে। সেখান থেকে অর্থ নিয়ে নীজের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন। তবুও আপনি নিজেকে এত কষ্ট দেন কেন?" জবাবে খলিফা বললেনঃ "আমি জাতির সম্পদ থেকে আমার প্রাপ্যের বেশী নিতে পারি না। আল্লাহর কসম! আমার শরীরে সেই চাদর, যা আমি মদিনা থেকে আসার সময় সাথে করে এনেছি।"

তিনি যেমন ছিলেন বীর তেমনি বিনয়ী। যুদ্ধের ময়দানে বাতিল শক্তির কাছে আলী নামটি ছিল আতংকের প্রতীক। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে তাঁর তরবারী যুদ্ধের ময়দানে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত করতো। তিনি ক্ষীপ্র গতিতে আঘাত হেনে বাতিল শক্তির রণবূহ্য ভেঙ্গে তছনছ করে দিতেন। ইসলামী আন্দোলনের এই সিংহদীল মুজাহিদ খন্দকের ময়দানে ত্রাস সৃষ্টি করে বাতিল শক্তির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেন। এ যুদ্ধে কাফের সর্দার আমর ইবনে আবদে উদ্দ তাঁর গোটা শরীর লোহার বর্মে আবৃত করে যুদ্ধের ময়দানে এসে তর্জন গর্জন করে বলতে থাকেঃ "মুসলমানদের মধ্যে এমন কোন বীর আছে কি! যে আমার সাথে লড়াই করার সাহস রাখে?" আমরের কথা শুনে হযরত আলী (রাঃ) এর দেহে প্রবাহমান তাওহীদী রক্ত গরম হয়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে যাবার অনুমতি দিন।" নবী (সাঃ) বললেনঃ "আলী, এতো আমর, সুতরাং তুমি বসো।" আমর পুনরায় বিদ্রুপ করে বললোঃ "আমার সাথে যুদ্ধ করার মত কোন বীর নেই? তোমাদের সেই কল্পনার জান্নাত কোথায়? তোমাদের ধারণা তোমরা নিহত হলে সেই জান্নাতে

প্রবেশ করবে? তোমরা খুবই ভীরু কাপুরুষ, আমার সাথে যুদ্ধ করার তোমাদের সাহস নেই।" ইসলামের দুশমনের কথা শুনে তিনি সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন। রাসূল এবারও তাকে বসিয়ে দিলেন। ময়দানে আমর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ইসলামকে কটাক্ষ করে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলো।

হযরত আলী (রাঃ) পুনরায় উঠে দাঁড়িয়ে বললেনঃ "ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে অনুমতি দিন, আমি আমরের কণ্ঠস্তব্ধ করে দিয়ে আসি।" রাসূল (সাঃ) বললেনঃ "লোকটি তো আমর।" আলী (রাঃ) বললেনঃ "হোক সে আমর, আমি যাবো।" এবার রাসূল (সাঃ) অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে আল্লাহর ব্যঘ্র হযরত আলী (রাঃ) বীরত্ব ব্যঞ্জক কবিতা আবৃত্তি করতে করতে কাফের সর্দার আমরের মুখোমুখী হলেন। আমর জিজ্ঞাসা করলোঃ তুমি কে? আলী (রাঃ) বললেনঃ আমি আলী ইবনে আবি তালিব। আমর বললোঃ ভাতিজা, তুমি বাচ্চা মানুষ, তুমি ফিরে যাও। আমি তোমার রক্ত ঝরাতে পছন্দ করি না। আলী (রাঃ) বললেনঃ আল্লাহর কসম, আমি তোমার রক্ত ঝরাতে মোটেও অপছন্দ করি না।

আলী (রাঃ) এর কথা শুনে আমর তরবারী কোষমুক্ত করে হযরত আলীর (রাঃ) উপরে আঘাত করলো। তিনি আমরের আঘাত ঢাল দিয়ে প্রতিহত করে তরবারীর এক আঘাতে কাফের সর্দার আমরকে জাহান্নামে প্রেরণ করে কবিতা আবৃত্তি করতে করতে ফিরে এলেন। রাসূল (সাঃ) এ দৃশ্য দেখে তাকবীর ধ্বনি দিলে সমস্ত সাহাবারা (রাঃ) তাকবির ধ্বনি দিয়ে উঠেন। আমরের তরবারীর আঘাতে এ যুদ্ধে হযরত আলী (রাঃ) এর ঢাল ভেঙ্গে যায়। খায়বরের কামুছ দুর্গ কয়েক দিন অবরোধ করে রাখার পরেও যখন তা মুসলমানদের হস্তগত হলো না তখন নবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর উপরে কামুছ দুর্গ জয় করার দায়িত্ব দেন। যুদ্ধের ময়দানে যখন প্রতিপক্ষের আঘাতে তার ঢাল ভেঙ্গে যায় তখন তিনি আল্লাহু আকবর বলে গর্জন করে কামুছ দুর্গের লৌহকপাট টান দিয়ে খুলে তা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেন। তিনি কামুছ দুর্গ জয় করে হাতে ধরা লৌহকপাটটি দূরে ছুড়ে ফেলে দেন। নবী (সাঃ) হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে জানতে চাইলেনঃ আলী শুনলাম যুদ্ধের ময়দানে তোমার ঢাল ভেঙ্গে গিয়েছিল। তুমি পরে কি দিয়ে যুদ্ধ করেছ?

হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ জ্বী, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ) ঢাল ভেঙ্গে যাওয়ার পরে আমি কামুছ দুর্গের লৌহকপাটটি হাতে নিয়ে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছি। নবী (সাঃ) বললেনঃ এখন তুমি সেটা হাত দিয়ে উঠাতে পারবে? আলী (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, পারবো। নবী (সাঃ) বললেনঃ

উঠাও। হযরত আলী (রাঃ) লৌহকপাটটি অনেক চেষ্টা করেও উঠাতে পারলেন না। নবী (সাঃ) বললেনঃ লৌহকপাটটি তোমার হাতে হাত দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামীন ওটা ইসলাম বিরোধীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছেন।

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন তথা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে, মানুষ যখন খালেছ নিয়তে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে ময়দানে ইসলাম বিরোধী শক্তির সাথে লড়াই করে তখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার অনুগত বান্দাদেরকে অবশ্য অবশ্যই সাহায্য করেন। আল্লাহ কুরআনে ওয়াদা করেছেন, বাতিলের মুকাবিলায় ইসলামপন্থীদের সাহায্য করবেন। আল্লাহ যে ইসলামপন্থীদের প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন তার দৃষ্টান্ত ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে অসংখ্য। বাংলাদেশে ইসলাম পন্থীদেরকে আল্লাহ যেভাবে সাহায্য করেছেন তা ভাবতে গেলে সিজদায় মাথা নত হয়ে আসে। ১৯৭১ সনের পর এদেশে স্বশব্দে আল্লাহু আকবর বলার পরিবেশ ছিল না। ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী তৎপরতা ও নির্ভীক কণ্ঠ স্তব্ধকরে দেওয়ার জন্যে হত্যা, গুম, সন্ত্রাস থেকে শুরু করে হেন অপতৎপরতা নেই যা ইসলাম বিরোধীরা চালাচ্ছে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর প্রত্যক্ষ সাহায্যে বাংলাদেশে ইসলামের বিপ্লবী নির্ভীক আওয়াজ সংসদ ভবন থেকে শুরু করে টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত প্রকম্পিত করছে। বাতিল শক্তির সমস্ত অস্ত্র যখন ইসলামী আন্দোলনের মুকাবিলায় ভোঁতা বলে প্রমাণিত হয়েছে তখন আল্লাহর দুশমন ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা প্রচার মাধ্যমে 'তথ্য সন্ত্রাস' আরম্ভ করেছে। ইনশাল্লাহ অচিরেই তাদের যাবতীয় অপপ্রচার বুমেরাং হয়ে তাদের দিকেই ফিরে যাবে।

ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদ আল্লাহর ব্যঘ্র হযরত আলী (রাঃ) বাতিলের মুকাবেলায় যেমন ছিলেন বজ্র কঠোর আবার সত্যপন্থীদের জন্যে ছিলেন সন্তান বাৎসল পিতার মতই দয়ার্দ্র চিত্তের অধিকারী। কঠোর মেজাজের অধিকারী হযরত ওমর (রাঃ)ও কতটা কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তা একটি ঘটনাতে দেখা যায়ঃ হযরত আলী (রাঃ) এর ছেলে যিনি বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাতি, হযরত হোছাইন (রাঃ) ও বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসক খলিফা ওমরের (রাঃ) এর ছেলে আব্দুল্লাহ বাল্যকালে এক সাথে খেলা করছিলেন। হঠাৎ তাদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। বাদানুবাদের এক পর্যায়ে হযরতে হোছাইন (রাঃ) হযরতে আব্দুল্লাহ (রাঃ) কে বললেনঃ 'দেখ আব্দুল্লাহ, তুমি বেশী কথা বলবে না। তোমার মনে রাখা উচিত, তোমার

পিতা ছিলেন আমার নানা নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোলাম। হযরত হোছাইনের এ ধরনের কথা শুনে হযরত আব্দুল্লাহর আত্মসম্মানে একটু আঘাত লাগলো। তিনি পিতা খলিফা ওমর (রাঃ) এর নিকট গিয়ে কেঁদে কেঁদে হযরত হোছাইনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন।

কৃত্রিম ক্রোধে খলিফা বললেনঃ আমি আজই এর বিচার করবো। হযরত আলী (রাঃ) এ সমস্ত কথা শুনে বললেনঃ ভাই ওমর, ছোট ছেলেরা কি বলেছে আর না বলেছে তা নিয়ে লোকজন ডেকে বিচার বসানো ভালো দেখায় না। আমার ছেলে যে কথা বলেছে, ছোট মানুষ না বুঝে বলেছে। তুমি তা ভুলে গেলেই তো পারো। ওমর (রাঃ) বললেনঃ না! হোছাইন যা বলেছে তা ভুলে যাওয়ার মত কথা নয়। আমি আজই এর বিচার করবো।

বিচার বসেছে। হযরতে আলী (রাঃ) ছেলে সহ এসেছেন। বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য। সবাই এসেছে রাছুল (সাঃ) এর নাতি হোছাইনকে ওমর (রাঃ) কি শাস্তি দেয় তা দেখার জন্য। হযরত আলী (রাঃ) বিব্রত বোধ করছেন। ওমর (রাঃ) তার ছেলে আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করলেন। হোছাইন তোমাকে কি বলে গালি দিয়েছে? আবদুল্লাহ (রাঃ) বললেনঃ হোছাইন আমাকে বলেছে, তোমার পিতা আমার নানা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর গোলাম ছিল। এবার ওমর (রাঃ) হোছাইনকে জিজ্ঞাসা করলেনঃ তুমি কি এ কথা বলেছো? হোছাইন (রাঃ) বললেনঃ জ্বি, বলেছি। হযরত ওমর (রাঃ) বললেনঃ তুমি যা বলেছো তা একটি কাগজে লিখে দাও। হোছাইন (রাঃ) তাঁর বলা কথাগুলো কাগজে লিখে খলিফা ওমর (রাঃ) এর হাতে দিলেন।

মুসলিম জাহানের খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) হোছাইনের হাতে থেকে লিখিত কাগজটি নিয়ে পড়ে দুই চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কেঁদে কেঁদে ছেলে আব্দুল্লাহকে বললেনঃ আব্দুল্লাহ, এই কাগজটি বাড়ীতে অত্যন্ত যত্নের সাথে রাখবে। আর আমি ওমর যে দিন এই দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় নিয়ে যাবো, সেদিন আমার কাফনের মধ্যে এই কাগজের টুকরাটি দিয়ে দিবে। কবরের মধ্যে ফেরেশতারা যখন আমার কাছে আসবে তখন আমি এই কাগজ দেখিয়ে বলবো, আল্লাহর প্রিয় হাবিব, বিশ্ব নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নাতি, বেহেশতে যুবকদের সর্দার হযরতে হোছাইন (রাঃ) লিখিতভাবে সাক্ষী দিয়েছে "আমি ওমর ছিলাম নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর গোলাম।"

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সার্বিক তৎপরতা পরিচালিত হয় মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। এ জন্যে হযরত ওমর (রাঃ) কৌশল করে এমন

একটি সার্টিফিকেট সংগ্রহ করলেন, যে সার্টিফিকেট থাকলে আল্লাহর জান্নাত তাকে স্বাগত জানাবে। ইসলামী আন্দোলনের মুজাহিদগণ ক্ষমতা হাতে পেলে, তা আল্লাহর নেয়ামত বলে মনে করেন। এই নেয়ামতকে যথাযতভাবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে তাঁরা প্রশাসনের সর্বত্র সৎলোক নিয়োগ করেন। ফলে গোটা দেশের প্রশাসন জনগণের সেবকে পরিণত হয়।

বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক হয়েও হযরত আলী (রাঃ) নিজ হাতে ছেঁড়া জুতা সেলাই করে পায়ে দিতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেনঃ আমি একদিন খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে গিয়ে দেখলাম, তিনি নিজ হাতে জুতা সেলাই করছেন। আমি প্রশ্ন করলামঃ আমীরুল মোমেনীন, আপনার এই জুতার মূল্য কত? আমার প্রশ্নের প্রকৃত অর্থ তিনি অনুধাবন করে বললেনঃ আল্লাহর কসম, নিজ হাতে জুতা সেলাই করে তা ব্যবহার করা আমার কাছে খুবই প্রিয়। আমি দেখেছি, আল্লাহর নবী (সাঃ) নিজ হাতে জুতা সেলাই করে পরতেন। তিনি (সাঃ) পরিধেয় বস্ত্র ছিড়ে গেলে নিজ হাতে তালি লাগাতেন, খচ্চরের উপরে বসে তিনি পিছনে কাওকে বসিয়ে নিতেন।

হযরত আলী (রাঃ) জনগণের সাথে এমনভাবে মিশতেন যে, তাকে শাসক বলে সনাক্ত করা কষ্টকর হতো। আল্লাহর আইনের অধীনে এবং সৎলোকের শাসন পদ্ধতিতে দেশ ও জনগণ এমন শাসক লাভ করে, যারা রাষ্ট্রীয় তহবিল (TREASERY) থেকে নূন্যতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করেন না। একদিন খলিফাতুল মুসলেমিন হযরত আলী (রাঃ) ছেঁড়া তালিযুক্ত জামা পরে দাঁড়িয়ে আছেন। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে খলিফাকে বললোঃ আপনি ছেঁড়া জামা কেন ব্যবহার করেন? খলিফা হিসেবে তো একটু ভালো জামা কাপড় ব্যবহার করতে পারেন। হযরত আলী (রাঃ) মৃদু হেসে বললেনঃ পুরাতন ছেঁড়া তালিযুক্ত জামা পরিধান করলে অন্তরে বিনয় ও নম্রতার উদ্রেক হয়। অহংকার সৃষ্টি হয় না।

ইসলামী আন্দোলন তার নিজস্ব পদ্ধতিতে এমন মানুষ তৈরী করে যারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে নিজেদেরকে দেশের সাধারণ জনগণের থেকে কোন দিক দিয়েই বেশী মর্যাদার অধিকারী মনে করেন না। বরং ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি আদালতে আখিরাতে আল্লাহর দরবারে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহী করার ভয়ে দিবারাত্রি যে অস্থিরতার মধ্যদিয়ে অতিবাহিত করেন, তার থেকে শত সহস্র গুণে সে রাষ্ট্রের একজন সাধারণ নাগরিক শান্তিতে জীবন অতিবাহিত করে।

একই মোহনায়

ঘটনাক্রমে খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর ঢাল হারিয়ে যায়। তিনি এক ইহুদীকে আসামী করে কাজীর কাছে নালিশ দায়ের করেন। বিচারের দিনে খলিফারই নিয়োগ করা বিচারক তাঁর আসনে সমাসীন। আর বিশাল সাম্রাজ্যের দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক খলিফা হযরত আলী (রাঃ) আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিচার প্রার্থনা করছেন। বিচারক ইহুদীকে জিজ্ঞাসা করলো সে খলিফার ঢাল চুরি করেছে কি- না? ইহুদী খলিফার অভিযোগ সরাসরি অস্বীকার করলো। এবার বিচারক খলিফার দিকে তাকিয়ে জলদগম্ভির কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার অভিযোগের স্বপক্ষে কোন সাক্ষী আছে? খলিফা বিনয়ের সাথে বললেনঃ জ্বী, সাক্ষী আমার ছেলে হোছাইন এবং আমার গোলাম। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের বিচারক আদালতে সন্তান ও গোলামের সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় বলে মামলাটি খারিজ (DISMISSED) করে দেন।

বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিশ্বর হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা তারই নিয়োগকৃত বিচারক, সন্তান ও চাকরের সাক্ষী আদালতে গ্রহণযোগ্য নয় বলে মামলাটি খারিজ করে দেওয়ার পরে মামলার বিবাদী ইহুদী ব্যক্তিটি অবাক বিস্ময়ে হযরত আলী (রাঃ) এর দিকে তাকিয়ে থাকে। মহান খলিফা বিচারকের মন্তব্য শুনে নীরবে নিঃশব্দে বাড়ির দিকে রওয়ানা দেবার উদ্যোগ নেন। ইহুদী দৌড়িয়ে গিয়ে খলিফার পথরোধ করে বলতে লাগলেনঃ সার্থক আপনাদের জীবন আর সার্থক ঐ আদর্শ, যে আদর্শ শাসক ও শাসিতের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না। ধন্য সেই নবী, যার আনিত আদর্শ এমন উৎকৃষ্ট চরিত্র সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করেছে।

হে আমীরুল মুমেনীন, ঢালটি সত্যই আপনার। আমিই তা চুরি করেছিলাম। এই নিন আপনার ঢাল, শুধু ঢালই নয়- আমার জীবন, যৌবন, ধন, সম্পদ যা আছে, আজ থেকে সব কিছু আমি আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করলাম। আমি আজ থেকে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনে রাষ্ট্রপতি বা যে কোন ক্ষমতাধর ব্যক্তি, দেশের সাধারণ একজন নাগরিকের প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধার (RIGHT OF

CITIZEN) অতিরিক্ত কোন সুবিধা ভোগ করতে পারেন না। ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন। ফলে বিচারও হয় পুরোপুরি নিরপেক্ষ। আখেরাতে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহীর ভয়ে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও আল্লাহর আইনকে উচ্চে তুলে ধরেছেন।

বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের মহান খলিফা হযরত আলী (রাঃ) প্রতিদিন ফজরের নামাজের সময় মসজিদে যাওয়ার পথে ঘুমন্ত মানুষদেরকে নামাজ আদায় করার জন্য ডাকতে ডাকতে মসজিদে যেতেন। এমনি ভাবে একদিন ফজরের নামাজের সময় তিনি বাড়ী থেকে বের হয়ে মানুষদেরকে নামাজের প্রতি আহবান জানাতে জানাতে মসজিদের দিকে যাচ্ছেন, এমন সময় ইবন মুলজিম নামক এক পাপিষ্ঠ খলিফাকে ছুরিকাঘাত করে।

খলিফা মারাত্মক আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যান। এই গুপ্ত ঘাতক ইবন মুলজিমকে ধরে খলিফার সামনে আনা হলে তিনি বললেনঃ আততায়ী ইবন মুলজিম এখন বন্দী। তাঁর থাকা খাওয়ার উত্তম ব্যবস্থা কর। আমি যদি সুস্থ্য হয়ে উঠি, তাহলে এই ঘাতককে ক্ষমাও করতে পারি অথবা শাস্তিও দিতে পারি। আর যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে ইবন মুলজিমকে তোমরা ততটুকুই আঘাত করবে যতটুকু আঘাত সে আমাকে করেছে। খবরদার! ওকে শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারে বেশী বাড়বাড়ি করবে না। যারা বাড়াবাড়ি করে সীমালংঘন করে মহান আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করেন না।

মানুষকে আল্লাহ ভীতি মৃত্যু যন্ত্রণার মুহূর্তেও দায়িত্বের প্রতি সজাগ রাখে। ইসলামী আন্দোলন এমন ধরনের সৎলোকই তৈরি করেছিল যাদের মহান কর্মকান্ডে মুসলমানদের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চির ভাস্বর হয়ে থাকবে। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার খলিফা আলী (রাঃ) রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। খলিফাকে দেখে এক পথিক থমকে দাঁড়িয়ে গেল। এরপর লোকটি তাঁর পিছে পিছে হাঁটতে লাগলো। খলিফা পিছনের দিকে ফিরে বললেনঃ আপনি আমার পিছনে পিছনে হাঁটছেন কেন? লোকটি বললোঃ আমীরুল মোমেনীন, আপনার মর্যাদা ও সম্মানার্থে আপনার পিছে পিছে হাঁটছি।

খলিফা হযরত আলী (রাঃ) বললেনঃ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের এই পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভুল। কারণ এতে করে শাসকদের হৃদয়ে অহংকারের উদ্রেক হয় আর আল্লাহর মুমিন বান্দাহরা অপমানিত হতে থাকে। অতএব আপনি আমার পাশাপাশি হাঁটতে থাকুন। খলিফা লোকটিকে পাশাপাশি হাঁটতে বাধ্য করলেন।

মেজাজের ভারসাম্যতা-আন্দোলনের সাফল্য

রণপ্রান্তরে প্রতিপক্ষের শক্তিশালী বীরকে দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টায় ধরাশায়ী করলেন হযরত আলী (রাঃ)। নবী (সাঃ) কর্তৃক উপহার দেওয়া জুলফিক্কার নামক সুতীক্ষ্ণ রূপালী তরবারী বিদ্যুৎ বেগে নেমে আসছে শত্রুর হৃদপিন্ড লক্ষ্য করে। কিন্তু তরবারীর অগ্রভাগ ভূলুণ্ঠিত শত্রুর বুকের কোমল ত্বক স্পর্শ করার পূর্বেই পরাজিত শত্রু হযরত আলীর পবিত্র মুখমন্ডলে তাঁর মুখের দুর্গন্ধযুক্ত কফ-লালা নিক্ষেপ করলো। ক্রোধে হযরত আলীর গৌরবর্ণ মুখমন্ডল রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তাকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন পরাজিত শত্রুকে তরবারীর তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে হিংস্র আক্রোশে ক্ষত বিক্ষত করে হত্যা করবেন। আগুনের গোলকের মত দৃষ্টি দিয়ে শত্রুর পরাজয়ের গ্লানিময় মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন হযরত আলী (রাঃ)।

তাঁর উত্তোলিত তরবারী মাঝ পথে স্থির হয়ে গেল। ক্ষণিকের মধ্যেই তাঁর পবিত্র চেহারা থেকে ক্রোধের শেষ চিহ্ন মুছে গেল। কয়েক মূহুর্ত পূর্বেও যে চেহারা থেকে ক্রোধের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছিল এখন সে চেহারায় গভীর মমতা আর আল্লাহ ভীতির নিদর্শন সুস্পষ্ট। তিনি তাঁর শত্রুকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে হতবাক শত্রু। এ-কি! আলী আমাকে হত্যা করার সুবর্ণ সুযোগ ত্যাগ করছে কেন? তাঁর নাঙ্গা তরবারীই বা কোষবদ্ধ হলো কোন অজ্ঞাত কারণে? সে তো তাঁর জীবনে অনেক শত্রুর মুকাবিলা করেছে, কিন্তু এ ধরনের ব্যতিক্রমধর্মী শত্রুর সাক্ষাৎ তাঁর জীবনে এই প্রথম। বিস্ময়ের ঘোরে শত্রুর মুখ থেকে কিছুক্ষণ কোন কথা বের হলো না। এবার শত্রুটি ধীর শান্ত কন্ঠে বললোঃ

"আমার মত মহাশত্রুকে আপনি আপনার তরবারীর নীচে পেয়েও তরবারীর সদব্যবহার না করে তা কোষবদ্ধ করলেন কোন কারণে?" আল-কুরআনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আল্লাহর সৈনিক হযরত আলী (রাঃ) শত্রুর মুখের দিকে মায়াভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ "মুসলমানেরা ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে যুদ্ধ করেনা। আমরা আল-কুরআনের নির্দেশিত পন্থায় আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষে যুদ্ধ করি। পক্ষান্তরে আপনি যখন আমার মুখমন্ডলে থু-থু নিক্ষেপ করলেন তখন আমার মনে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা জাগ্রত হয়েছিল। আমার মনের এই অবস্থা নিয়ে আমি যদি আপনাকে হত্যা করতাম তাহলে সেটা আল্লাহর সন্তুষ্টির

লক্ষ্যে হত্যা হতোনা। বরং তা হতো আমার প্রতিশোধ পরায়ণ মানসিকতার কারণে। আমি যদি আপনাকে প্রতিশোধ গ্রহণের স্বার্থে হত্যা করতাম তাহলে আদালতে আখিরাতে আল্লাহর কাছে আমাকে জবাবদিহী করতে হতো। আমি জেহাদের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতাম। আমার ব্যক্তিস্বার্থ আমাকে সওয়াব থেকে বঞ্চিত করে আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড় করিয়ে দিক তা আমি চাইনা।" বিস্ময়ে বিমূঢ় শত্রু বলে উঠলোঃ "দীর্ঘদিন যাবৎ আমি অনেক দূর থেকে আপনাদের উদারতা, মহানুভবতা ও সত্যনিষ্ঠার কাহিনী শুনে আসছি। আজ সৌভাগ্যবশতঃ আমি স্বচোক্ষে তা দর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম।" লোকটি সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে ইসলাম কবুল করলো।

অতীত, দূর অতীত, নিকট অতীত ও বর্তমান মহানুভবতা ও কর্তব্যবোধের ইতিহাসের সকল ঘটনাকে ম্লান করে দিয়েছে ইসলামী আন্দোলনের উজ্জল প্রদীপ হযরত আলী (রাঃ) এর মহানুভবতা ও কর্তব্যবোধের ইতিহাস। যুদ্ধের এক চরম মূহুর্তে যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার এমন অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে একটিও নেই। কোন জাতি মেজাজের এমন অপূর্ব ভারসাম্যতা রক্ষা করতে পারেনি বিশ্ব ইতিহাসে। ইসলামী আন্দোলনের অগ্রসৈনিকেরা মেজাজের ভারসাম্যতা, সংগ্রামের লক্ষ্য সম্পর্কে জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণেও সচেতনতা, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার, ত্যাগের কঠিন পরাকাষ্ঠা ও আদর্শের উপর হিমালয়ের মত অবিচলতা এবং অসীম সাহসিকতা দিয়ে আন্দোলনের যে সংগঠন কায়েম করে গেছেন তার গতিবেগ রুখবার কোন শক্তির অস্তিত্ব পৃথিবীতে নেই। আর এমন অদম্য অতুলনীয় ক্রুদ্ধ হৃদয়ে সীমাহীন অনুপম ক্ষমা ও মমতা বিদ্যমান থাকে, পরাক্রমশালী সৈনিক চরম মুহূর্তেও প্রাণের শত্রুকে আদর্শিক কর্তব্যবোধে নিষ্কৃতি দিতে পারেন, এত বড় মহান জিতেন্দ্রীয় ক্ষমাশীলের ইতিহাস পৃথিবী আজ পর্যন্তও রচিত করতে পারেনি।

জ্ঞানের কুঞ্জবনে জ্ঞান লোভী মধুমক্ষিকা

বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা হযরত আলী (রাঃ) এর কাছে দশজন ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে বললেনঃ আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দিলে আমরা আপনাকে একটি প্রশ্ন করার ইচ্ছে পোষণ করি। আলী (রাঃ) বললেনঃ আপনারা নির্ভীক চিত্তে স্বাধীনভাবে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। তাঁরা বললেনঃ আমাদের

দশজনের প্রশ্ন মাত্র একটি। কিন্তু আমরা আশা করি আপনি একটি প্রশ্নের দশ ধরণের উত্তর দিবেন। দশ ব্যক্তির পক্ষ থেকে একজন প্রশ্ন করলেনঃ জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম এবং কেন উত্তম? হযরত আলী (রাঃ) উত্তর দেওয়া আরম্ভ করলেনঃ

(১) মহানবী (সাঃ) এর নীতি হলো জ্ঞান, আর ফেরাউনের উত্তরাধিকার হলো সম্পদ। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(২) সম্পদশালীর শত্রুর সংখ্যা অধিক। আর জ্ঞানীর বন্ধুর সংখ্যা অধিক। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(৩) তুমি নিজে সম্পদের পাহারাদার, আর জ্ঞান তোমার পাহারাদার সুতরাং জ্ঞানই উত্তম।

(৪) জ্ঞান বিতরণে বৃদ্ধি লাভ করে, আর সম্পদ বিতরণে ক্ষয় লাভ করে। জ্ঞানই উত্তম।

(৫) সম্পদশালী হয় কৃপণ আর জ্ঞানী হয় দানশীল। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(৬) জ্ঞান চুরি করা যায়না, কিন্তু সম্পদ চুরি করা যায়। সুতরাং জ্ঞানই উত্তম।

(৭) মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তনে–বিবর্তনে জ্ঞান ক্ষতিগ্রস্ত হয়না। পক্ষান্তরে সময়ের ব্যবধানে সম্পদ ক্ষয় হয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞানই উত্তম।

(৮) জ্ঞান সীমাহীন, কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং তা গোনা যায়। জ্ঞানই সর্ব বিবেচনায় উত্তম।

(৯) জ্ঞান হৃদয়ের অন্ধকার দূর করে তা জ্যোতির্ময় ও পরিচ্ছন্ন করে। আর সম্পদ একে কালিমালিপ্ত অহংকারী করতে পারে। সুতরাং জ্ঞানই উত্তম।

(১০) জ্ঞান উত্তম। কারণ জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যেমন আমাদের মহানবী (সাঃ) আল্লাহকে বলেছেনঃ "আমরা আপনার দাসত্ব করি, আমরা আপনারই দাস।" পক্ষান্তরে সম্পদ ফেরাউন ও নমরূদকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। যারা দাবী করে যে তাঁরা–ই ইলাহ্‌।

জ্ঞান শিক্ষা করা ইসলাম তার অনুসারীদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য বলে ঘোষণা দিয়েছে। মূলতঃ ইসলাম একটি বুদ্ধি বৃত্তিক ভারসাম্যমূলক জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অনুসারীগণ অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত থাকলে তাঁরা

অপশক্তির ষড়যন্ত্রের সহজ শিকারে পরিণত হতে পারে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে আল-কুরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের অস্ত্রে সজ্জিত হতে হবে। সেই সাথে পৃথিবীর যাবতীয় বাতিল মতবাদ মতাদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। প্রয়োজনে যেন ইসলাম বিরোধী মতবাদের দুর্বল দিক সমূহের প্রতি আঙ্গুলী নির্দেশ করা যায়।

ইসলামের অনুসারীদের যদি ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা বা জ্ঞান না থাকে তাহলে মুমিন জীবনে তাওহীদের ছদ্মাবরণে শিরক্‌রূপী দানব প্রবেশ করতে পারে। পরিণামে গোটা জীবনের সৎ আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যেতে পারে। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাহঃ) এর কাছে জ্ঞান নামক অস্ত্র মওজুত থাকার ফলে একবার তিনি ধ্বংস গহবরের প্রবল আকর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা করেন।

গভীর রজনীতে মানব চক্ষুর অন্তরালে বসে তিনি আল্লাহ নামের যিক্‌র করছেন। এমন সময় ইবলিস শয়তান জ্যোতির্ময় রূপে তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলছেঃ "হে আব্দুল কাদের, তোমার আহবানে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। তাই আমি আল্লাহ আরশ কুরসীসহ তোমার সামনে উপস্থিত হয়েছি।" আব্দুল কাদের জিলানী (রাহঃ) শয়তানের এই ধরণের প্রলোভন দেখে সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর স্মৃতির স্তরে স্তরে রক্ষিত কুরআন হাদিসের বিশাল জ্ঞানভান্ডারে "নবী বা অন্য কারো কাছে আল্লাহ উপস্থিত হয়েছে" এমন ধরণের কোন রত্ন আছে কি-না তা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন।

তিনি তাঁর বিশাল জ্ঞানরাজ্যে অনুসন্ধান করে দেখলেন, না। এমন ধরণের কোন ঘটনা অন্য কোন নবীর জীবনে তো দেখা যায়-ই না' এমনকি মহানবী (সাঃ) এর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গণেও এ ধরণের কোন লক্ষণ নেই। তখন তিনি তাঁর সামনে উপবিষ্ট শয়তানকে বললেনঃ "নিঃসন্দেহে তুই ইবলিস শয়তান, আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।" শয়তান তখন বললোঃ আব্দুল কাদের, "আজ তোর জ্ঞান তোকে জাহান্নামের প্রজ্জলিত হুতাশন থেকে বাঁচালো।"

আব্দুল কাদের জিলানী (রাহঃ) তীব্র প্রতিবাদ করে বললেনঃ "অসম্ভব, জ্ঞান নয়-আমার আল্লাহ আমাকে তোর প্রলোভন থেকে হেফাজত করেছেন।" তিনি যদি শয়তানের কথার সমর্থনে বলতেন যে, "হ্যাঁ, আমার জ্ঞানই আমাকে তোর প্রলোভন থেকে হেফাজত করেছে।" তাহলে আল্লাহর রহমতের উপরে জ্ঞানের শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। এতে করে তিনি "শিরক" নামক

মহাপাপে জড়িয়ে পড়তেন। সুতরাং শয়তানের কথার উত্তরে কি বলতে হবে, সে কথাও তিনি কুরআন হাদিস অধ্যায়ন করেই অবগত হয়েছিলেন।

জ্ঞানের কুঞ্জবনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে মধুমক্ষীকার মতই বিচরণ করতে হবে। জ্ঞান বিজ্ঞানে মুসলমানেরা যতদিন নেতৃত্ব দিয়েছে, ইতিহাস সাক্ষী পৃথিবীর নেতৃত্ব তদাবধি মুসলমানদের পদতলেই ছিল। অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের কন্টকাকীর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে মুসলমানেরা যখন বিলাসীতার কুসুমাস্তীর্ণ পথের যাত্রী হয়েছে, তখনই তাঁরা বিশ্বের দরবারে তাদের নেতৃত্বের আসন হারিয়েছে। অথচ এই মুসলিম জাতির ইতিহাসেই দেখা যায়, এরা যুদ্ধের সন্ধির শর্ত হিসেবে জ্ঞানের অন্যতম মাধ্যম "পুস্তক" দানকে স্থির করেছেন।

পূর্ব রোমের সম্রাট নিসোফোরাস শক্তির গর্বে অন্ধ হয়ে বাগদাদের খলিফা হারুন–অর রশিদকে কর (TAX) দেওয়া বন্ধ করে খলিফার কাছে এক ধৃষ্টতামূলক পত্র লিখলোঃ "ইতিপূর্বে আপনাকে কর হিসেবে যা কিছু দেওয়া হয়েছে তা সব আমার কাছে ফেরৎ পাঠাবেন। আর তা যদি ফেরৎ না পাঠান তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য।" বাগদাদের খলিফা উত্তরে সামান্য কয়টি কথা লিখলেনঃ "তোমার পত্রের উত্তর তুমি স্বচোক্ষেই দেখতে পাবে।" নিসোফোরাসের পত্রের উত্তর দিয়েই তিনি বিশাল মুসলিম সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে পূর্ব রোমের দিকে অগ্রসর হলেন।

রোম সীমান্তে প্রচন্ড যুদ্ধ হলো। খৃষ্টানশক্তি মুসলিম বাহিনীর কাছে শোচনীয় পরাজয়বরণ করলো। নিসোফোরাস আতংকগ্রস্ত হয়ে পূর্বের তুলনায় আরো অধিক কর (TAX) দেওয়ার অঙ্গিকার করে খলিফার কাছে সন্ধি ভিক্ষা করলো। ইতিমধ্যেই মুসলিম বাহিনী নিসোফোরাসের রাজ্য অর্ধেকের বেশী দখল করে নিয়েছে। তবুও বাগদাদের খলিফা হারুন–অর রশিদ এক অদ্ভুত শর্তে সন্ধি করতে রাজি হলেন।

এ এক অপূর্ব শর্ত। পৃথিবীর যুদ্ধের ইতিহাসে কোন জাতি এমন ধরণের অদ্ভুত শর্তে সন্ধি করেনি, যা করলো মুসলিম জাতি। জ্ঞান পিয়াসী হারুন–অর রশিদ নিসোফোরাসকে জানিয়ে দিলেনঃ "আপনার রাজ্যে সাহিত্য, জ্ঞান–বিজ্ঞানসহ যত ধরণের পুস্তক আছে, তার প্রতিটি পুস্তকের এক কপি করে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমি আপনার রাজ্য আপনাকে ফিরিয়ে দিব। নতুবা আমি আপনার রাজ্যের বাকি অংশও দখল করে নিব।

ধন সম্পদ রাজ্যের পরিবর্তে সাহিত্য ভান্ডার। মুসলমানদের অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপ। পৃথিবীর কোন জনগোষ্ঠী এ ধরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেনি- তাদের পক্ষে সম্ভবও নয়। কিন্তু মুসলমানদের কাছে সম্ভব। কারণ কুরআনের প্রথম অবতীর্ণ বাক্যই হলো "ইকরা" পড়ো। এ জন্যে ইসলামী আন্দোলনের সৈনিকদের জন্যে কুরআনের নির্দেশানুযায়ী জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে বিশাল ভূখন্ড ছেড়ে দিয়ে পুস্তক গ্রহণ করে যুদ্ধ বিরতি মেনে নেওয়া সম্ভব। বাগদাদের খলিফা জ্ঞান তাপস হারুন-অর রশিদের প্রস্তাব নিসোফোরাস গ্রহণ করলো। খলিফা তাঁর দেশের শিক্ষক ও বুদ্ধিজীবীদেরকে দলে দলে এশিয়া মাইনরে পাঠালেন। তাঁরা দিনের পর দিন পরিশ্রম কর বহু মূল্যবাণ পুস্তক সংগ্রহ করে বাগদাদের খলিফার কাছে প্রেরণ করলেন।

আজ সেই মুসলিম জাতি বাতিলশক্তির ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জ্ঞান সাধনায় বিরতি দিয়ে চিত্ত বিনোদনে কাল কাটাচ্ছে। এই মুসলমানেরা মৃত্যু শয্যায় শায়িতাবস্থায় থেকেও জ্ঞানার্জনের প্রতি যে আগ্রহ পোষণ করেছে গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে তার একটি নগন্য দৃষ্টান্তও নেই। স্বনাম ধন্য মুসলিম আইনবিদ আবুল হাসান জ্ঞানানুসন্ধিৎসু আল-বেরুনীর মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে এক আশ্চর্যজনক অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, তিনি বলেনঃ যখন আমি আল-বেরুনীর মৃত্যু শয্যার নিকটে পৌছালাম, তখন দেখলাম তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। তাঁর চোখে মুখে মৃত্যুর লক্ষণ সুস্পষ্ট। চরম কষ্টের বাধা অতিক্রম করে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "একদিন আপনি আমাকে নানীর সম্পত্তি বন্টন সম্পর্কে ইসলামের নীতিমালা শুনিয়েছিলেন। এখন তা আমার স্মরণে নেই। আপনি যদি তা পুনরায় উল্লেখ করেন তাহলে আমি সে কথাগুলো স্মরণে আনতে পারি।"

আমি বললামঃ আপনার এই কঠিন মুহূর্তে আমি সেই আলোচনা কিভাবে উথাপন করতে পারি? তিনি বললেনঃ আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেনঃ "তোমরা দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন কর"। অতএব ঐ বিষয়টি জেনেই পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করা উত্তম। আইনবিদ আবুল হাসান বলেনঃ আমি নানীর সম্পত্তি বন্টনের ইসলামী নীতিমালা বর্ণনা করলাম। মৃত্যু পথযাত্রী আল-বেরুনী তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে মুখস্থ করলেন। তাঁর মুখস্ত সম্পর্কে কোন ভুল হয় কিনা এ জন্যে তিনি তা আমাকে শোনালেন। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। যার চোখে মুখে মৃত্যু যন্ত্রণার চিহ্ন। মৃত্যুদূত যার শিয়রে দন্ডায়মান।

তিনি আমার বর্ণনাকৃত নানীর সম্পত্তি বন্টনের নীতিমালা সমূহ হুবহু বর্ণনা করলেন। তাঁর বর্ণনায় একটি শব্দও ভুল নেই।

এরপর তাঁর গৃহ ত্যাগ করে আমি পথে আসতেই শুনতে পেলাম এই মহান জ্ঞান তাপস এ পৃথিবীতে আর নেই। মৃত্যু তাকে চিরদিনের জন্যে নীরব নিথর নিস্তব্ধ স্পন্দনহীন করে দিয়েছে। তিনি মহান আল্লাহর দরবারে উপনীত হয়েছেন।

বলাবাহুল্য জ্ঞানের অস্ত্র ব্যতীত আইয়ামে জাহিলিয়াতের তুলনায় অধিক বিপজ্জনক বর্তমান আধুনিক জাহিলিয়াতকে মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমান ধ্বংস করতে শয়তান সদা তৎপর। এই অশুভ শক্তি চোরাপথে তাওহীদের সৈনিকদের জীবনের বিস্তৃত অঙ্গণে প্রবেশ করে যে কোন মুহূর্তে জীবনের যাবতীয় সৎ আমলসমূহ, যা কঠিন ত্যাগের বিনিময়ে মুমিন অর্জন করেছে—শয়তান ধ্বংস করে দিতে পারে। এ জন্যে জ্ঞানের অস্ত্র দিয়ে বাতিলের মুকাবিলায় ঈমানকে হেফাজত করতে হবে।

কঠিন পাষাণসম তরল জলধি

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জীবনের প্রতিটি স্পন্দনই আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে স্পন্দিত হয়। কারণ এ আন্দোলনের কর্মীরা তাদের জানমাল আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দেয়। নিজের "ব্যক্তিগত" বলতে এ আন্দোলনের কর্মীদের কিছুই নাই। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন তথা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যখন যা প্রয়োজন ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা হাসিমুখে তা—ই দিতে বাধ্য। পরিবেশ পরিস্থিতি চলার পথ যতই কন্টকাকীর্ণ বন্ধুর হোক না কেন, ইসলামের মুজাহিদদের সে পথ আল্লাহর উপরে নির্ভর করে অতিক্রম করতে হয় মনযিলে মকছুদে পৌছানোর লক্ষ্যে।

এ আন্দোলনের প্রতিটি বাঁকে যেমন বাধার বিন্ধাচল পড়বে তেমনি তা অতিক্রম করতে গিয়ে আল্লাহর সাহায্যও পাওয়া যাবে। সামনের পথ ঘন তমসাবৃত অলংঘনীয় বাধার বিন্ধাচল দেখে থমকে দাঁড়ালে আল্লাহর সাহায্য আশা করা বৃথা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পৃথিবীব্যাপী বাতিলশক্তির শেষচিহ্ন মুছে দিয়ে তাওহীদের বিজয় কেতন উড়িয়ে দেবার জন্যে, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যখন শত প্রতিকূলতা অতিক্রম

করে ময়দানে এগিয়ে গিয়েছে তখন প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর সাহায্যও এসে উপস্থিত হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসে দেখা যায়ঃ

পারস্য অভিযানের সময় পারস্য সেনাবাহিনী খরস্রোতা বেগবান দজলা নদী পারাপারের যাবতীয় ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেয়। যাতে মুসলমানেরা নদীর ওপারের দেশ সমূহে আল কুরআনের আলোর শিখা জ্বালাতে না পারে। পারস্যের অগ্নি উপাসক সেনাবাহিনী নদীর উপরের একমাত্র সেতুটি ধ্বংস করে দিয়ে ওপারে দাঁড়িয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রতি বিদ্রূপ করছে। কিন্তু অগ্নিপূজারী জড়বাদীরা জানেনা, তাওহীদের প্রজ্জ্বলিত মশাল হাতে আল কুরআনের অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী বাহিনীর চলার পথে সাগর, মহাসাগর তুচ্ছ-গগণচুম্বি বাধার বিন্ধাচলকেও এরা নিষ্ঠুর পায়ে পদদলিত করে সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হয়, তাওহীদের চেতনাকে সমুন্নত রাখতে।

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সেনাপতি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর শাহাদাতের চেতনায় উজ্জীবিত সেনাবাহিনীকে দজলা নদীর তীরে সমবেত করে বললেনঃ

"আল্লাহর প্রিয় বান্দাহরা, আমরা কেউ ব্যক্তিস্বার্থে যুদ্ধ করিনা। আল্লাহর সৃষ্টি পৃথিবী থেকে মানব রচিত মতবাদ মতাদর্শের কবর রচিত করে, বাতিলশক্তিকে সমূলে ধ্বংস করে সেই ধ্বংসের উপরে তাওহীদের পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে আমরা হাতে তরবারী ধরেছি। যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল সম্পূর্ণরূপে উৎখাত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের তরবারী কোষাবদ্ধ হবেনা। পারস্যের অগ্নি উপাসক জড়বাদী শোষকগোষ্ঠী জাতিকে শোষণ করে প্রাচুর্য্যতার বিশাল পাহাড় নির্মাণ করেছে।

হেরার তাওহীদের প্রজ্জ্বল শিখা যখন এই দজলা নদীর উত্তাল উর্মিমালার শুভ্র শিখরে পতিত হয়েছে তখন তাঁরা জাতির কষ্টার্জিত বিশাল সম্পদ রাশি কুক্ষিগত করে পালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। ওরা চিন্তা করেছে দজলার সেতু চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে তাওহীদের পতাকাবাহী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের গতিবেগ রুখবে। কিন্তু ওরা জানে না আমরা আল কুরআনের সৈনিক। সাগরের স্রোতের সাথেও আমরা লড়তে জানি। আমরা কিছুতেই মেহনতী মানুষের ঘামঝরা সম্পদ নিয়ে পারস্যের জড়বাদী শোষক গোষ্ঠীকে পলায়ণ করতে দিব না। পারস্য সম্রাট ইয়াযদর্গিদের সিংহাসনে আল-কুরআনকে সমাসীন করবোই। ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী পার্থিব কোন শক্তির উপরে নির্ভর করেনা। সুতরাং আমরা সেতুর উপরে নির্ভরশীল নই। আমি

আল্লাহর নামে সর্বপ্রথমে ঘোড়ায় আরোহণ করে নদীতে নেমে যাচ্ছি, তোমরাও সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর উপর ভরসা করে আমাকে অনুসরণ করো। আল্লাহ নিশ্চয়ই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।"

মুজাহিদদের সেনাপতি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) তাঁর ভাষণ শেষ করেই ঘোড়াসহ ঝাঁপিয়ে পড়লেন যৌবনবতী খরস্রোতা উত্তাল উর্মিমালার ভয়ংকর গর্জনশীল স্রোতস্বিনী দজলা নদীর বুকে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের একমাত্র সাহায্যকারী মহান আল্লাহ রব্বুল আলামিন দজলার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালাকে যেন কঠিন শিলায় রূপান্তরিত করলেন। ইসলামের মুজাহিদরা নির্বিঘ্নে নদীর ওপারে গিয়ে পৌছালেন। সেনাপতি সেনাবাহিনীর কাছে জানতে চাইলেনঃ "তোমাদের কারো কোন ক্ষতি হয়েছে কি-না?" সেনাবাহিনীর মধ্যে থেকে একজন বলে উঠলেনঃ "আমার পানি পান করার একটি গ্লাস নদীর মধ্যে পড়ে গেছে।"

সেনাপতি বললেনঃ "অসম্ভব! ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর একটি কেশেরও ক্ষতি করতে পারেনা দজলা নদী।" সেনাপতির কথা শেষ না হতেই উত্তাল তরঙ্গের আঘাতে গ্লাসটি নদীর বেলাভূমিতে আছড়ে পড়লো। হযরতে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর নেতৃত্বে ইসলামের মুজাহিদ বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়েই পারস্য সম্রাট স্বদলবলে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে পালিয়ে যায়। মুসলমানদেরকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়া দেখেই বাতিল শক্তি চিৎকার করে বলেছিলঃ দৈত্য আসছে, দানব আসছে, যে যত দ্রুত পারো পালাও।

এজন্যে কবি বলছেনঃ

দাস্ত্ তো দাস্ত্ হ্যায়, দ্যরিয়া ভি না ছোড়ে হাম্‌নে
বাহ্‌রে জুলম্যত্‌মে দৌড়ে দিয়া ঘোড়ে হাম্‌নে।

আমরা তাওহীদের আওয়াজকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রান্তর, তেপান্তর কোন কিছুরই পরোয়া করিনি। ঘনতমশাবৃত অন্ধকারেও স্রোতস্বিনী নদীর মধ্যে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছি।

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) যখন পারস্যের মেহনতী জনতাকে শোষণ করে গড়া নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমন্ডিত বিশাল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করলেন তখন তাঁর মুখ থেকে কুরআনের আয়াত বেরিয়ে এলোঃ

তাঁরা পেছনে ছেড়ে গিয়েছিল কত উদ্যান ও প্রস্রবন, কত শস্যক্ষেত ও সুরম্য প্রাসাদ এবং কত বিলাস-উপকরণ যা তাদেরকে আনন্দ দিত। এমনটিই

ঘটেছিল এবং আমি এসব কিছুর উত্তরাধিকারী করেছিলাম অন্য সম্প্রদায়কে।
(সূরা দুখান ঃ ২৫-২৮)

হযরত সা'দ শ্বেত রাজপ্রাসাদে আট রাকায়াত "সালাতুল ফাতাহ্" নামাজ আদায় করেই ঘোষণা দিলেনঃ আজ এই শাহী মহলেই জুমার নামাজ আদায় করা হবে। পারস্যের ইতিহাসে এটাই প্রথম জুমার নামাজ।

যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে শুধু আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার জন্যে আন্দোলনের বিপদ সংকুল ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সাহায্য করেন। কিন্তু এ পথে চলতে গিয়ে হিম্মত হারা হলে বাতিলদের ঘৃণ্য পদতলে লাঞ্ছিত হতে হবে। আল্লাহর প্রতি অসীম নির্ভরশীলতাই তাঁর সাহায্য আগমনের দ্বার উন্মুক্ত করবে। ইসলামী আন্দোলনের কন্টকাকীর্ণ ময়দানে কর্মীরা ত্যাগের দৃষ্টান্তহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেই নেতৃত্ব তাদের হাতে আসবে-নতুবা নয়। এ কথা মনে রাখতে হবে প্রতিটি কর্মীকেই যে, ইসলামী আন্দোলনের ময়দান ভীরু-কাপুরুষদের বিচরণ ক্ষেত্র নয়-এ উত্তপ্ত ময়দান দুর্জয় সাহসী বীর মুজাহিদদের উপযুক্ত বিচরণ ক্ষেত্র।

কোথা পেলি এ ধৃষ্টতা?

ইয়ারমুকের রণপ্রান্তর। যুদ্ধ ময়দানের এক প্রান্তে তেত্রিশ হাজার প্রাণ উৎসর্গীকৃত, শাহাদাতের উদগ্র নেশায় বিভোর মুজাহিদ বাহিনী নিম্নমানের অস্ত্র হাতে সেনাপতি আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ) এর আদেশের অপেক্ষায় দন্ডায়মান। অপর প্রান্তে তিনলক্ষ রোমক বাহিনী বিভিন্ন ধরণের ভয়ংকর দর্শন সমরাস্ত্রে সজ্জিতাবস্থায় মুসলমানদের রক্তঝরাতে প্রস্তুত। রণদামামা ঝংকার তোলার সাথে সাথেই খৃস্টান রোমক বাহিনী ঝড়ের গতিতে ইসলামের মুজাহিদদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু আল-কুরআনের বিপ্লবী বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে তিনলক্ষ বাতিলশক্তির ঝড়ের গতি মন্থর থেকে নিথর হয়ে গেল।

তদানিন্তন বিশাল পরাশক্তি রোমক বাহিনী ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মুসলমানদের কাছে সন্ধি ভিক্ষা করলো। যদিও খৃষ্টানদের হাতে ইসলামী আন্দোলনের তিন মর্দে মুজাহিদ দুর্ভাগ্যক্রমে বন্দী হয়েছিল, তবুও বাতিল শক্তি যুদ্ধের প্রথম অবস্থাতেই এ কথা সুস্পষ্টরূপে অনুধাবণ করতে পেরেছিল যে, তাওহীদ বাহিনী

সংখ্যালঘিষ্ট হলেও তাদের সাইমুমের প্রলয়ংকরী গতির সামনে রোমক বাহিনীর প্রাণক্ষয় ছাড়া এ যুদ্ধ তাদের কোন সুফল বয়ে আনবেনা।

সন্ধির শর্ত নিয়ে আলোচনার লক্ষ্যে সিপাহসালার আবু উবাইদাহ (রাঃ) এর নির্দেশক্রমে আল্লাহর তরবারী হযরত খালেদ (রাঃ) একশত জিন্দাদিল মর্দে মুজাহিদকে সাথে নিয়ে তিনলক্ষ রোমক বাহিনীর মধ্যে দিয়ে বীরদর্পে ঘোড়া ছুটিয়ে এসে প্রবেশ করলেন রোমক সেনাপতি মিনওয়ালের তাঁবুতে। সন্ধির শর্তাবলী নিয়ে আলোচনার এক পর্বে উভয় পক্ষে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় শুরু হলো। রোম সেনাপতি দম্ভভরে বললোঃ ইসলাম ডাকাতদের ধর্ম।

মিনওয়ালের মুখ থেকে এ কথা শোনার সাথে সাথে মুসলমানদের সর্ব শরীরে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে গেল। শত সহস্র মধুমক্ষিকার বিষাক্ত হুল এক সাথে যেন মুসলমানদের শরীরে বিদ্ধ হলো। হযরত খালেদ (রাঃ) ও তাঁর সঙ্গীরা তরবারী কোষমুক্ত করে আহত সিংহের ন্যায় গর্জন করে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত খালেদ (রাঃ) বললেনঃ "তোকে আজ কুকুরের মত বেঁধে নিয়ে গিয়ে খলিফাতুল মুসলেমীন ওমরের পায়ের কাছে ফেলবো। তুই যে জিহ্বা দিয়ে আমাদের প্রিয় ইসলাম সম্পর্কে অপমান জনক উক্তি করেছিস, তোর সেই ঘৃণিত জিহ্বা ওমর টেনে ছিড়ে ফেলবে।"

হযরত খালেদ (রাঃ) ও তাঁর মাত্র একশত সঙ্গী তিনলক্ষ শত্রু পরিবেষ্টিত থেকেও ইসলামের অবমাননা সহ্য করেননি। আর আজ পরিস্থিতি হয়েছে তার উল্টো। গোটা দুনিয়ার কথা আলোচনায় না এনে বলতে হয় শুধু মাত্র বাংলাদেশেই প্রায় ১২ কোটি মুসলমান বাস করে। অপর পক্ষে হাতে গোনা কয়েক জন নাস্তিক শৃগাল আর যৌন উন্মাদিনী ডাইনীরা ইসলামকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে অপমান করেও নির্বিঘ্নে নিশ্চিন্তে ১২ কোটি তৌহীদি জনতার দেশে সুসুপ্তিতে মখমলের শয্যায় যামীনি অতিবাহিত করছে। ইসলামকে অপমান করার দৃশ্য চোখে দেখেও এদেশের মুসলমানদের চোখে জ্বালা সৃষ্টি হয় না।

হযরত খালেদ (রাঃ) এর বীরত্ব দেখে সংখ্যাধিক্যের গর্বে গর্বিত রোম সেনাপতি মিনওয়াল চিৎকার করে বললোঃ খালেদ, তোমার সামনেই তোমার সঙ্গীদেরকে হত্যা করা হবে। তাহলে তুমি বুঝতে পারবে রোম সেনাপতির সাথে বেয়াদবির পরিণাম কত ভয়াবহ।

আল্লাহর তরবারী অসীম সাহসী ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় সিপাহসালার খালেদ (রাঃ) মিনওয়ালকে দৃপ্তকণ্ঠে বললেনঃ মিনওয়াল, একথা

তোর জেনে রাখা উচিত যে, মুসলমানদের জীবনের স্বর্ণালী অধ্যায় উন্মোচিত হয় মৃত্যুর পরে থেকে। মৃত্যুকে আমরা আমাদের পায়ের ভৃত্য বলে মনে করি। আমাদের প্রাণ থাকে আমাদের হাতে, আমাদের প্রভু আল্লাহ চাওয়ার সাথে সাথেই আমাদের প্রাণ তাঁর হাতে উঠিয়ে দেই। তুই কাদেরকে মৃত্যুর ভয় দেখাচ্ছিস? আল্লাহর কসম! হয় তোকে এ দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দেব, আর না হয় আমরা শাহাদাত বরণ করবো। তবুও আমরা আমাদের বন্দী মুসলিম ভাইদের মুক্ত না করে এখান থেকে যাবো না।

একথা বলেই সিংহবীর হযরত খালেদ (রাঃ) তীর বেগে ছুটে গিয়ে বাতিলশক্তি রোম সেনাপতি মিনওয়ালের বুকে তরবারী চেপে ধরে বললেনঃ তোর হাতে বন্দী আমার মুসলিম ভাইদের এখুনি ছেড়ে দিতে বল, নইলে এই মুহূর্তেই তোর মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলবো।

সত্যের সেনাপতীদের নির্ভীক আচরণ ও দুর্বীনিত সাহস দেখে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের সেনাপতি মিনওয়াল মাথানত করতে বাধ্য হলো। হযরত খালেদ (রাঃ) এর কাছে ক্ষমা ও প্রাণভিক্ষা চেয়ে মুসলিম বন্দীদেরকে তাঁর হাতে উঠিয়ে দিতে বাধ্য হলো কুফরী শক্তি।

আল্লাহর দরবারে অনুতপ্তে নত যে শির

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলমানদের কালজয়ী অমর সংবিধান আল কুরআনে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের চরিত্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট বর্ণনা করতে গিয়ে সূরায়ে তওবার এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, "মুমিন বান্দাহরা মানবীয় দুর্বলতার কারণে অপশক্তি শয়তানের প্রভাবে সাময়িকের জন্যে প্রভাবান্বিত হয়ে যখন আমার অপছন্দনীয় কোন কর্ম তাদের দ্বারা সম্পাদন হলে তাঁরা সনিৎত ফিরে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালবিলম্ব না করে আমার কাছে ক্ষমা চায়, বার বার আমাকে সিজদা করে। তওবা করে আমার দরবারে কান্না ভেজা চোখে আমার অনুগ্রহ অনুসন্ধান করে।" ইসলামী আন্দোলনের এক জানবাজ মুজাহিদ হযরত আবু মেহজানের জীবনে এ ধরণের এক ঘটনায় দেখা যায় যে, তিনি কাদেশিয়ার যুদ্ধে গিয়ে শয়তানের প্রভাবে পড়ে নিষিদ্ধ পানীয় পান করেন। তাঁর এই মদ্যপানের সংবাদ সেনাপতি হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবু মেহজানকে জিজ্ঞাসাবাদ করার

জন্যে তাঁর তাঁবুতে তলব করেন। সেনাপতি রোষকষায়িত লোচনে অভিযুক্তের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করেনঃ "আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ সত্য?" অনুতপ্তে অবনত প্রায়শ্চিত্য প্রত্যাশী হযরত আবু মেহজান সত্য গোপন না করে সজল চোখে জবাব দিলেনঃ "সন্মানিত সেনাপতি, আপনার শ্রবণইন্দ্রিয় আমার বিরুদ্ধে যা শ্রবণ করেছে তা সম্পূর্ণ সত্য। আমি শয়তানের প্রলোভনে বিভ্রান্ত হয়ে আল্লাহর আইন অমান্য করেছি। কেয়ামতের ময়দানের ভয়াবহ শাস্তি সহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনি আমার উপরে কুরআন সুন্নাহতে মদ্যপানের যে শাস্তি নির্ধারিত আছে তা প্রায়োগ করে আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে আমাকে হেফাজত করুন।" সেনাপতি সা'দ (রাঃ) আবু মেহ্জানের সত্যের প্রতি অকপটে স্বীকৃতিদান ও শাস্তি গ্রহণের প্রস্তুতি দেখে বললেনঃ "যুদ্ধ শেষে আল্লাহর দেওয়া বিধান অনুযায়ীই তোমার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। আপাততঃ তুমি বন্দী থাকবে।"

যুদ্ধ ময়দানের এক পাশের তাঁবুতে আবু মেহজান শৃংখল পায়ে বন্দী। তাঁবুর ফাঁক দিয়ে তিনি দেখলেন, ইসলামের মুজাহিদরা শাহাদাতের স্বর্গীয় হাতছানিতে আল্লাহর রাস্তায় প্রাণ উৎসর্গ করার লক্ষ্যে বীর বীক্রমে বাতিল শক্তি পারস্য বাহিনীর সাথে মরণপণ যুদ্ধে লিপ্ত। আল্লাহর অপছন্দনীয় কাজ করার ফলে তাঁর হৃদয় তন্ত্রীতে অনুতপ্তের বিষাদ সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। হক বাতিলের যুদ্ধ দর্শন করে তা বজ্র নিনাদে আর্তনাদ করে উঠলো। তিনি যুদ্ধে যোগদান করতে না পেরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনে সেনাপতি হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর স্ত্রী হযরত সালমা (রাঃ) কান্নার উৎস খুজতে গিয়ে দেখলেন বন্দী মেহ্জান উন্মাদের মত মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছেন। তিনি বন্দীকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

বন্দী আবু মেহজান অর্তনাদ করে বলতে লাগলেনঃ "আমি শয়তানের প্রতারণায় প্রতারিত হয়ে আজ শাহাদাতের হক থেকে বঞ্চিত। আন্দোলনের সাথী ভায়েরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে শাহাদাতের রক্তঝরা ময়দানে বাতিলশক্তির গতিরোধ করছে। আর আমি মদ্য পানের অপরাধে শৃংখলাবদ্ধ হয়ে বন্দী অবস্থায় অলস সময় অতিবাহিত করছি। চোখের সামনে সাথী ভায়েরা আল্লাহর দ্বীন কায়েমের মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত। আমি এই সংগ্রামে যোগদান করতে পারছিনা বলে অনুতপ্তের আগুনে আমার কলিজা পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

আপনি যদি অনুগ্রহ করে আমাকে স্বল্প সময়ের জন্যে মুক্ত করে দেন তাহলে আমি জেহাদে অংশ গ্রহণ করতে পারি। আমি মুসলমান, আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলছি, যুদ্ধ শেষে আমি নীজেই এসে পায়ে লৌহশৃংখল পরে বন্দী অবস্থায় তাঁবুতে বসে থাকবো।" আবু মেহ্জানের সজল চোখে হযরতে সালমা (রাঃ) দেখতে পেলেন শাহাদাতের দুর্দমনীয় কামনা। তিনি বন্দীর পদ যুগল শৃংখল মুক্ত করলেন। মুক্তি পেয়ে আবু মেহজান দেখতে পেলেন তাঁবুর পাশেই সেনাপতি সা'দের যুদ্ধাস্ত্র ও ঘোড়া। তিনি কালক্ষেপণ না করে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে মাথা ও মুখমন্ডল বস্ত্রে আবৃত করে উল্কার বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে "আল্লাহ আকবর" বলে সিংহ গর্জনে পারস্যের বাতিল শক্তির সামনে জীবন বাজী রেখে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁর প্রচন্ড আক্রমণে সে দিনের যুদ্ধে বাতিল শক্তির রণবুহ্য ভেঙ্গে তছনছ হয়ে যায়।

মুসলিম সৈন্যবাহিনী এই নতুন আগন্তুক মুখমন্ডলে বস্ত্রাবৃত অসীম সাহসী বীরের রণকৌশল দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। যুদ্ধ শেষে আবুমেহ্জান তাঁর ওয়াদানুযায়ী তাঁবুতে এসে পায়ে লৌহশৃংখল পরিধান করে বসে থাকে। মুসলিম শিবিরে যুদ্ধ পরিস্থিতি পর্যালোচনার এক পর্যায়ে নতুন আগন্তুক যোদ্ধার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়। পক্ষান্তরে তাকে কোন তাঁবুতেই অনুসন্ধান করে পাওয়া যায়না। এমন সময় হযরত সালমা (রাঃ) লজ্জা জড়িত কণ্ঠে স্বামী সা'দ (রাঃ) এর কাছে প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি ঘটনা শোনার সাথে সাথেই আবু মেহ্জানকে মুক্তি দিয়ে বললেনঃ

"যে ব্যক্তির হৃদয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) এর প্রেমে পরিপূর্ণ, তাকে আমি আর বন্দী রাখতে পারিনা। যাও তুমি মুক্ত।" হযরত আবু মেহ্জানও ইসলামী আন্দোলনের হাজার হাজার সৈন্যবাহিনীর সামনে তওবা করে প্রকৃত মুমিনে পরিণত হলেন।

আখিরাতমুখি দৃষ্টি যার

তারাবেলাস নগরীর বাতিল শক্তির প্রতিভূ রাজা জার্জিস একলক্ষ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের তুফানী ইনকিলাবকে স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। সে তাঁর সৈন্যদের মধ্যে ঘোষণা করে

দিলঃ যে ব্যক্তি ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতির ছিন্নমস্তক আমার দরবারে এনে হাজির করতে পারবে, তাকে আমি একহাজার দিনার ও আমার সুন্দরী কন্যা দান করবো। রাজার ঘোষণায় তাঁর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে নব জাগরণের সৃষ্টি হলো। তাঁরা দ্বিগুণ উৎসাহ উদ্দিপনা সহ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তাদের উদ্দিপনা দেখে সিপাহসালার হযরতে সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) এর মধ্যে চিন্তার কোন চিহ্ন মাত্র নেই। এমন সময় নবী (সাঃ) এর প্রিয় সাহাবী হযরতে যুবাইর (রাঃ) এসে সেনাপতি সা'দকে বললেনঃ আপনিও ঘোষণা করে দিন, যে ব্যক্তি আল্লাহর দুশমন জার্জিসের ছিন্নমস্তক এনে দিতে পারবে তাকে এক হাজার দিনার ও জার্জিসের তন্বী তরুণী ষোড়শী যুবতী সুন্দরী কন্যা দান করা হবে।

হযরত যুবাইর (রাঃ) এর পরামর্শ অনুযায়ী সা'দ (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর মধ্যে ঘোষণা করে দিলেন। শাহাদাতের কামনায় অধির তাওহীদের নিশান বরদার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অপ্রতিরোধ্য গতির মুখে বাতিল শক্তি পানির বুদ্‌বুদের মতই মিলিয়ে গেল। জার্জিসের ছিন্নমস্তক ও তাঁর সুন্দরী কন্যাকে সেনাপতি সা'দের সামনে উপস্থিত করা হলো। তিনি তাঁর অঙ্গীকার অনুযায়ী বললেনঃ তোমাদের মধ্যে যিনি বাতিল শক্তির প্রতিভূ জার্জিসের মাথা কেটে এনেছো, তিনি এসে সুন্দরী জার্জিস দুহিতাসহ একহাজার দিনার গ্রহণ করো। হাজার হাজার সৈন্য বাহিনীর মধ্যে পিন পতন নীরবতা। একটি কণ্ঠও দাবী করলো না যে, আমিই জার্জিসের হত্যাকারী– আমাকে পুরস্কার দিন। জার্জিস দুহিতা দাঁড়িয়ে দেখছেন, তাঁর সামনেই অবনত মস্তকে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরই পিতা জার্জিসের হত্যাকারী, অথচ কেন তিনি এগিয়ে এসে তাঁরমত সুন্দরী কন্যা ও একহাজার দিনার গ্রহণ করছেন না?

জার্জিস দুহিতা তাঁর চোখ দুটি বিস্ফারিত করে অপলক নেত্রে তাকিয়ে আছেন সামনে দাঁড়ানো ফেরেশ্‌তা স্বভাবের মহামানবের দিকে। দৃষ্টিতে তাঁর সীমাহীন বিস্ময়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাহলে পার্থিব স্বার্থের কারণে যুদ্ধ করেনা? সত্যই তাঁরা এক মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই তরবারী ধারণ করে? তাঁর মত সুন্দরী মেয়েকে পাবার আশায় অগণিত মানুষ লালায়িত, আর এই মুসলিম বীর তাঁর পদপ্রান্তে আমাকে পেয়েও অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। ইসলামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদদের প্রতি শ্রদ্ধায় জার্জিস দুহিতার মাথানত হয়ে এলো। তিনি কম্পিত পদক্ষেপে হযরতে যুবাইর (রাঃ) এর সামনে এগিয়ে গিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

আমার পিতা আপনার হাতে নিহত হওয়ার সময় আমি আপনাকে দেখেছি। আপনিই আমার পিতার হত্যাকারী। কিন্তু কেন আপনি আপনাদের সেনাপতির ঘোষণা অনুযায়ী পুরস্কার নেওয়ার জন্যে এগিয়ে আসছেন না? হযরত যুবাইর (রাঃ) নম্র কণ্ঠে বললেনঃ পার্থিব কোন লোভ লালসা হৃদয়ে গোপন রেখে আমি যুদ্ধ করিনি। আমি যদি কোন পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়ে থাকি তাহলে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর কাছে থেকেই সে পুরস্কার গ্রহণ করবো।

জাগতিক যাবতীয় স্বার্থের উর্ধে অবস্থান করে যারা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে বাতিলের বিরাট শক্তিকে তুচ্ছ মনে করে সংগ্রামের অগ্নিঝরা ময়দানে নিজেদেরকে উৎসর্গ করতে পারে, তাঁরাই কেবল ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। সীমাহীন ত্যাগ ও আখেরাত মুখি দৃষ্টিভঙ্গীর কারণেই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা বাতিল শক্তির মৃত্যুদূতে পরিণত হয়।

যাদের আচরণেই নিহিত থাকে প্রশ্নের উত্তর

একটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার আশায় ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের মহান শাসক খলিফা ওমর (রাঃ) এর কাছে একব্যক্তির আগমন ঘটলো। আগন্তুক দেখলেন, বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার, আল্লাহ বিরোধী শক্তির ত্রাস মহান খলিফা ওমর ফারুক (রাঃ) তাঁর জীর্ণ কুঠির থেকে বের হলেন। কাঁধে তাঁর মাটির একটি পাত্র। বাড়ী থেকে বেশ দূরে খলিফা পানির একটি কূপের কাছে গিয়ে কূপ থেকে পানি নিজহাতে উঠালেন। পানি ভর্তি পাত্রটি কাঁধে নিয়ে তিনি বাড়ীর দিকে আসছেন। আগন্তুক খলিফার কষ্ট দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না।

তিনি দৌড়িয়ে খলিফার কাছে গিয়ে বিনয়ের সাথে বললেনঃ আমীরুল মুসলেমীন, অনুগ্রহ করে পানির পাত্রটি আমার কাছে দিন। খলিফা স্মিতহাস্যে আগন্তুককে বললেনঃ আমার পরিবার পরিজনদের সেবা করে আমি আল্লাহর নির্দেশ পালন করি এটা কি আপনি চান না? আচ্ছা, আমার কাছে আপনি কি প্রয়োজনে এসেছেন বলুন? আগন্তুক বললেনঃ কিন্তু এভাবে আমি কথা বলতে

আপনি তো পানির পাত্র নিয়ে কষ্ট পাবেন? সুতরাং আপনি বাড়ীতে চলুন তারপর ধীরে সুস্থে আমার কথা শুনবেন।

আগন্তুকের কথা শুনে খলিফা স্থির হয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করলেন, আমি জাতির সেবক। আমার ব্যাক্তিগত প্রয়োজনের তুলনায় জাতীয় প্রয়োজন অগ্রগণ্য। সুতরাং আগন্তুকের কথাই আগে শুনতে হবে। তিনি পানিপূর্ণ পাত্রটি কাঁধে থেকে নামিয়ে হাঁটু ভাজ করে জানুর উপরে রেখে বলনেঃ এবার বলুন আপনার সমস্যার কথা। আগন্তুক বললেন, আপনি তো কষ্ট পাচ্ছেন, পানির পাত্রটি মাটিতে নামিয়ে রেখে আমার কথা শুনুন।

খলিফা ওমর (রাঃ) বললেনঃ এই পানির পাত্রের নীচের অংশ ভেজা। আমি তা অপরের মালিকানাধীন জমিতে নামিয়ে রাখলে পাত্রের নীচে মাটি লেগে যাবে। আর সেই মাটি আমার বাড়ীতে গেলে আমি ওমর কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর সামনে কি জবাব দিব? আগন্তুক বললেনঃ আমীরুল মুসলেমীন, আপনি আর কষ্ট করবেন না– বাড়ীতে যান। আমি আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়ে গেছি। খলিফা বললেনঃ বলুন তো, আসলে আপনি কি প্রয়োজনে আমার কাছে এসেছিলেন? আগন্তুক বললেনঃ আমি আপনার নিকট জানতে এসেছিলাম বর্তমানে ভূমি জরীপ করার সময় অন্য ব্যক্তির কিছু জমি আমার জমির মধ্যে এসে গেছে, আমার জন্যে সেই জমি বৈধ কি–না?

আল্লাহর আইনের অধীনে সৎলোকের শাসন কায়েম হলে তাদের গৃহীত ব্যবস্থার ফলে জাতির চরিত্র ফুলের মতই নিষ্কলূষিত হতে বাধ্য। জাতির শাসকবৃন্দ অসৎ দুর্নীতি পরায়ণ হলে গোটা জাতিই দুর্নীতির অনুশীলন শুরু করে দেয়। নেতৃত্বের আসনে খোদাহীন নেতৃত প্রতিষ্ঠিত হলে গোটা জাতি ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক জুলুমতন্ত্রের সেবক হতে বাধ্য। জাতীয় জীবনে আল্লাহর আইন কায়েম থাকলে সৎশাসকেরা জাতির ক্ষুদ্র স্বার্থের প্রতিও তীক্ষ্ণ নজর রাখে।

প্রাসাদ নয়-কুড়ে ঘরই যথেষ্ট

আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার উদগ্র কামনায় যিনি সাগরের উত্তাল উর্মিমালার উপর দিয়ে তাওহীদের বাহিনীসহ, রব্বুল আলামীনের উপর

নির্ভর করে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে তদানিন্তন বিশাল পরাশক্তি পারস্য সাম্রাজ্যের দাম্ভিক সম্রাট ইয়াযদর্গিদের ক্ষমতার মসনদ ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিলেন, সেই সিপাহসালারের নাম হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। আল-ইসলামের এই শাণিত তরবারী সা'দ পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যরাশি দু'চোখ ভরে অবলোকন করেছেন। তিনি যখন কুফার শাসনকর্তা হিসেবে জনগণের কল্যাণের লক্ষ্যে গোটা কুফা নগরীকে সৌন্দর্যমন্ডিত করলেন, তখন তিনি নিজের বসবাসের জন্যে একটি বাড়ী নির্মাণ করলেন। বাড়ীটির সৌন্দর্য চোখে পড়ার মতই ছিল।

পারস্য বিজেতা সা'দের মনে বিলাসিতার সামান্য ছোয়া লেগেছিল বলে মনে হয়। বৈধ উপার্জনে নির্মিত বাড়ীতে একটু আরাম, সামান্য স্বস্তি, এ নিষ্কলুষ ভোগ তাঁর কাছে কোন খারাপ বিষয় বলে মনে হয়নি। কিন্তু বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধার দোর্দন্ড প্রতাপশালী শাসক খলিফা ওমর যখন শুনলেন সা'দ বাড়ী নির্মাণ করেছেন, তখন তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। সিপাহসালার সা'দ কি বিলাসী হয়ে উঠলো? অথবা সা'দের মতিভ্রম ঘটলো না-তো? না পারস্যের সম্রাটদের মতই নিজেকে সম্রাট মনে করছে সা'দ? খলিফা ওমর তৎক্ষণাৎ সা'দের কাছে একটি পত্র লিখে একজন দূতের হাতে দিয়ে তাকে নির্দেশ দিলেনঃ

তুমি কুফার মাটিতে পা দিয়েই তোমার প্রথম কাজ হবে সা'দের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। সা'দ যদি তোমাকে বাধা দিতে আসে তাহলে তাকে আমার এই পত্র দিবে।

খলিফার নির্দেশপ্রাপ্ত দূত ছুটলো কুফা নগরীর দিকে। কুফায় পৌছে সে খলিফার নির্দেশমত হযরত সা'দ (রাঃ) এর বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিল। আগুনের লেলিহান শিখা ক্ষণিকের মধ্যেই গোটা বাড়ীটিকে গ্রাস করে ফেললো। বিস্ময়ে বিমূঢ় স্তম্ভিত সা'দ খলিফা প্রেরিত দূতের এই ধরনের কর্মকান্ড দেখে তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। খলিফার দূত বিনা বাক্যব্যয়ে অকম্পিত হস্তে খলিফা কর্তৃক লিখিত পত্র কুফার প্রতাপশালী গভর্ণর সা'দের হাতে তুলে দিলেন। সা'দ পত্রটি তাঁর চোখের সামনে মেলে ধরলেন। খলিফা লিখেছেনঃ

"সা'দ, শুনতে পেলাম, নিজের ভোগ বিলাসিতার লক্ষ্যে খসরুর প্রাসাদের অনুরূপ তুমিও এক প্রাসাদ গড়েছো। আমি জানতে পেরেছি, খসরুর প্রাসাদের একটি মূল্যবান তোরণও এনে তোমার প্রাসাদে সংযোজন করেছো। প্রাসাদের

রক্ষণা বেক্ষণের জন্যে দারোয়ান–সিপাহীও রেখেছো। দেশের আপামর জনগণ তোমার কাছে তাদের সমস্যার কথা জানাবে কেমন করে? এ কথা তুমি একবারও ভেবে দেখনি। নবী (সাঃ) এর আদর্শ ত্যাগ করে খসরুর অনুসরণ করছো। একথা তোমার অবশ্যই স্মরণে রাখা উচিত যে, প্রাসাদে বাস করেও খসরুর দেহ কবরে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। আর নবী (সাঃ) সামান্য কুটিরে বাস করেও সম্মানিত স্থান সর্বোচ্চ জান্নাতে উপনিত হয়েছেন। মাসলামাকে আমার পক্ষ থেকে প্রেরণ করলাম তোমার প্রাসাদ পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। তোমার বাস করার জন্যে একটি সাধারণ কুড়ে ঘরই যথেষ্ঠ।"

হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ) প্রশ্নাতীতভাবে নতমস্তকে, অশ্রুসিক্ত নয়নে খলিফার নির্দেশ গ্রহণ করলেন। খোদাভীতি এবং আনুগত্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করলেন হযরত সা'দ (রাঃ)। কোন সত্যাশ্রয়ী মানুষ, অসচেতনভাবে যখন সীমা লংঘনের পথে এগিয়ে যায়, তখন তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করা উচিত। কোন দায়িত্বশীলের সামান্য বিলাসিতা অধঃস্তন কর্মীদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। ফলে সাংগঠনিক কাঠামো অনুগত্যের অভাবে দুর্বল হয়ে যায়। এ জন্যে আন্দোলনের দায়িত্বশীলদেরকে তাদের দৈনন্দিন জীবন ধারার প্রতি অধিক সচেতন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘৃণা করি সে আসন যা শোষিতের রক্তে নির্মিত

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ নিরুপায় তদানিন্তন বিশাল পরাশক্তি রোমক বাহিনীর সেনাপতি সাকলাব তাওহীদের সিপাহসালার হযরত আবু উবাইদাহ (রাঃ) এর কাছে সন্ধি ভিক্ষা করলো। তিনি সাকলাবের আবেদন মঞ্জুর করে আলোচনার জন্যে রোমক সেনাপতির কাছে হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রাঃ) কে পাঠালেন। হযরত মুয়াজ (রাঃ) সাধারণ পোশাকে যখন রোমক সেনাপতি সাকলাবের দরবারে প্রবেশ করলেন, তখন সাকলাব স্বর্ণখচিত কারুকার্যমন্ডিত মূল্যবান আসন হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর দিকে এগিয়ে দিলেন।

তিনি বসার আসনটি সরিয়ে রেখে মাটিতেই আসন গ্রহণ করলেন। রোমক সেনাপতি সাকলাব আহত কন্ঠে বললোঃ আমরা আপনাকে সম্মানিত করতে চাই, আর আপনি নিজেই আপনার সম্মান ভূলুন্ঠিত করলেন। হযরত মুয়াজ

(রাঃ) নির্ভীক কন্ঠে বললেনঃ দেশের ক্ষুধা জর্জরিত দারিদ্র পীড়িত বুভুক্ষ মেহনতি জনতার তপ্তরক্ত শোষণকরা অর্থ দিয়ে নির্মিত আসনকে আমরা বিষ্ঠাসম ঘৃণা করি। সাকলাব জানতে চাইলোঃ আমরা জাতিকে শোষণ করে এত সুন্দর আসন নির্মাণ করেছি সেটা আপনি কিভাবে অনুধাবণ করলেন?

রক্ত পিচ্ছিল পথের নির্ভীক যাত্রী অম্লান বদনে উত্তর দিলেনঃ আপনার ও আপনার সৈন্যবাহিনীর রাজকীয় জৌলুশপূর্ণ মহামূল্যবান চাকচিক্যময় পোশাকই এই ইঙ্গিত বহন করে যে, আপনারা জাতীয় সম্পদ লুন্ঠনকারী শোষকশ্রেণী। রোমক সেনাপতি সাকলাব জানতে চাইলোঃ আপনাদের সরকারী উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা এবং আপনাদের প্রভূও কি এধরণের মহামূল্যবান আসনে উপবেশন করেননা? মুয়াজ (রাঃ) বললেন জ্বী–না। আমাদের কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা দূরে থাক–স্বয়ং খলিফা ওমর (রাঃ)ও এ ধরণের কোন আসনে উপবিষ্ট হন না। আর আপনি আমাদের প্রভূ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন, আমরা একমাত্র মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনকে ছাড়া আর কাউকে প্রভূ বলে স্বীকৃতি দেইনা।

ইসলাম আমাদেরকে মানবীয় দাসত্বের শৃংখল ছিন্ন করে আল্লাহর দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। মানুষের তৈরী করা কোন বিধান আমরা মানিনা। মানুষের উপরে মানুষের প্রভূত্বকে আমরা মানবতা বিরোধী বলে চিহ্নিত করি। আল্লাহর আইনের অভাব ও অসৎ নেতৃত্বকেই আমরা যাবতীয় অনাচারের মূল কারণ বলে বিশ্বাস করি।

হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর কথা শুনে সাকলাবের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। শোষক সাকলাব ক্ষণিকের জন্যে যেন বাকশক্তি হারিয়ে ফেললো। সে নিজেকে আত্মস্থ করে বললোঃ আপনারা যদি বাস্তবিকই সত্য ন্যায় নিষ্ঠার পূজাড়ীই হয়ে থাকেন, তাহলে পররাজ্যে আগ্রাসন পরিচালনা করেন কেন? সিপাহসালার আবু ওবাইদাহ্ (রাঃ) এর প্রতিনিধি হযরত মুয়াজ (রাঃ) এর বিপ্লবী কন্ঠে ঝংকৃত হলোঃ আমরা ন্যায় নিষ্ঠ সুবিচারক সত্যের সেবক কোন শাসকের দেশে আগ্রাসন পরিচালনা করি না। আমরা আপনাদের মত শোষকগোষ্ঠী কর্তৃক পরিচালিত দেশ সমূহেই আগ্রাসন চালিয়ে শোষকদের ক্ষমতাচ্যুত করে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করি।

আমরা অধিকৃত জনপদের শোষিত বঞ্চিত নিপড়ীত মেহনতি জনতাকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করি। তাওহীদের প্রদীপ জ্বালিয়ে তাদের দেহে নতুন প্রাণের সঞ্চার করি। অবহেলিত প্রতিটি মানুষকে তাদের প্রাপ্য অধিকার বুঝিয়ে দেই। আমরা জাতির কাঁধ থেকে শোষণ বঞ্চনা ও শিরক্–এর জগদ্দল পাথরসমূহ

দূরে নিক্ষেপ করে জাতীয় সম্পদের ইনসাফভিত্তিক বন্টন করি এবং তাওহীদের পতাকাতলে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করি।

আলোচনার এক পর্বে সাকলাব হযরতের মুয়াজ (রাঃ) কে বিভিন্ন ধরনের লোভনীয় প্রস্তাব দিতে থাকে। কিন্তু তিনি সকল প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে বললেনঃ আমরা পার্থিব কোন স্বার্থে সংগ্রাম বা যুদ্ধকরি না। আমরা সত্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ করে আল্লাহর সন্তুষ্ঠি অর্জন করতে চাই। এখন আপনি সত্য গ্রহণ করে আমাদের ভাই হয়ে যান, অথবা জিজিয়া কর দিন। আপনি যদি আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ না করেন তাহলে আমাদের তরবারীই সবকিছুর ফয়সালা করবে ইনশাল্লাহ।

মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে জীবনের মাধুর্যতা

বদরের রণপ্রান্তর। সত্য মিথ্যার চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষার ক্ষেত্র। বাতিল শক্তি তার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে যুদ্ধের ময়দানে। সত্যের দুশমনেরা বিপুল সমরাস্ত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছে বদরের রণক্ষেত্রে। আরবের বিখ্যাত বীরদের অহংকারী পদভারে বদর প্রান্তর প্রকম্পিত। তাওহীদের ক্ষুদ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায় মিথ্যার ধ্বজাধারীরা। চোখে মুখে মুসলিমদের নির্মূলের বজ্র শপথের চিহ্ন। রণবুহ্যে দন্ডায়মান বাতিল সৈন্যদের দৃষ্টিতে রক্তের পিপাসা। সত্যের শোণীত পিপাসায় মিথ্যা শক্তির জিহ্বা চৈত্র মাসের তৃষ্ণার্ত কুকুরের মত ঝুলে পড়েছে। তাঁরা সত্যের শেষ রক্ত বিন্দুপানে আগ্রহী। বাতিলশক্তি নিশ্চিত, বিজয় তাদের অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাওহীদের ক্ষুদ্র বাহিনীর তুলনায় তাদের অস্ত্রবল, জনবল কয়েকগুণ বেশী। রসদপত্রও প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশী।

নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যুদ্ধ তাঁবুতে সামান্যক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তাঁবুর বাইরে এলেন। দৃষ্টিতে তাঁর মহান আল্লাহর প্রতি গভীর নির্ভরশীলতার দ্যুতি চমক সৃষ্টি করেছে। রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের লক্ষ্য করে মানবতার মহান মুক্তির দূত গভীর আত্মপ্রত্যয়ে ঘোষণা করলেনঃ

"উঠো এবং নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল অপেক্ষা বেশী প্রশস্ত জান্নাতের দিকে এগিয়ে চলো, যা নির্মিত হয়েছে এবং নির্বাচিত করা হয়েছে আল্লাহর পথে জিহাদকারী (ইসলামী আন্দোলনের জানবাজ) মুজাহিদদের জন্যে।"

সংগঠনের এক তরুণ কর্মী হযরত উমায়ের ইবনুল হাম্মাম চোখে মুখে তারুণ্যের উজ্জ্বলতা পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মতই দ্যুতি ছড়াচ্ছে। তারুণ্যের সন্ধিক্ষণে দেহ থেকে তাঁর সুষমার দিপ্তী বদরের প্রান্তর যেন আলোকিত করেছে। প্রিয় নবী (সাঃ) এর মুখ নিঃসৃত বাণী তাঁর কর্ণকুহরে মধু বর্ষণ করলো। জান্নাতের বিশালতা ও প্রশস্ততার কথা শুনে আনন্দের অতিশয্যে তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো মাত্র দু'টি শব্দ "বাহ্ বাহ্।"

এ শব্দ দু'টি আরবীয় আঞ্চলিক ভাষার। আরবী অভিধানে এ শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছেঃ ওয়ামা আ'যামাহু ওয়ামা আহ্ছানাহু। কি সুন্দর! কতই না চিত্তাকর্ষক। কত মূল্যবান! মর্যাদা আর সৌন্দর্য্যরাশি যেখানে অফুরন্ত।

বিশ্ব নেতা নবী (সাঃ) তাঁরই এক প্রিয় তরুণ কর্মী উমায়েরের মুখে থেকে বাহ্ বাহ্ শব্দ শুনে তাঁর দিকে আঙ্গুলী সংকেত করে বললেনঃ "জান্নাতের অধিকারীদের মধ্যে তুমি একজন।"

আল্লাহর নবীর (সাঃ) এর কথা হযরত উমায়ের ইবনুল হাম্মামের হৃদয়ে খুশীর প্লাবন সৃষ্টি করলো। তিনি সে সময় খেজুর খাচ্ছিলেন। তিনি চিৎকার করে বললেনঃ "হাতে তো এখনো অনেক খেজুর! এত খেজুর খেতে অনেক সময় প্রয়োজন। এতোক্ষণ কে অপেক্ষা করবে? জান্নাতে যেতে দেরী হয়ে যাবে।" এ কথাগুলো বলে তিনি হাতের খেজুরগুলো সজোরে দূরে নিক্ষেপ করে তরবারী হাতে যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। শাহাদাতের দুর্বার গতি তাকে বাতিল শক্তির রণবুহ্য ভেদ করে সামনের দিকে এগিয়ে নিল। জান্নাতের অদম্য আকর্ষণ উমায়েরকে উম্মাদ করে তুলেছে। কোন দিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। লক্ষ্য একটিই-শহীদি মিছিলে শামিল হয়ে ঐ বিশাল সৌন্দর্য্যমন্ডিত জান্নাতের অধিকারী হওয়া, যার বর্ণনা নবী (সাঃ) ক্ষণেক পূর্বেই দিলেন। যুদ্ধের এক পর্যায়ে বাতিল শক্তির ক্ষুরধার তীক্ষ্ম তরবারী সত্যের তরুণ মুজাহিদ উমায়েরের দেহ স্পর্শ করলো। তরুণ সাহাবী উমায়েরের রক্তে বদরের প্রান্তর রঞ্জিত হয়ে উঠলো। তিনি তাঁর কাংখিত জান্নাতের দিকে যাত্রা করলেন।

যুদ্ধ শেষে শহীদদের দাফন-কাফন চলছে। আল্লাহর নবী (সাঃ) উমায়েরের ক্ষত বিক্ষত লাশ দেখে বললেনঃ "ওহে যুবক, যে জান্নাতের আকংখায় খেজুর খাওয়ার মত সামান্য দেরি তুমি সহ্য করতে পারনি, জান্নাতের আশায় বিন্দু পরিমাণ সময় তুমি ব্যয় করতে রাজি হওনি, আমি নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সাক্ষ্য দিচ্ছি তুমি অবশ্য অবশ্যই এখন সেই জান্নাতে বিচরণ করছো।"

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের দুর্বার আকাংখা–ই মানুষকে নির্ভীক করে গড়ে তোলে। রব্বুল আলামীনের জান্নাত পিয়াসী শহীদি কাফেলার যাত্রীরা সংখ্যাধিক্যের পারোয়া করে না। শাহাদাতের লক্ষ্যেই তাঁরা বজ্র কদমে কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে তাদের মনজিলে মকছুদ শাহাদাত নামক মঞ্জিলের দিকে এগিয়ে যায়। কারণ তাঁরা জানে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী জীবন একটা অর্থহীন বোঝা–বৈ কিছুই নয়। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের জীবনের সোনালী সূর্য উদিত হয় মৃত্যু যবনিকার অন্তরাল থেকে। তাঁরা জীবনের মাধুর্য অনুভব করে, তৃপ্তির নিলয়ে মহেন্দ্রক্ষণের পরিপূর্ণ স্বাদ অস্বাদন করে মৃত্যুর পরের জেন্দেগীতে। সুতরাং মৃত্যুকে কিসের ভয়? মুমিন জীবনে শাহাদাতের মধ্যে দিয়ে জীবনের কিশলয়গুলো শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হয়, সেখানে শাহাদাতই তো তাদের এক মাত্র কাম্য। শাহাদাতের মৃত্যু এনে দেয় অনাবিল আনন্দ, শান্তির অমিয় ঝর্ণাধারা আর জীবনের মহেন্দ্রক্ষণ।

সাফল্যের স্বর্ণদ্বার শাহাদাত

দামেস্কের দুর্ভেদ্য দুর্গ। সম্রাট হিরাক্লিয়াসের সেনাপতি ক্লিভাস সমরাস্ত্রে সজ্জিত বিশাল বাহিনী নিয়ে দুর্গাভ্যান্তরে অবস্থান গ্রহণ করেছে। মদমত্ত ক্লিভাস তাঁর সুশিক্ষিত রণকৌশলী বিপুল সৈন্য বাহিনীর পদভারে গর্বিত।

মহাসত্যের পতাকাবাহী তৌহিদের নিশান বরদার, তাঁর স্বল্প সংখ্যক সাথীদের নিয়ে দামেস্ক নগরী অবরোধ করেছেন। ইসলামের ঐতিহ্যানুযায়ী বীর কেশরী খালেদ (রাঃ) সত্যের উজ্জ্বল শিখায় আলোকিত করার বাসনা নিয়ে কয়েকজন সঙ্গীসহ আগমন করলেন ক্লিভাসের প্রাসাদে।

বাতিল শক্তির প্রতিভূ সম্রাট হিরাক্লিয়াসের গর্বিত সেনাপতি শক্তির দর্পে তাঁর দো–ভাষী জারজিস এর মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন করতে লাগলো বিশ্ব ইতিহাসের বীর সম্রাট তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার বীর কেশরী খালিদ বিন ওয়ালিদকে। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করে কালেমার আওয়াজ বুলন্দ করার বজ্র শপথ নিয়ে খালেদের আগমন দামেস্কে। ক্লিভাসের দো–ভাষী জারজিসের কথা শুনে হযরতে খালেদ (রাঃ) আহত সিংহের মত গর্জন করে বললেনঃ "আমি ঐ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নামে শপথ করে ঘোষণা করছি, যার মুষ্টিতে

আমার প্রাণ। তোমাদের সৈন্য সংখ্যাকে আমার ঐ ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের সাথে তুলনা করি, শিকারী যাদের জাল পেতে ধরে খায়। শিকারী কোন দিনই পাখির বৃহৎ ঝাঁক দেখে ভয় পায় না বরং আনন্দিত হয়। পাখির বড় ঝাঁক শিকারীর মনে আনন্দ বৃদ্ধি করে। পাখির ঝাঁকের চতুরদিকে বেষ্টনি দিয়ে শিকারী অনায়াসেই সব পাখি ধরে ফেলে।

হে জারজিস, তুমি তোমার সেনাপতি ক্লিভাসকে জানিয়ে দাও। তাওহীদের সৈন্যবাহিনী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তাঁরা শহীদি মৃত্যুকে তাদের জীবনের পরম সাফল্য, বিরাট নিয়ামত মনে করে শাহাদাতের নেশায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে উন্মাদ হয়ে উঠে। শাহাদাত নামক নেয়ামতের জন্যে তাঁরা কতটা ব্যাকুল একটু পরেই তা তোমরা স্বচোক্ষেই দেখতে পাবে। তাঁরা শহীদি মৃত্যুর অলিন্দে জীবনের সফলতার সন্ধান পায়। সত্যের পতাকাধারীদের সিদ্ধান্ত শাহাদাত বরণ। তাঁরা শহীদি মৃত্যুকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়ায়। মৃত্যু যাদের পায়ের গোলাম তাদেরকে তোমরা মৃত্যুর ভয় দেখাও? শহীদ হওয়ার কঠিন শপথে যারা রক্ত পিচ্ছিল পথে পা দিয়েছে, পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তাদের কাছে একটা আপদ ছাড়া আর কিছুই নয়। যাও, তুমি তোমার সেনাপতি ও সম্রাটকে আমার কথাগুলো বলে দাও।"

অনুপম দৃষ্টান্ত

ইসলামী সংগঠনের মহিলা কর্মীরা ঘরে ঘরে গিয়ে আন্দোলনের দাওয়াতই শুধু পৌছাননি, সময়ের দাবীতে তাঁরা তাদের মমতাময়ী রূপ পরিবর্তন করে হিংস্র বাঘিনীর রূপও ধারণ করেছেন। ইসলামী আন্দোলনের অবরোধপুরের কর্মী হযরত উম্মে হাকীম (রাঃ) আজনাদাইনে তদানিন্তন বিশাল পরাশক্তি রোমান বাহিনীর মুকাবিলা করেন। যুদ্ধের ভয়ংকর ময়দানে তিনি সামান্য লাঠি নিয়ে বাতিল শক্তির উপরে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি তাঁর লাঠির প্রচন্ড আঘাতে একে একে সাতজন সশস্ত্র রোমান সৈন্যকে পরপারে পাঠিয়ে দেন। রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃঢ়পদে পদচারণাকারিনী হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রাঃ) ইয়ারমুক যুদ্ধে তাঁবুর খুটি দিয়ে পিটিয়ে নয়জন রোমান সৈন্যকে খতম করেন।

ইসলামী আন্দোলনকে ময়দানে প্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আরবের বিখ্যাত মহিলা কবি হযরত খানসা (রাঃ) তাঁর চার বীর পুত্রকে নিয়ে বিশাল বাতিল শক্তি পারস্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার জন্যে মুসলিম বাহিনীর

সাথে কাদেশিয়ায় আসেন। যুদ্ধ শুরুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর চার সন্তানকে ডেকে বললেনঃ "রণদামামা বেজে উঠার সাথে সাথে রণাঙ্গন যখন গর্জে উঠবে তখন তোমরা চার ভাই মধ্য রণাঙ্গনে গিয়ে বীর বীক্রমে বাতিল শক্তির উপরে আঘাত করবে। প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর সাহায্য কামনা করবে। যদি তোমরা গাজী হও তাহলে সম্মানিত হবে, আর যদি শাহাদাত বরণ কর তাহলে কেয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ তোমাদেরকে বিরাট মর্যাদা দান করবেন।"

গর্ভধারিনী মাতার কথার উত্তরে তাঁর চার পুত্রই বলে উঠলোঃ "আম্মাজান, আপনার আকাংখা অনুযায়ী আমরা আমাদের সকল তৎপরতা পরিচালিত করবো।" মাতার উৎসাহে চারভাই শাহাদাতের দূর্বার আকাংখা নিয়ে সিংহের মত গর্জন করে বাতিলের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে বহু কাফের সৈন্যকে জাহান্নামে পাঠিয়ে অবশেষে তাঁরা চার ভাই-ই শাহাদাতের অমিয় শুধা পান করলেন। হযরত খান্‌সা (রাঃ) যখন তাঁর চার পুত্রের শাহাদাতের খবর শুনলেন তখন তিনি আল্লাহর দরবারে সিজদা করে বললেনঃ "আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি আমার সন্তানদের শাহাদাত উপহার দিয়ে আমার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন।" ইসলামী আন্দোলনে যোগদানের পূর্বে এই মহিলা কবি তাঁর ভাই-এর তিরোধানে শোকগাথা রচনা করেন। কিন্তু ইসলামী সংগঠনে যোগদানের পর শহীদ চার সন্তানের জন্যে কোন শোকগাথা রচনা করেননি। এ জন্যে লোকেরা তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেনঃ "সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যিনি আমাকে চার শহীদের মাতা হওয়ার সৌভাগ্য দান করেছেন।"

গোটা আরব জগতে তাঁর মত বিখ্যাত সাহিত্যিক ও কবি আর কেউ ছিল কি-না সন্দেহ। আরবী ভাষার সৌন্দর্য্য বর্ধনে তাঁর অবদান অপরিসীম। তাঁর কাব্য গ্রন্থ বর্তমান সভ্যতায় লেবাননের বৈরুত থেকে সর্ব প্রথম প্রকাশিত হয়। বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য ভাষায় তা অনূদিত হয়েছে। রক্ত পিচ্ছিল পথের এই মহিলা যাত্রী তাঁর বিপ্লবী জীবনের সংগ্রাম মুখর ঘটনাবলীর দ্বারা প্রমাণ করেছেন- নারী অবলা নয়। আল্লাহর সন্তুষ্ঠি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁরাও জীবনের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে আন্দোলনের রক্তে ভেজা ময়দানে দৃঢ়পদে অবস্থান করতে পারেন। সংগঠনের প্রয়োজনে হযরত খান্‌সা (রাঃ) মসি ছেড়ে অসিও ধারণ করেছেন।

রণপ্রান্তরের রণহুংকার অগ্রাহ্য করেই ইসলামী আন্দোলনের নারী বাহিনী যুদ্ধের সৈনিকদের জন্য আহারের ব্যবস্থা করেছেন। আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রুষা করেছেন। তাঁরা আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন

কায়েমের জন্যে প্রিয়তম স্বামী ও স্নেহের প্রাণাধিক পুত্রদেরকে আন্দোলনের দুর্গম পথের যাত্রী হতে উৎসাহ উদ্দীপনা যুগিয়েছেন। বর্তমান বিংশ শতাব্দীর ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীরা গোটা পৃথিবীতে বিশেষ করে মিসর, ইরান, আলজেরিয়া, আফগানিস্তান, ফিলিস্তিন, সুদান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ত্যাগের যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে, তাদের সে ত্যাগে ইসলামী আন্দোলনের গতি তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে।

উত্তাপে বেগবান শীতল শোণিতধারা

বাতিল শক্তি রোমক বাহিনীর আক্রমনে ইয়ারমুকের রণপ্রান্তরে মুসলিম বাহিনী প্রায় পর্যদুস্ত, তাঁরা যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে অনেকেই তাঁবুর দিকে ফিরে আসতে লাগলো। রণপ্রান্তরে দাঁড়িয়ে ভয়ংকর দৃশ্য দেখছেন অশিতীপর এক বৃদ্ধা, বয়সের ভারে নুব্জ্য তাঁর ক্লান্ত দেহ। চক্ষু কোঠরাগত। শরীরের এক সময়ের অপূর্ব কমনীয় লবন্যময়ী ত্বকে রুক্ষতার চিহ্ন উৎকট হয়ে দেখা দিয়েছে। মাথার ভ্রমর কৃষ্ণ এলায়িত কুন্তলরাশি মহাকালের করাল গ্রাসে আজ তুষার শুভ্ররূপে রূপালী আভা ছড়াচ্ছে। দন্ডায়মান এই বৃদ্ধার নাম হিন্দা। তিনি যখন বাতিল শক্তির দলভুক্ত ছিলেন তখন সত্যের টুটি চেপে হত্যা করার লক্ষ্যে উন্মাদিনীর মতই ওহুদের ময়দানে আবির্ভূতা হয়েছিলেন। নরখাদক ডাইনীর মত সেদিন তিনি মহানবী (সাঃ) এর চাচা হযরত হামজার কলিজা চিবিয়ে ছিলেন। মক্কা নগরী যখন সত্যের পদভারে প্রকম্পিত তখন মিথ্যার প্রতিভু হিন্দা মৃত্যুবরণ করে তাওহীদের স্পর্শে যে নবপ্রাণ লাভ করলো, সে প্রাণের স্পন্দন রণপ্রান্তরে তাওহীদের বাহিনীর মধ্যে নব জাগরণ সৃষ্টি করলো।

ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে হিন্দা রক্ত পিচ্ছিল পথে পা দিয়েই শাহাদাতের উদগ্র কামনায় রক্তঝরা যুদ্ধের ময়দানে ছুটে এসেছেন। তিনি যখন দেখলেন বাতিলের আক্রমনে তাওহীদের প্রহরীরা পিছু হটে আসছে তখন তাঁর শীতল রক্তে দাবানল সৃষ্টি হলো। তাঁর শিরা উপশিরায় ধাবমান শীতল রক্তে সাগরের ভয়াল উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হলো। ক্ষোভে তাঁর কোঠরাগাত চোখ দুটি হিংস্র শ্বাপদের মতই জ্বলে উঠলো। যুদ্ধ থেকে ফিরে আসা মুসলিম সৈনিকদের সামনে ছুটে গিয়ে তিনি আহত সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠলেনঃ

"দুর্বল চিত্তের অধিকারী কাপুরুষেরা, চোখে মুখে পরাজয়ের গ্লানির চিহ্ন নিয়ে রণপ্রান্তর ত্যাগ করছো, তোমাদের লজ্জা করেনা? শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

করে যদি পলায়ন করতে চাও তাহলে গ্রহণ করো আমাদের অলংকার, পর্দাবৃত করো তোমাদের বলিষ্ঠ সবল দেহ। আশ্রয় গ্রহণ করো অবরোধপুরে। আর তোমাদের শরীর থেকে যুদ্ধ পোশাক খুলে আমাদেরকে দাও। আমরা (নারীরা) তা পরিধান করে আমাদের কোমল হাতে তরবারী ধারণ করি। তোমাদের অশ্বে আরোহণ করে আমরা পুরবাসীরা যুদ্ধ করে বিজয় নিশ্চিত করি।"

হিন্দার তেজোদৃপ্ত বক্তৃতায় মুসলিম সৈন্যদের রক্তে অনল প্রবাহিত হলো। তাঁরা নব উদ্যমে অমিতবিক্রমে বাতিল শক্তি রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মুসলিম সৈন্যবাহিনী হিন্দার অনুপ্রেরণায় যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করলো, তার প্রলংকরী গতির সামনে কয়েক লক্ষ রোমান বাহিনী খড়–কুটোর মতই উড়ে গেল।

শিয়রে মৃত্যুদূত- ত্যাগের উজ্জ্বল ছবি

বাতিল শক্তি রোমক বাহিনীর দুইলাখ চল্লিশ হাজার সৈন্য তাওহীদের পতাকাবাহী মাত্র চল্লিশ হাজার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের উপরে পাশবিক হিংস্রতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তাওহীদের ক্ষুদ্র বাহিনী জান বাজী রেখে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দৃপ্ত প্রত্যয়ে বাতিল শক্তির মোকাবিলা করছে। যুদ্ধ প্রান্তরের দক্ষিণ ভাগের সেনাপতি হযরত সালামা (রাঃ)। বাতিল শক্তি তাঁর শরীরে একের পর এক অস্ত্রের আঘাত করেই যাচ্ছে। দেহ থেকে ঝর্ণা ধারার মত তপ্ত শোনিত প্রবাহিত হয়ে ইয়ারমুকের মাটিতে ইসলামী আন্দোলনের বিজয়ের চিত্র এঁকে দিচ্ছে। তাঁর গোটা দেহকে দেখে মনে হচ্ছে যেন শহীদি লাল গোলাপে সজ্জিত জান্নাতী মেহমান।

অধিক রক্তক্ষরণে ক্রমেই তাঁর শরীর নিঃসাড় হয়ে যাচ্ছে। তবুও যুদ্ধের ময়দানে বাতিল শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে তিনি দেহের ক্ষয়িষ্ণু শক্তি দিয়েই তরবারী চালনা করছেন। আল্লাহর দুশমনেরা হযরত সালামা (রাঃ) কে তরবারীর মরণ আঘাতে ঘোড়া থেকে মাটিতে ফেলে দিল। সেনাপতিহীন শূন্য ঘোড়া দেখে হযরত হোজাইফা–হযরত সালামা (রাঃ)কে যুদ্ধের ময়দানে খোঁজ করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন শহীদি মিছিলের যাত্রী জানবাজ মুজাহিদ হযরত সালামা (রাঃ) আখিরাতের প্রবেশ দ্বারে দন্ডায়মান।

প্রায় চেতনাহীন সেনাপতি সালামা (রাঃ) হোজাইফাকে দেখে তাঁর শুষ্ক অধর ক্ষীণভাবে নড়ে উঠলো। তিনি বললেনঃ "ভাই হোজাইফা, মুসলিম বাহিনীর অবস্থা কি?'' হযরত হোজাইফা বললেনঃ "তাওহীদের বাহিনী বাতিল শক্তিকে প্রতিহত করছে।" এ কথা শোনার সাথে সাথে শাহাদাতের স্বর্গীয় শুধা পানরত বিপ্লবী মুজাহিদ হযরত সালামা (রাঃ) দেহের অবশিষ্ট শক্তি এক জায়গায় করে তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশে চিৎকার দিয়ে বললেনঃ "ইসলামের মুজাহিদরা সামনের দিকে এগিয়ে যাও ....।" কথা শেষ না করেই তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। অতি কষ্টে হোজাইফার কাছে পান করার জন্যে একটু পানি চাইলেন। তিনি পানির পাত্র সবেমাত্র সালামা (রাঃ)–এর মুখে তুলে ধরেছেন। এমন সময় রক্তপিচ্ছিল পথের আর এক যাত্রী আহত হযরত হিশাম (রাঃ)–এর কণ্ঠ থেকে করুণ আওয়াজ এলোঃ "পানি, একটু পানি।"

হযরত সালামা (রাঃ) এর আর পানি পান করা হলো না। তিনি পানির গ্লাস হোজাইফার কাছে ফিরিয়ে দিয়ে বললেনঃ "দ্বীনি ভাই হিশামকে পানি দাও, আমার থেকে তাঁর পানির প্রয়োজন অনেক বেশী," হযরত হোজাইফা পানির পাত্র হাতে ছুটলেন হিশাম (রাঃ) এর কাছে। তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে শহীদি কাফেলার নির্ভীক যাত্রী হযরত হিশামের, সাগর মহাসাগরের পানিতেও বোধ হয় তাঁর জীবনের শেষ তৃষ্ণা মিটবে না। হোজাইফা তাঁর ভূলুণ্ঠিত মাথা উঁচু করে তুলে মুখের কাছে পানির পাত্র ধরলেন। হযরতে হিশাম (রাঃ) সবেমাত্র তাঁর শুষ্ক অধরে পানির পাত্রের স্পর্শ অনুভব করেছেন, এমন সময় তাঁর কানে আহত মুজাহিদের আর্তনাদ ভেসে এলোঃ "কে আছো একটু পানি দাও।"

শহীদি খুনের রক্তলাল পোশাকে সজ্জিত হযরত হিশাম (রাঃ) এর আর পানি পান করা হলো না। পানির পাত্র ফিরিয়ে দিয়ে হোজাইফাকে বললেনঃ "আল্লাহর পথের ঐ সৈনিককে আগে পানি পান করাও।" হযরত হোজাইফা পানি নিয়ে আহত মুজাহিদের কাছে ছুটে গেলেন। পানি পান করার জন্যে তিনি আল্লাহর পথের এই সৈনিককে ডাক দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনি জাগতিক সব প্রয়োজনের উর্ধে চলে গেছেন। হোজাইফা ছুটে এলেন হিশাম (রাঃ) এর কাছে। তিনি দেখলেন, হিশামের দুনিয়ার কোন পানির প্রয়োজন আর নেই। তিনি শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী শুধা পান করে আরশে আযিমের মহান মালিকের কাছে পৌছে গেছেন। হযরত হোজাইফা উন্মাদের মত পানির পাত্র হাতে ছুটে এলেন সেনাপতি হযরত সালামা (রাঃ) এর কাছে। তিনি দেখলেন, ব্যাথা–

বেদনা, ক্ষুধা–তৃষ্ণার যন্ত্রণাময় এ পৃথিবী ছেড়ে হযরত সালামা (রাঃ) অনেক আগেই শহীদি মিছিলে শামিল হয়েছেন। স্পন্দন শূন্য প্রাণহীন দেহ নিয়ে হযরত সালামা (রাঃ) শহীদি খুনে রক্ত রঞ্জিত শয্যায় পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছেন। রণদামামার গগন বিদারী নিনাদেও তাঁর এ ঘুম আর ভাঙ্গবে না। এই দৃশ্য দেখে হযরত হোজাইফার দু'চোখ বেয়ে নেমে এলো শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় উদগত অশ্রুধারা।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা পরস্পরের জন্যে মৃত্যুদূতকে মাথার কাছে উপস্থিত দেখেও অপরের প্রয়োজনকে যেভাবে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, পৃথিবীর কোন আন্দোলনের কর্মীদের ইতিহাসে এমন ত্যাগের দৃষ্টান্ত নেই। অপর কর্মী ভাইদের জন্যে কি মায়া মমতা জড়ানো সহানুভূতি! ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মী বাহিনী তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত, মৃত্যুপথের শেষ মঞ্জিলে দাঁড়িয়েও অপরের প্রয়োজন পূরণের জন্যে ত্যাগের যে নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, এমন ত্যাগের অনুপ্রেরণা তাঁরা কোথায় পেলেন? এরা তো ঐ মানুষগুলোই, যারা দুর্বল মানুষদের কাছে থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে নিজের প্রয়োজন পূরণ করতেন? তাঁরাই ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে ইসলামের শিক্ষায় মানবতার উচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন।

শহীদি মিছিলের সিপাহসালার

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) পৃথিবী ছেড়ে বিদায় নেওয়ার পরে তাঁর সন্তান ইয়াজিদ ইসলামের বিশ্বজনীন নীতি, "জনগণের রায়ে খলিফা নির্বাচিত হবে" এই বিধানকে নিষ্ঠুরভাবে পদদলিত করে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন করলেন। যে মুসলমানেরা পরাশক্তি রোম ও পারস্যের রাজতন্ত্র উৎখাত করতে নিজেদের দেহের তপ্ত লহু প্রবাহিত করে ইসলামের বিঘোষিত নীতি "জনগণের রায়ে খলিফা নির্বাচিত হবে" প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আজ সেই মুসলিম সাম্রাজ্যকেই গ্রাস করলো শোষণমূলক রাজতন্ত্রের অপবিত্র কালো ছায়া।

ইয়াজিদ পিতার সমর্থনে ইসলামের খেলাফত ব্যবস্থাকে উৎখাত করে রাজতন্ত্রের জন্ম দিলেন। যে দেশের শাসক ছিলেন জাতির সেবক এখন সেই দেশের জনগণকে শাসকের সেবকে পরিণত করা হলো। যে রাষ্ট্রের অর্থ ভান্ডারের মালিক ছিল দেশের আপামর জনতা, আর এখন সেই রাষ্ট্রের জনগণকে শোষন করে রাজ পরিবারের বিলাসিতার অর্থ যোগাড়ের ব্যবস্থা করা

হলো রাজতন্ত্রের মাধ্যমে। যে সাম্রাজ্যের অধিপতিকে সাধারণ মানুষের কাছে সামান্য এক টুকরো কাপড়ের জন্যে জবাবদিহী করতে হয়েছে, আজ সেই সাম্রাজ্যের অধিবাসীকে শাসকের কাছে জবাবদিহী করার হীনপথ অবলম্বন করা হলো।

জনগণের রায় ব্যতিরেকে খলিফাপদ কুক্ষিগত করা ছিল ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করার শামিল। শুধু তাই নয়, ইয়াজিদের খলিফা পদে আসীন হওয়া ছিল স্বীকৃত চুক্তির নির্লজ্জ লংঘন। যে নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইসলামী গোলাপের সুবাস ছড়িয়েছেন আর আজ সেই বেহেশ্‌তী সুবাস রাজতন্ত্রের অপবিত্র বিষ্ঠার দুর্গন্ধের সাথে মিশ্রিত হবে? না! ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার হোসাইন বেঁচে থাকতে প্রিয় নবীর রক্তেগড়া ইসলামের বিকৃতি ও অপমান সহ্য করবেন না।

তিনি ইয়াজিদের বিরুদ্ধে সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন। তাঁর চোখের সামনে আল্লাহর বিধান পদদলিত হবে আর তিনি নিরবে মদিনায় বসে দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন –তা কি করে সম্ভব? ইসলামের বিধান লংঘন করে হোসাইনের বক্ষের উপর দিয়েই খেলাফতি ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হবে– তার আগে নয়।

কুফার অধিবাসীরা হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)কে জানালো ইসলামের ভূলুণ্ঠিত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে আমরা আপনাকে সর্বাত্মক সহযোগীতা দান করবো, আপনি আমাদের এখানে চলে আসুন। তিনি পরিবার পরিজন ও সঙ্গী সাথীসহ মোট সত্তর জন সঙ্গী নিয়ে কুফা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ইয়াজিদের নির্দেশে বিশহাজার নিষ্ঠুর সৈন্য কারবালার প্রান্তরে নবী দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) কে ঘিরে ফেললো। তিনি চতুরদিকে তাকিয়ে দেখলেন ইয়াজিদের সৈন্যবাহিনী এই সত্তর জন মর্দে মুমিনকে মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বেষ্টন করে আছে।

দৃষ্টির আওতায় ইউফ্রেটিস– ফোরাত নদী– কুলকুল রবে প্রবাহিত হচ্ছে। ইমাম যেন পানি বঞ্চিত থাকেন সে ব্যবস্থাও করেছে পাপিষ্ঠ দূরাচারীরা। বাধ্য হয়ে ইমাম কারবালার ধূ–ধূ মরুপ্রান্তরে তাঁবু গাড়লেন। প্রস্তাব এলো ইয়াজিদের সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে থেকে "ইমামকে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে"।

প্রস্তাব শুনে রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের সিপাহসালার ইমাম হোছাইন আহত সিংহের মত গর্জন করে উঠলেন। আত্মসমর্পণ? কিসের আত্মসমর্পণ?

কার কাছে আত্মসমর্পণ? ইসলামের অবমাননাকারীদের কাছে আত্মসমর্পণ? রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের কাছে আত্মসমর্পণ? অন্যায় অসত্য মিথ্যাচারের কাছে আত্মসমর্পণ? ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় নির্ভীক সিপাহসালার আত্মসমর্পণ করবে অন্যায় শক্তির কাছে? শহীদি কাফেলার সাহসী সাথীরা অন্যায়ের কাছে মাথানত করবে? ইসলামের জিন্দা দিল মুজাহিদের অভিধানে আত্মসমর্পণ কথাটি নেই– তিনি পারেন না জালিমের সহযোগী হতে।

ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী সিপাহসালার নবী দৌহিত্র ইমাম হোসাইনও আত্মসমর্পণ করলেন না। তাকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করার জন্যে অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করা হলো। দুনিয়ার যাবতীয় সৃষ্টি কুলের জন্যে ফোরাতের পানি উন্মুক্ত, কিন্তু ইমাম পরিবারের জন্যে নিষিদ্ধ করা হলো। বন্য পশুরা ফোরাতের পানি প্রাণভরে পান করে তাদের তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারবে, কিন্তু বিশ্ব নবীর স্নেহের নিধি, খাতুনে জান্নাত মা ফাতেমার আদরের দুলাল হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ) ও তাঁর পরিবার পরিজন, সঙ্গী সাথীরা তৃষ্ণায় মৃত্যুবরণ করলেও এক বিন্দু পানি পান করতে পারবে না।

খন্ডযুদ্ধের অবতারণা হলো। এ এক অদ্ভুত অসম যুদ্ধ। এক পক্ষে বিশ হাজার সৈন্য অপর পক্ষে মাত্র সত্তর জন নিরস্ত্র মুজাহিদ। ইমামের সাথীরা ও পরিবারের উপযুক্ত জওয়ানেরা সবাই একে একে শাহাদাত বরণ করে রক্ত পিচ্ছিল পথের শহীদি যাত্রীদের সাথে মিলিত হলেন। ইমামের শিবিরে গত কয়েক দিন যাবৎ বিন্দু পরিমাণ পানি নেই। পানির তৃষ্ণায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। সাহারাসম পিপাসায় বুকের ছাতি ফেটে যাচ্ছে। পানির তৃষ্ণায় ছোট ছোট মাছুম বাচ্চারা আর্তনাদ করছে। তাদের আর্তনাদের করুণ আওয়াজ মেঘমালা ভেদ করে সপ্তম আসমান পেরিয়ে আল্লাহর আরশে মোয়াল্লায় গিয়ে পৌঁছাচ্ছে। কিন্তু ইয়াজিদকে ক্ষমতার লোভ এমনভাবে বধির করে রেখেছে যে, ইমামের দুধের শিশু আলী আসগরের করুণ আর্তনাদ তার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে পারলো না।

ইমাম ছল ছল চোখে তাঁর শিবিরের প্রতিটি সদস্যের করুণ অবস্থা দেখছেন। কিন্তু তিনি পাহাড়ের মতই অটল অবিচল। চোখের সামনে পানির তৃষ্ণায় মাছুম শিশু আলী আসগর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে। পানির অভাবে নারীদের স্তন শুকিয়ে গেছে, দুধ নেই। অবলা শিশুরা দুধও পাচ্ছে না। কিন্তু তাই বলে ইমাম হোসাইন অন্যায়ের সাথে আপোষ করে শিশুদের জান বাঁচানোর জন্যে পানির ব্যবস্থা করবেন? না! অসম্ভব। তিনি মিথ্যার সাথে আপোষ করবেন না। শুষ্ক চোখে কলিজার টুকরা শিশু আলী আসগরের দিকে তিনি

তাকিয়ে আছেন। পানির অভাবে কচি বাচ্চার মৃত প্রায় অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীগুলো অসহ্য ব্যাথায় ছিড়ে যেতে লাগলো। তিনি মনে মনে বললেনঃ এই মাছুম বাচ্চার করুণ অবস্থা শত্রুরা দেখলে বোধ হয় একটু পানি তাকে দিতে পারে।

এই মনে করে তিনি স্ত্রী শাহারাবানুর কোল থেকে আলী আসগরকে নিয়ে ফোরাত কুলের দিকে রওয়ানা দিলেন। শত্রু বাহিনীর কাছাকাছি গিয়ে তিনি বললেনঃ হে ইরাক ও সিরিয়ার অধিবাসীরা, তোমরা হোসাইনকে শত্রু মনে করতে পারো, কিন্তু এই মাছুম বাচ্চা তো তোমাদের শত্রু নয়। চেয়ে দেখ এই বাচ্চা তৃষ্ণায় মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। তাঁর মায়ের স্তনে দুধ শুকিয়ে গেছে। দয়া করে এই বাচ্চাকে এক বিন্দু পানি দিয়ে সাহায্য কর। ইমাম এ সমস্ত কথা বলে তাঁর কোল থেকে শিশু পুত্র আলী আসগরকে শূন্যে তুলে ধরলেন।

হযরত হোসাইনের হৃদয় স্পর্শী কথায় ইয়াজিদের সৈন্য বাহিনীর মধ্যে গুঞ্জন দেখা দিল। ইয়াজিদের পাপিষ্ঠ সেনানায়ক আমর বিন সাদ সিপাহী বিদ্রোহের আশংকায় চিৎকার দিয়ে বলে উঠলোঃ যে ব্যক্তি হোসাইনের কণ্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পারবে, তাকে বিরাট পুরস্কার প্রদান করা হবে। পুরস্কারের লোভে হারমলা বিন কাহেন আসাদী নামে এক নরাধম খাতুনে জান্নাত মা ফাতিমার নয়নের মনি ইমাম হোসাইনকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। তীর এসে বিদ্ধ হলো ইমাম পুত্র আলী আসগরের কচি বুকে। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। তীব্র আর্তনাদ করে শেষ বারের মত পিতার করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে আলী আসগর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। তিনি আর কোন দিন ইমামকে পানির জন্য বিরক্ত করবেন না। ক্ষুধা তৃষ্ণার অনেক উর্ধে তিনি চলে গেলেন। তাঁর পবিত্র রক্তে ইমামের শরীর রঞ্জিত হয়ে গেছে। প্রচন্ড যন্ত্রণায় ইমাম হোসাইনের কলিজা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। তবুও তিনি মিথ্যার কাছে মাথানত করলেন না।

শিশু আলী আসগরের রক্তাক্ত নিরব নিথর স্পন্দনহীন দেহ নিয়ে স্ত্রী শাহারাবানুর কোলে দিয়ে বললেনঃ তোমার সন্তানকে শাহাদাতের অমিয় সঞ্জীবনী শুধা পান করিয়ে এনেছি। ও চিরতরে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওর ঘুম আর ভাঙ্গবে না। মানসিক যন্ত্রণায় শ্রান্ত ক্লান্ত ইমাম ধূলিশয্যায় বসে পড়লেন। চোখে তাঁর বেদনার চিহ্ন নেই। আল্লাহর প্রতি অসীম নির্ভরতার দ্যুতি খেলা করছে ইমামের চোখে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন মুসলমানদের ঘোর দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। মুসলিম জাতির ভাগ্যাকাশে ইয়াজিদ যে কালো মেঘের সূচনা করলো,

এই মেঘের প্রলংকরী ঝড়ের তান্ডবলীলা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকবে। আর এই ঝড়ের মুকাবিলা করতে গিয়ে তাঁর মত সত্যের সৈনিকরা নিগৃহীত, নিপড়ীত ও লাঞ্ছিত হবে, নির্মমভাবে মৃত্যু বরণ করবে।

তিনি নিরাশ হলেন না। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দৃঢ়তা তিনি দেখেছেন। আল্লাহর পথের মুজাহিদদের আত্মত্যাগের নিকট ও দূর ইতিহাস তাঁর হৃদয়ে প্রশান্তি এনে দিল। তিনি হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখলেন, বাতিল শক্তির শত অত্যাচার ও নির্যাতনে রক্ত পিচ্ছিল পথের অসীম সাহসী যাত্রীরা তাঁরই মত অবিচলভাবে সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকছে। ইশাণ কোণের প্রয়লংকরী ঘূর্ণি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সত্যের পথ থেকে বিন্দু পরিমাণও টলাতে পারছে না। তিনি দু'হাত মহান মালিকের দরবারে তুলে গোটা মুসলিম জাতির জন্যে কল্যাণ কামনা করলেন। তারপর যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হয়ে আত্মীয় পরিজনকে ধৈর্য্য ও সত্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকার উপদেশ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ইয়াজিদের বাহিনীর উপরে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

ইয়াজিদের বিশ হাজার সৈন্য বাহিনী সত্যের প্রদীপ্ত সূর্য ইমাম হোসাইনের তীব্র আক্রমণের মুখে পিছু হটতে বাধ্য হলো। আসলে সত্যের শক্তিই অজেয় অদম্য। সত্যপন্থীদের সামনে মিথ্যার ধ্বজাধারীরা পরাভূত হতে বাধ্য। বাতিল শক্তি সত্যপন্থীদেরকে দৈহিকভাবে নির্মূল করতে পারে কিন্তু তাদের কালজয়ী আদর্শকে নির্মূল করতে পারে না। মহাসত্যের গতি পথে বাধার বিন্ধাচল সৃষ্টি করে বাতিল শক্তি সত্যকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হবার পর সত্যপন্থীদেরকে দৈহিকভাবে নির্মূল করার ঘৃণ্য পথ অবলম্বন করে। ইয়াজিদও সত্যের কন্ঠকে চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্যে কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস সৃষ্টি করলো।

শত্রুপক্ষের শত সহস্র অস্ত্রের আঘাত এসে ইমামের শরীরে বিদ্ধ হচ্ছে। আহা, এ তো সেই শরীর! যে শরীরে বিশ্ব নবীর পবিত্র মুখের চুম্বনের চিহ্ন স্পষ্ট। আজ সেই শরীর থেকে রাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীদের অস্ত্রের নির্মম আঘাতে ঝর্ণাধারার মত তপ্ত শোণীতধারা প্রবাহিত হয়ে কারবালার বালুকারাশি ভিজিয়ে দিচ্ছে। অবিরাম রক্তক্ষরণে দুর্বল হয়ে পড়লেন নবী (সাঃ) এর নয়নের পুতুলী আদরের দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইন (রাঃ)। সংজ্ঞাহারা হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন কারবালার বালুকাময় মরু প্রান্তরে। ইয়াজিদ বাহিনীর নির্মম খঞ্জর রক্ত লোলুপ জিহবা বিস্তার করলো ইমামের পবিত্র কণ্ঠের দিকে। ইমামের পূত ও পবিত্র মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পবিত্র রুধিরের ধারায় প্লাবিত হলো

কারবালার শুষ্ক বালুকারাশি। প্রিয় নবী (সাঃ) এর আদরের নিধি মা ফাতেমার কলিজার টুকরা ইমাম হোসাইনের পবিত্র শরীর মোবারকের উপর দিয়ে ইয়াজিদের বাহিনী ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। ইমামের পবিত্র লাশকে ঘোড়ার পদতলে নিষ্ঠুরভাবে পিষ্ট করা হলো।

মিথ্যার অনুসারীরা সত্যপন্থীদেরকে নিগৃহীত করে, নির্মমভাবে হত্যা করে এভাবেই মিথ্যে আত্মতৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাস সত্য পন্থীদেরকেই বিজয়ের মাল্যে বরণ করে নেয়। আর মিথ্যের ধ্বজাধারীদেরকে ইতিহাসের ঘৃণা ও লাঞ্ছণার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে। কবির ভাষায়ঃ

ক্যতলে হোছাইন? নাহি ক্যতলে ইয়াজিদ
ইসলাম জিন্দা হোতি হ্যায় হ্যর কারবালা কি বাদ।

হোসাইন কি কারবালার প্রান্তরে নিহত হয়েছে? না। নিহত হয়েছে স্বৈরাচারী ইয়াজিদ। আর কারবালার প্রতিটি ঘটনার পরে ইসলামী আন্দোলনে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়।

ইসলামী আন্দোলনের সিপাহসালার ইমাম হোসাইন (রাঃ) কারবালার প্রান্তরে বুকের তপ্ত রক্ত ঢেলে দিয়ে সত্যের চির উন্নত শিরকে আকাশ স্পর্শী করে গেছেন। মহাসত্যের সে বিপ্লবী শির আনত হয়নি কখনও– বর্তমানেও হবে না– আগামীতেও হবে না ইনশাল্লাহ। মিথ্যা শক্তির পক্ষ থেকে ফাঁসির রায় শুনে সত্যপন্থীরা আল্লাহ আকবর বলে গগন বিদারী তাকবীর দিয়ে পৃথিবীর আকাশ বাতাস চিরদিন মুখরিত করে তুলবে। ইসলাম নামক বৃক্ষকে সতেজ সজীব রাখে শহীদদের রক্ত। আর শহীদের পবিত্র রক্তে অবগাহন করেই ঘুমন্ত জাতি নতুন উদ্দ্যমে জেগে উঠে। প্রাণ ফিরে পায় দেশ, স্বাধীনতা এবং নির্মিত হয় হিমাচলের ন্যায় সত্যের বিজয় সৌধ।

ইমাম হোসাইন (রাঃ) ফোরাতের কূলে কারবালার প্রান্তরে আক্রান্ত হলে উম্মেহাতুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) স্বপ্নে দেখলেন নবী করীম (সাঃ) তাঁর কাছে এসেছেন। প্রিয় নবীর মুখমন্ডলে বিষাদের চিহ্ন। পবিত্র চোখ দুটিতে অশ্রু টলমল করছে। তিনি নবী (সাঃ) কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনি কাঁদছেন কেন? আপনার কি হয়েছে? নবী (সাঃ) কাঁদছেন আর বলছেন, সালামা আমার হোসাইন আর দুনিয়ায় নাই, ইয়াজিদের সৈন্যরা ফাতেমার কলিজার টুকরাকে কারবালার প্রান্তরে শহীদ করে দিয়েছে। উম্মেহাতুল মুমেনীন উম্মে সালামা (রাঃ) এর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ফজরের নামাজ আদায় করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। লোকেরা জানতে চাইলোঃ আপনি

কাঁদছেন কেন? তিনি স্বপ্নের বৃত্তান্ত বললেন। মদিনার ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়লো।

আজও প্রতিটি বছরে কারবালার সেই মর্মান্তিক দিনটি মুসলিম জাতির সামনে বার বার ফিরে আসে। কেয়ামত পর্যন্ত ফিরে আসতে থাকবে। মিথ্যার ধ্বজাধারী স্বৈরাচারী ইয়াজিদের প্রতি শত কোটি কণ্ঠে ঘৃণা উচ্চারিত হবে। আর ন্যায় নিষ্ঠের প্রতীক সত্যপন্থী ইমাম হোসাইনের (রাঃ) নাম মানুষ শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবে অনন্তকাল। তাঁর শাহাদাত সত্য পন্থীদেরকে কেয়ামত পর্যন্ত সত্যের জন্য অকাতরে বেদনা সয়ে প্রাণ বিসর্জন দিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে। শহীদি মিছিলের বীর সিপাহসালার ইমাম হোসাইন (রাঃ) এর প্রতিটি রক্ত বিন্দু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত শত কোটি হোসাইন জন্ম নিবে। আর তাঁরা ইমামের মতই স্বৈরাচারী বাতিল শক্তির তখতে তাউস ভেঙ্গে ধূলিস্যাৎ করে দেওয়ার জন্যে আল্লাহর উপরে নির্ভর করে মিথ্যার মোকাবিলায় নির্ভীকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। শত অত্যাচার আর নির্মম নির্যাতনের মধ্যে দিয়েই তাঁরা সত্যের বিজয় কেতন বাতিলের ধ্বংস্তুপের উপরে উড়াবেই ইনশাল্লাহ।

সোনালী হরফে লেখা শাসন

খলিফা সোলায়মান আর এই নশ্বর ধরাধামে নেই। পৃথিবীর অলংঘনীয় নিয়মের কাছে আত্মসমর্পণ করে মহান আল্লাহর দরবারে আলিশানে উপনীত হয়েছেন। তাঁর অবর্তমানে উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহঃ) ইসলামী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব গ্রহণ করে দামেস্কের সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। তাঁর চরিত্র সাহাবাদের (রাঃ) চরিত্রের অনুরূপ হওয়ার কারণে বহু আলেমই তাঁর নামের শেষে সাহাবাদের (রাঃ) নামের শেষে ব্যবহৃত "রাদি আল্লাহু তায়ালা আনহু" ব্যবহার করে থাকেন। খলিফা পদে সমাসীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর জীবন কেটেছে রাজকীয় ভোগ বিলাসের মধ্যে দিয়ে। অভাবশূন্য প্রাচুর্যতার পরিবেশে তিনি জীবন অতিবাহিত করেছেন। সেই মানুষটিই যখন বিশাল জনগোষ্ঠীর নেতার আসনে সমাসীন হলেন, তখন তিনি ভোগ বিলাসের যাবতীয় উপকরণাদী আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে দূরে নিক্ষেপ করে দীনহীন ফকিরের মত জীবন যাপন শুরু করলেন। জনগণের নেতা হিসেবে তিনি জনগণের কাতারে নেমে এলেন। খলিফা নির্বাচিত হওয়ার পরে তাঁর জন্যে রক্ষিত নির্দিষ্ট রাজপ্রাসাদের দিকে তিনি যাত্রা করেছেন। যাত্রা পথের দু'পার্শ্বে মূল্যবান পোশাকে সজ্জিত তাঁর

দেহরক্ষীরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি তাদের দিকে বিরক্ত পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেনঃ এ লোকগুলো এখানে কেন? মন্ত্রীদের মধ্যে থেকে উত্তর এলোঃ এরা সবাই আপনার দেহরক্ষী বাহিনী। খলিফা উমার ইবনে আব্দুল আযীয (রাহঃ) বললেনঃ জাতির ভালোবাসাই আমার প্রতিরক্ষা, আমার জন্যে দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। এদেরকে জনগণের অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করুন।

প্রধান সেনাপতি সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে খলিফার নির্দেশ পালন করলেন। খলিফা যখন রাজপ্রাসাদে পদার্পণ করলেন তখন তিনি দেখলেন, তাঁর সেবা করার জন্যে আটশত দাস হুকুমের অপেক্ষায় নতমস্তকে দন্ডায়মান। তিনি প্রশ্ন করলেনঃ এরা কারা? রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা বিনীতভাবে উত্তর দিলেনঃ এরা মহামান্য খলিফার আজ্ঞাবহ দাস শ্রেণী। খলিফা এ কথা শোনার সাথে সাথে উজিরে আযমকে ডেকে বললেনঃ এই দাসেরা এখন থেকে মুক্ত স্বাধীন। আমার সেবা করার জন্যে আমার জীবন সঙ্গিনী স্ত্রী–ই যথেষ্ট। প্রধানমন্ত্রী তৎক্ষণাৎ খলিফার আদেশ বাস্তবায়িত করলেন।

গোটা দেশের সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ নতুন রাষ্ট্রপ্রধানকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যে খলিফার দরবারে আগমন করলো। খলিফা তাদেরকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "তোমরা তো আজ সেই ব্যক্তিকেই অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্যে এসেছ, যে ব্যক্তি ধ্বংস গহবরের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। বিভীষিকাময় ধ্বংস গহবর যার দিকে মুখ ব্যদন করে আছে।" খলিফার দায়িত্ব গ্রহণের পর মুহূর্তেই খলিফাদের জন্যে রক্ষিত রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বিশেষ সুগন্ধি তাকে ব্যবহারের জন্যে দেওয়া হলো। তিনি সুগন্ধি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেনঃ

সুগন্ধি ব্যবহার করার মত বিলাসী দিন আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়েছে। ইসলামী শাসনের অন্তর্ভূক্ত সাম্রাজ্যের কোন একটি প্রাণীও যদি খাদ্যাভাবে অনাহারে কাল কাটায় বা কোন ব্যক্তির নাগরিক অধিকার খর্ব হয়, তাহলে কেয়ামতের ভয়াবহ ময়দানে সর্বাগ্রে আমি উমারকেই মহাপ্রতাপশালী আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। আমি আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তায় অস্থির, আমি তীব্রভাবে অনুধাবন করছি, গোটা জাতির ছোট বড় প্রতিটি কর্মের গুরুদায়িত্ব আমার উপরে অর্পণ করা হয়েছে।

আমি যখন নিঃস্ব, অসহায়, ইয়াতিম, গরীব, দুঃখী, দিনমজুর, সৎ, অসৎ প্রতিটি নাগরিকের কথা চিন্তা করি, এই বিশাল সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে যারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবাস করছে–যাদের দায়িত্বশীল আমি। আল্লাহ আমাকেই এদের ব্যাপারে প্রশ্ন করবেন। নবী (সাঃ) এদের অবস্থা সম্পর্কে

আমাকেই জিজ্ঞাসা করবেন। তখন আমি কি জবাব দিব? আল্লাহর সামনে এবং রাসূলের উপস্থিতিতে যদি সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারি, তাহলে তো রাসূল (সাঃ) আমার জন্যে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করবেন না। তখন আমার পরিণাম কি হবে? এ সমস্ত চিন্তায় আমি নিদ্রাহীন যামিনী অতিবাহিত করি। আমার কলিজা ভয়ে থর থর করে কেঁপে উঠে। আমার চোখ দিয়ে অশ্রুর বন্যা নেমে আসে।"

আল্লাহভীরু সৎলোকের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হলে তাঁরা জাতির উন্নতি অবনতির চিন্তায় থাকে ব্যকুল। খলিফা উমর ইবনে আবদুল আযীয (রাহঃ) রাজধানী দামেস্কে বাস করেও তাঁর অতন্দ্র দৃষ্টি ইসলামী সাম্রাজ্যের বিশাল বিস্তীর্ণ অংগনের পশু প্রাণীর সুখ-দুঃখের দিকেও নজর রাখতেন। জীবনের প্রতিটি মূহুর্ত যিনি রাষ্ট্রের নাগরিকদের কল্যাণ ও ইসলামের ফরজ আদায়ে ব্যয় করতেন, তবুও অপারগতার ভয়ে তাঁর চিত্ত থাকতো সর্বদা অস্থির।

একদিন তাঁর স্ত্রী ফাতেমা নামাজান্তে খলিফাকে অশ্রুসিক্ত নয়নে দেখে তাঁর ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলেন, খলিফা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেনঃ ফাতেমা, আমি মুসলমান ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সেবক নিযুক্ত হয়েছি। যে কাঙ্গালগণ অনশনগ্রস্ত, যে পীড়িতগণ অসহায়, যে বস্ত্রহীনগণ দুর্দশাগ্রস্ত, যে উৎপীড়িতগণ নিস্পেষিত, যে অচেনা-অজানাগণ কারারুদ্ধ এবং যে সকল সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের নগণ্য উপার্জন দ্বারা স্বপরিবারে মানবেতর জীবন-যাপন করছে, তাদের বিষয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও দূরবর্তী প্রদেশে অনুরূপ দুর্দশাগ্রস্ত মানবকুলের বিষয়াদি চিন্তা করছিলাম। কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ আমার কাছে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করবেন। উত্তর দেওয়ার মত শক্তি আমার নেই। সেদিন আত্মরক্ষার কোন কৌশলই ব্যবহার করা যাবে না। এই চিন্তায় আমি আমার চোখের পানি ধরে রাখতে পারছি না।

এর নাম জনগণের সেবা, এর নাম দায়িত্ব। দেশ-সমাজের সেবা করা কোন সহজ বিষয় নয়, সে বড় গুরুদায়িত্ব। যারা সমাজ-দেশ ও জাতির তথাকথিত সেবা করার লক্ষ্যে ভোটের সময় লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে সস্তা শ্লোগান দিয়ে জাতির নেতৃত্বের আসন দখল করতে চায়, যাদের চরিত্রে নামাজ নেই, রোজা নেই, আল্লাহ ভীতি নেই, বক্তৃতার মঞ্চে, পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে যারা মিথ্যে কথা বলে। নিজেরা সন্ত্রাস করে যারা অপরের কাঁধে দোষ চাপিয়ে দেয়, পরের মেয়ে, স্ত্রী নিয়ে যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায় তাঁরা যদি সমাজ-দেশ ও জাতির নেতা হয় তাহলে সে দেশ-জাতি ও সমাজের অধঃপতন

ধ্বংসের শেষ স্তরে গিয়ে পৌঁছায়। নেতৃত্ব কামনা করা ইসলাম হারাম করে দিয়েছে। যারাই নেতৃত্বের প্রতি লালায়িত হবে তাঁরাই যে অসৎলোক এতে কোন সন্দেহ নেই। ইসলামী সংগঠন জাতির সামনে নেতৃত্বপেশ করে। সংগঠন যাদেরকে নেতা হিসেবে মনোনয়ন দান করে তাঁরাই কেবল সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে জনগণের কাছে ভোট চাইতে পারে। তাঁরাই তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। আর যারা মনোনয়ন লাভের লক্ষ্যে মোটা অংকের চাঁদা সংগঠনকে দিয়ে জনবল প্রদর্শন করে নেতৃত্বের লোভী হয় তাঁরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই ভোট ভিক্ষা করে। তাদের দ্বারা জাতীয় সম্পদ অপচয় হয়। এরা একদিকে জাতির সম্পদ আত্মসাৎ করে অপরদিকে চিত্ত বিনোদনের নামে জাতিকে অভাব অনটনে রেখে জাতির সম্পদ অপচয় করে।

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনই কেবল জাতির সম্পদ জাতীয় উন্নয়নে ব্যবহারের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে পারে। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে কবি সাহিত্যিকরা তাঁর প্রশস্তিমূলক কাব্য, গদ্য রচনা করে ভীড় জমালো। তিনি ঘৃণাভরে সে সমস্ত কাব্য, স্তুতিবাদ প্রত্যাখ্যান করলেন। জনগণের অর্থের বিনিময়ে তিনি কবিতা সাহিত্যের প্রশস্তিমূলক বাণী শ্রবণ হারাম মনে করতেন। তিনি বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় গুরুদায়িত্ব যখন তাঁর কাঁধে চেপে বসলো তখন তিনি সেই সম্পদের যৎকিঞ্চিৎ রেখে বাকি সম্পদ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিয়ে দিলেন। কারণ জনগণের অধিকার অন্যায়ভাবে হরণ করে তাঁর পূর্বসূরীরা এ সম্পদ হস্তগত করেছিলেন বলে তাঁর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল।

ওমর ইবনে আবদুল আযীযের পূর্ববর্তী খলিফা ছিলেন সোলায়মান। তিনি মৃত্যুর পূর্বে গাসবা ইবনে সা'দকে বিশ হাজার দিনার দান করে একটি দানপত্র লিখে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিনারগুলো গাসবার হাতে পৌঁছাবার পূর্বেই খলিফা সোলায়মান ইন্তেকাল করেন। উমার ইবনে আব্দুল আযীয খলিফার আসনে সমাসীন হওয়ার কয়েক দিন পর গাসবা দরবারে এলেন। গাসবা ছিলেন খলিফার ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেনঃ "খলিফা সোলায়মান আমাকে কিছু অর্থ দান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে নির্দেশ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এসে পৌঁছিয়েছে। আপনি আমার বন্ধু লোক, আশাকরি আমার জন্যে খলিফা সোলায়মানের সে নির্দেশ আনন্দের সাথেই কার্যকর করবেন।"

খলিফা উমর ইবনে আব্দুল আযীয সহাস্যে বললেনঃ "কত টাকা"? গাসবা উত্তর দিল "বিশ হাজার দিনার"। শুনে খলিফা উমারের ভ্রূদ্বয় কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেনঃ "জাতীয় সম্পদ থেকে কোন একজনকে বিনা কারণে এত টাকা অনুদান দেয়া কিভাবে সম্ভব? আল্লাহর কসম। আমার পক্ষে এটা কিছুতেই সম্ভব নয়।" খলিফার উত্তর শুনে গাসবা ক্রোধ দমন করে বিদ্রুপ করে উমারকে বললোঃ "খলিফা সোলায়মান আপনাকেও জাবালুস ওয়ারস–এর জায়গীর দান করেছেন। ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে তাহলে আপনার সিদ্ধান্ত কি হবে"।

গাসবার প্রশ্নে খলিফার মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বললেনঃ "গাসবা, তুমি বলার পূর্বে, যে দিন আমি খলিফার দায়িত্ব গ্রহণ করেছি সেদিনই ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। ওটা যেখান থেকে এসেছে সেখানেই ফেরত যাবে। তারপর উপযুক্ত প্রার্থীকে তা দিয়ে দেওয়া হবে"। এ কথা বলে তিনি তাঁর ছেলেকে দিয়ে ঐ সম্পত্তির কাগজপত্র আনালেন। সেই কাগজপত্র খলিফা নিজহাতে গাসবার সামনে ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেললেন। তাঁর পূর্বসূরী শাসকেরা অন্যায়ভাবে যে সমস্ত আইন প্রণয়ন করে ছিলেন তিনি তা বাতিল করে দেন। স্বজনপ্রীতিমূলক যে সমস্ত ভাতা চালু ছিল, তিনি তা–ও বাতিল করে দেন।

ফলে খলিফা উমার ইবনে আবদুল আযীযের এক ফুফুর ভাতাও বন্ধ হয়ে গেল। ভাতা কেন বন্ধ করা হলো? এ প্রশ্ন করার জন্যে খলিফার ফুফু খলিফার বাড়ীতে আসলেন। খলিফা তখন রাষ্ট্রীয় কাজে বাড়ীর বাইরে ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে খলিফা এসে আহারে বসলেন। তাঁর ফুফু খলিফার সামনে গিয়ে দেখেন বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের খলিফা উমার ইবনে আবদুল আযীযের সামনে মাত্র দু'টুকরো শুকনো রুটি আর সামান্য লবণ ও তৈল। ফুফু খলিফার আহারের সামগ্রী দেখে বললেনঃ "তোমার কাছে কিছু অভাব–অভিযোগের কথা নিয়ে এসেছিলাম। এখন দেখি তোমার অভাবের কথাই আমাকে প্রথমে শুনতে হবে।"

খলিফা বিনয়ের সাথে বললেনঃ "কি করবো ফুফু আম্মা, এর চেয়ে উত্তম খাবার সংগ্রহ করার মত অর্থ আমার নেই।" ফুফু অনেক ভূমিকার পরে যাদের ভাতা বন্ধ হয়েছে তাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেন। তিনি বললেনঃ "তুমি যাদের ভাতা বন্ধ করেছো তুমিতো তাদের সে ভাতা মঞ্জুর করনি?" খলিফা বললেনঃ "ইসলামের দৃষ্টিতে যা ন্যায় ও সত্য আমি তাই করেছি।" তারপর তিনি একটি

দিনার, জলন্ত আগুনের পাত্র ও এক টুকরো গোস্ত এনে দিনারটি আগুনে উত্তপ্ত করে ফুফুর সামনে তা গোস্তের টুকরার উপর রাখলেন, গোস্ত পুড়ে গেল।

এবার খলিফা পোড়া গোস্তের দিকে আঙ্গুলী সংকেত করে ফুফুকে বললেনঃ "ফুফু আম্মা, আপনি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রকে জাহান্নামের এরূপ কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচাতে চান না?"

সৎলোকেরা ক্ষমতায় বসলে তাঁরা স্বজনপ্রীতি করেন না। তাঁরা আদালতে আখিরাতের ভয়ে সদা থাকেন কম্পমান। তাঁরা চাটুকারদের চাটুকারিতায় বা বদনামের ভয়ে জাতীয় সম্পদ অন্যায়ভাবে ব্যয় করেন না। মুসলিম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা থেকে রাজধানী দামেস্কে অনেক কবি-সাহিত্যিক এসে ভীড় জমালো। তাদের আগমনের সংবাদ দামেস্কের জনগণের মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেল। কিন্তু পূর্বের প্রথানুযায়ী রাজদরবার থেকে তাদের প্রতি কোন আহবান এলো না। অবশেষে কবিগণ নিজেরাই তাদের মধ্যে বিখ্যাত কবি জরিরকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে তাকে রাজদরবারে প্রেরণ করলেন।

কবি জরির খলিফার দরবারে এসে বললেনঃ "আমি শুনেছি আপনি জাতির দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের নিয়ে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকেন, তাই আমি হিজাজের দুঃখী মানুষদের দুঃখ দুর্দশা নিয়ে কবিতা রচনা করেছি। আপনার অনুমতি পেলে সে কবিতা আমি আপনাকে শোনাতে পারি।" খলিফা দুঃখী মানুষদের সম্পর্কে রচিত কবিতার কথা শুনে অনুমতি দিলেন। কবি জরির কবিতা আবৃত্তি করছেন আর খলিফার দু'নয়ন দিয়ে বন্যার পানির ন্যায় অশ্রুর জোয়ার বইছে। অপরিসীম বেদনার ঘনঘটায় খলিফার নূরানী চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল।

তিনি কান্না থামিয়ে রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে প্রচুর পরিমাণ সাহায্য সহ একটি সাহায্য কাফেলা তৎক্ষণাৎ হিজাজে প্রেরণ করলেন। তারপর তিনি কবি জরিরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেনঃ "আপনি কি মুহাজির?" কবি জরির উত্তর দিলেনঃ "না, আমি মুহাজির নই", খলিফা আবার প্রশ্ন করলেনঃ "আপনি কি অভাবগ্রস্ত আনছার অথবা তাদের কোন প্রিয়জন"? কবি বললেনঃ "না"। তিনি পুনরায় জানতে চাইলেনঃ "যারা ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল, আপনি তাদের কোন আত্মীয়"? কবি জবাব দিলেনঃ "জ্বী-না আমি তাদেরও কেউ নই"। খলিফা তখন বললেনঃ "তাহলে আমার ধারণানুযায়ী রাষ্ট্রীয় কোষাগারে এই মুহূর্তে আপনার কোন অংশ নেই"।

কবি জরির তৎক্ষণাৎ বললেনঃ "আমি একজন মুসাফির, বহু দূর থেকে এসে আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্যে অনেক দিন ধরে দামেস্কে অবস্থান করছি।"

খলিফা কবির কথা শুনে মৃদুহেসে অর্থ সচিবকে নিম্নস্বরে কিছু বললেন, অর্থ সচিব বিশটি দিনার এনে খলিফার হাতে দিলেন। খলিফা দিনার কয়টি কবি জরিরের হাতে দিয়ে বললেনঃ "এই দিনার কয়টি আমার এই মূহূর্তের সম্বল, আপনি ইচ্ছে করলে এগুলো গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে পারেন অথবা আমার বদনাম করতে পারেন।" বিস্ময়ে আড়ষ্ট কবি বিস্ফারিত নেত্রে খলিফার দিকে চেয়ে আছে। তাঁর দৃষ্টিতে অসীম শ্রদ্ধা আর আনন্দের বন্যা। তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে বিনয় জড়িত ভাষায় খলিফাকে বললেনঃ "বদনাম নয়, আমি এর জন্যেই গৌরববোধ করবো।" এ কথা বলে কবি জরির দরবার ত্যাগ করে অপেক্ষমান তাঁর সঙ্গীদের কাছে এসে বললেনঃ "আমি এমন এক মহান রাজদরবার থেকে এসেছি যার রাজভান্ডার শুধু দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্যেই উন্মুক্ত।"

মূলতঃ রাষ্ট্রীয় সম্পদের অধিকারী একমাত্র জনগণ। যে পন্থায় অর্থ সম্পদ ব্যয় করলে জাতির কোন কল্যাণ নিহিত নেই, সে পথে জাতীয় অর্থ ব্যয় করার কোন অধিকার নেই শাসক কর্তৃপক্ষের। বর্তমান শাসনযন্ত্রে আল্লাহভীরু সৎলোকের অনুপস্থিতির ফলে দেশের কোটি কোটি জনতাকে অন্নহীন, বস্ত্রহীন, শিক্ষা-চিকিৎসা ও বাসগৃহহীন রেখে তথাকথিত চিত্তবিনোদন ক্রীড়া প্রতিযোগীতার নামে বুভুক্ষ জনতার লক্ষ কোটি টাকার আতশবাজী পোড়ানো হয় আকাশে। পরকালের ভীতিশূন্য মানসিকতা এ ধরণের অপচয়ের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করে। আর আদালতে আখিরাতে জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের পুংখানুপুংখ হিসেব দেওয়ার মানসিকতা থাকলে শাসক কারো সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি এমনকি নিজ সন্তান ও স্ত্রীর স্বার্থের প্রতিও তোয়াক্কা করেন না। তাঁর মনে একই চিন্তা ক্রিয়াশীল থাকে যে, তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।

হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব গ্রহণ করেই নিজ স্ত্রী ফাতিমাকে বললেনঃ "তুমি আমাকে চাও, না তোমার পিতার পক্ষ থেকে দেওয়া উপহার-যা অসৎ পথে সংগ্রীত হয়েছে, সেগুলো চাও? যদি আমাকে চাও তাহলে এই মূহুর্তে তোমার পিতার দেওয়া মনিমানিক্য সোনাদানা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিয়ে দাও।" খলিফা সোলায়মানের আদর্শ কন্যা ফাতিমা মনিমানিক্য-অলংকারাদীর বিনিময়ে আল্লাহভীরু স্বামীকেই গ্রহণ করলেন। খলিফা দরবারে বসে আছেন। খাদ্য বিভাগে জমা দেওয়ার জন্যে কিছু খেজুর দরবারে নিয়ে আসা হলো। খলিফার নিস্পাপ মাছুম বাচ্চা, দুধের শিশু। পৃথিবীর বাস্তবতা সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সেই বাচ্চা শিশু খেজুর দেখে হাঁটি হাঁটি পা-পা করে খেজুরের ঝুড়ির কাছে গেল।

শিশুটি ঝুড়ি থেকে একটি খোরমা খেজুর তুলে মুখে পুরে দিল। ছেলের এই কান্ড দেখে খলিফার পঞ্চইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো। তিনি দৌড়িয়ে গিয়ে শিশু বাচ্চার মুখের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে খেজুর বের করে এনে ঝুড়িতে রাখলেন। ছেলে চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে মায়ের কাছে নালিশ করলো। কিছুক্ষণ পরে খলিফা বাড়ীর মধ্যে এসে স্ত্রী ফাতিমার মলিন চেহারা দেখে বললেনঃ "ফাতিমা, ছেলের মুখ থেকে খেজুর কেড়ে নেওয়ার সময় আমার কলিজা দিয়ে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। কিন্তু কি করবো বলো। খেজুরগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি। একজন নাগরিক হিসেবে এতে আমারও অংশ আছে। কিন্তু তা বন্টনের পূর্বে আমি কিভাবে ছেলেকে খেতে অনুমতি দিব?

খলিফা তো এ সুযোগ গ্রহণ করতে পারতেন যে, এতে যখন নাগরিক হিসেবে আমার অংশ আছে তখন দুগ্ধপোষ্য ছেলে একটা খেজুর যখন মুখের মধ্যে দিয়েই দিয়েছে, তখন বন্টনের সময় আমি একটি খেজুর কম নিব। আল্লাহভীরু খলিফা এ ধরণের সুযোগ গ্রহণ করেননি। তিনি পরকালের ভয়ে অত্যন্ত নিষ্ঠুর পদ্ধতিতে তাঁর স্নেহের ধন কলিজার টুকরা সন্তানের মুখে থেকে সামান্য একটি খেজুর ছিনিয়ে নিয়েছেন।

হযরত উমার ইবনে আব্দুল আযীয কোন অনুন্নত ক্ষুদ্র দেশের খলিফা ছিলেন না। তিনি ছিলেন এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট। যার রাষ্ট্রের পরিধি ছিল, পূর্বে ভারত থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা থেকে উত্তরে স্পেন ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত। তদানিন্তন পৃথিবীতে সবচেয়ে সমৃদ্ধশালী ও শ্রেষ্ঠ সমরশক্তির অধিকারী মুসলিম জাহান–যার রাজধানী দামেস্ক। এত বড় একটি বিশাল ও শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যিনি, অথচ সীমাহীন দারিদ্রতার নির্মম কষাঘাতে তিনি ও তাঁর পরিবার বিপর্যস্ত।

খলিফার বাড়ীতে কোন কাজের লোক নেই। তাঁর স্ত্রী একা সব দিকে সামলে উঠতে পারেন না। খলিফা স্ত্রীর কষ্ট দেখে অনেক চেষ্টা সাধনার পরে বাড়ীতে একটি চাকর রাখলেন। খলিফার স্ত্রী নতুন চাকরকে খেতে দিলেন শুধু ডাল আর ভাত। সম্রাটের বাড়ীর খাদ্যের এই দুরাবস্থা দেখে চাকরের চক্ষু চড়ক গাছ। কোথায় সম্রাটের বাড়ীতে উৎকৃষ্ট খাদ্য খেয়ে স্বাস্থ্যটা নাদুস-নুদুস বানাবে? কিন্তু একি? এ যে শুধু ডাল ভাত? এ কোন ফকিরের বাড়ীতে চাকরী করতে এলাম? বাড়ীতে কোন মূল্যবান আসবাবপত্র নেই, পরিবারের সবার পোশাক পরিচ্ছদ মলিন, ছিন্ন, তালিযুক্ত?

এদের অর্থনৈতিক অবস্থার তুলনায় আমার অবস্থায়ই তো ভালো? চাকরটি এ সমস্ত চিন্তা করে খলিফার স্ত্রীকে প্রশ্ন করলোঃ "আপনাদের খাদ্যের কি এই অবস্থা"? খলিফা পত্নী পর্দার আড়াল থেকে বললেনঃ খলিফা তো এ ধরণের খাদ্যই দিনের পর দিন গ্রহণ করে যাচ্ছেন।" আড়ম্বর পূর্ণ প্রাচুর্যতায় ভরা বিলাসী জীবন তো শাসকবৃন্দের হতে পারে না। যাদের দায়িত্বই হলো জাতির অভাব অভিযোগ দূর করা। তাদের সময় কোথায় যে তাঁরা নিজ পরিবারের অভাব দূর করবেন? আর অর্থই বা পাবেন কোথায়? সবই তো জনসাধারণের অর্থ।

ঈদের উৎসব সমাগত। মুসলিম জাহানের প্রতিটি নাগরিক নব সাজে সজ্জিত। বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যেন আনন্দের হিল্লোল প্রবাহমান। গোটা জাতি নতুন পোশাক আর রকমারি সুস্বাদু খাদ্যের আয়োজনে ব্যস্ত। কিন্তু এই সম্রাজ্যের যিনি সম্রাট তাঁর পরিবারে অভাব নামক দানব মুখ ব্যদন করে আছে। উন্নত খাদ্য আর দামী পোশাকের ব্যবস্থা করার মত অর্থের সংগতি খলিফার নেই। তাঁর স্ত্রী ভয়ে ভয়ে কাছে এসে অনুচ্চ কণ্ঠে স্বামী উমার ইবনে আবদুল আযীযকে বললেনঃ "ঈদ এসে গেল। ছেলে মেয়েদের নতুন পোশাক ও একটু ভালো খাবারের তো কোন ব্যবস্থা করা হলো না"? খলিফা বললেনঃ "তাই তো, কিন্তু কি করবো বলো। তুমি যা আশা করেছো তা পূরণ হওয়ার নয়। খলিফা হিসেবে আমি প্রতিদিন যা ভাতা পাই, তাই দিয়ে ডাল ভাত যোগাড় করা আমার জন্যে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়, তার উপরে নতুন পোশাক ভালো খাবার? অসম্ভব ব্যাপার"।

খলিফার স্ত্রী করুণ কণ্ঠে আবেদন করলেনঃ "তাহলে আপনি অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আপনার এক সপ্তাহের ভাতা অগ্রিম গ্রহণ করে আমাকে দিন। আমি তাই দিয়ে ছেলে মেয়েদের নতুন জামা ও একটু ভালো খাবারের ব্যবস্থা করি।" খলিফা তাঁর স্ত্রীকে হতাশ করে বললেনঃ ফাতিমা, তাও সম্ভব নয়। কারণ আগামী এক সপ্তাহ আমি বেঁচে থাকবো তার নিশ্চয়তা কি? আর ঐ সাতদিন জনগণ আমাকে ক্ষমতায় রাখবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? তারচেয়ে এ বিলাস আকাংখা অপূর্ণই থেকে যাক–তবুও ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে আদালতে আখিরাতে আমি দাঁড়াতে চাই না।

এই হলো আল্লাহভীরু সৎলোকের, সৎশাসকের অবস্থা। তাঁরা নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়া বলতে নিজের দেহকে উত্তপ্ত উনুনের উপরে আরোহণ করা বুঝতেন। আল্লাহ ভীতিহীন অসৎলোকেরা নেতৃত্ব লাভের আশায় জাতির

মেরুদন্ড তরুণ-যুবকদের হাতে অর্থ দিয়ে তাদের দ্বারা এলাকায় মহল্লায় নির্বাচনে তাঁর পক্ষে ঘৃণ্য প্রচারণা চালায়। রং বেরঙের ছবি পোস্টারে ছাপিয়ে মিথ্যে কথার ধূম্রজাল সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে নেতৃত্বের আসন দখল করে জাতিকে শোষণ করে।

আর আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের লক্ষ্যে যে নেতৃত্ব জাতির সামনে নিজেকে পেশ করে নির্বাচনে, সে আল্লাহভীরু নেতৃত্ব কথামালা, মিথ্যে ওয়াদা বা অর্থ ছিটিয়ে নির্বাচনে আসে না। তাঁরা ইসলামের দাবী অনুযায়ী জাতিকে পথকিলতার আবর্ত থেকে উদ্ধার করে সম্মানের আসনে আসীন করার লক্ষ্যেই নির্বাচনে সংগঠনের নির্দেশেই প্রার্থী হয়। এরা নির্বাচনে জয়ী হয়ে নেতৃত্বের আসনে যখন সমাসীন হয় তখন তাদের চোখ থেকে ঘুম বিদায় গ্রহণ করে। জবাবদিহির ভয়ে জীবন হয়ে যায় অস্থির-চঞ্চল। সামান্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বস্তু গ্রহণকালেও তাঁরা আখিরাতে জবাবদিহির চিন্তা করেন।

খলিফা উমার ইবনে আবদুল আযীযের দরবারে উপহার হিসেবে এক ঝুড়ি সুস্বাদু আপেল এলো। আপেলের পক্কতা ও সুমিষ্ট গন্ধে খলিফা খুবই সন্তুষ্ট হলেন, তিনি ঝুড়ি থেকে একটি আপেল উঠিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ তা নেড়ে-চেড়ে ঝুড়িতে রেখে ঝুড়ি সমেত আপেল উপহারদাতার কাছে ফেরৎ পাঠালেন। দরবারের একব্যক্তি খলিফাকে অনুযোগ করে বললোঃ "মহানবী (সাঃ) তো কোন উপহার ফেরৎ পাঠাতেন না। তিনি (সাঃ) তা গ্রহণ করতেন।" খলিফা গম্ভির কণ্ঠে বললেনঃ "এ ধরণের উপহার আল্লাহর নবীর (সাঃ) জন্যেই সত্যই উপহার, কিন্তু আমাদের মত শাসকদের জন্যে তা হচ্ছে ঘুষ।"

কোন ব্যক্তি দেশ-সমাজ বা জাতির দায়িত্বপূর্ণ কোন পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে মানুষের কাছে সে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বা তেমন কোন পরিচিতি থাকে না। ফলে দেশের বা সমাজের সর্বস্তরের মানুষ তাকে উপহার, সম্ভ্রম, সম্মান কোন কিছুই দেয় না। কিন্তু ঐ অপরিচিত ব্যক্তিই যখন সৌভাগ্যক্রমে (?) জাতীয় নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়, তখন অনেক ধুরন্ধর ব্যক্তিই তাঁর ব্যক্তি স্বার্থ উদ্ধারের লক্ষ্যে নেতৃত্বযন্ত্রের আশেপাশে ঘুর ঘুর করতে থাকে। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে আত্মীয়তার পরিচয়ে, বন্ধুত্বের ছদ্মাবরণে, উপহার সামগ্রী নিয়ে, স্তব স্তুতির বাণী নিয়ে উপস্থিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই আল্লাহভীরু সৎনেতৃত্ব এদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।

ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় প্রতিটি দায়িত্বশীলের বাসগৃহের দ্বার দেশের নাগরিকদের অভিযোগ শোনার জন্যে দিবারাত্রি উন্মুক্ত থাকে। ইরাক থেকে

এক অভাবী মহিলা দামেস্কে খলিফা উমার ইবনে আবদুল আযীযের বাড়ীতে আগমন করলেন তাঁর অভাব অভিযোগ খলিফার কাছে তুলে ধরার লক্ষ্যে। মহিলা খলিফার বাড়ীতে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন খলিফা পত্নী কাপড় সেলাই করছেন। তিনি খলিফার বাসগৃহের এদিক ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলেন কোন দামী আসবাবপত্র নেই। চতুরদিকে দারিদ্রতার সুস্পষ্ট ছাপ। তিনি মুসলিম সাম্রাজ্যের মহাপ্রতাপশালী শাসকের বাসগৃহের এ করুণ অবস্থা দর্শন করে বেদনায় আর্তনাদ করে উঠলেন। মহিলাটি খলিফার স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেনঃ

"যে ঘরে দারিদ্রতার নিষ্ঠুর চিহ্ন বিদ্যমান আর আমি কি–না এসেছি সে ঘর থেকে সাহায্য গ্রহণ করে নিজের দারিদ্রতা মোচন করতে?" খলিফার স্ত্রী বললেনঃ "দেশের জনগণকে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে গিয়েই তো খলিফার ঘর দারিদ্রতায় পূর্ণ হয়েছে।" এমন সময় খলিফা মলিন বেশে বাড়ীতে প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীর সাংসারিক কাজে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে উঠানের মাঝখানে কূপ থেকে পানি উঠিয়ে একটি পাত্রে রাখতে লাগলেন। খলিফা পানি উঠাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে স্ত্রী ফাতিমার দারিদ্রক্লিষ্ট মুখের দিকে নজর করে দেখছেন।

ইরাক থেকে আগত মহিলাটি এটা লক্ষ্য করে খলিফা পত্নীকে বললেনঃ "এ বেহায়া চাকরটি থেকে আপনি পর্দা করেন না কেন? দেখছেন না, লোকটি কেমন নির্লজ্জের মত বার বার আপনার দিকে তাকাচ্ছে?" খলিফা পত্নী মহিলাটির কথা শুনে মৃদু হেসে বললেনঃ "ইনিই তো আমীরুল মুমেনীন।" খলিফার এই অবস্থা দেখে মহিলাটি বিস্ফারিত নেত্রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন, খলিফা পানি তোলা শেষ করে মহিলাটিকে ছালাম জানিয়ে নামাজ আদায়ের জন্যে ঘরে প্রবেশ করলেন। নামাজে দাঁড়ানোর পূর্বেই তাঁর মনে পড়লো মহিলাটির কথা। তিনি নিজ স্ত্রীকে ডেকে মহিলাটি সম্পর্কে জানতে চাইলেন। খলিফার স্ত্রী মহিলার অভাব সম্পর্কে খলিফাকে বললেন। তিনি মহিলাকে ডেকে তাঁর মুখ থেকেই শুনলেন।

মহিলা বলছেনঃ "আমার অর্থনৈতিক অবস্থা চরম বিপর্যস্ত। দুর্ভিক্ষ পীড়িত আমার সংসার। কোন উপার্জনশীল পুরুষ আমার সংসারে অনুপস্থিত। এ অবস্থায় আমার পাঁচটি কন্যা সন্তানসহ আমি খুবই দুরাবস্থায় নিপতিত হয়েছি। আপনি অনুগ্রহপূর্বক আমাকে সাহায্য করুন।"

খলিফা মহিলাটির কথা শুনে খুবই ব্যথিত হলেন। তিনি সাথে সাথে ইরাকের গভর্ণরের কাছে মহিলার কন্যাদের জন্যে ভাতা নির্ধারণ করে পত্র লিখে মহিলার হাতে দিলেন। পাঁচ কন্যাদের মধ্যে চারজনের ভাতা নির্ধারণ করে খলিফা মহিলাকে বললেনঃ "চারজনের খরচ দিয়ে পাঁচ জনের খরচ ইনশাল্লাহ চলবে।" মহিলা যখন খলিফার পত্র নিয়ে ইরাকের গভর্ণরের হাতে দিলেন তখন পত্র হাতে নিয়ে গভর্ণর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

মহিলা গভর্ণরকে কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেনঃ "আপনি যে মহামানবের পত্র নিয়ে এসেছেন, বিধাতার নির্মম নিষ্ঠুর পরিহাস, সে হৃদয়বান মহাপুরুষ আল্লাহভীরু শাসক খলিফা উমার ইবনে আবদুল আযীয আর এ দুনিয়ায় নাই। তবে মা আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, ঐ মহামানবের নির্দেশানুযায়ী আমি আপনার কন্যাদের ভাতা মঞ্জুর করলাম।

তাঁর শাসনকালে মুসলিম সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এত বেশী হয়েছিল যে, বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যে একটি নাগরিকও জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত ছিল না। মানুষেরা জাকাতের অর্থ সম্পদ কাঁধে করে নিয়ে দেশে দেশে অভাবী মানুষদের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে পড়তো তবুও অভাবী লোক পাওয়া যেত না।

এক ব্যক্তি জাকাতের টাকার এক বড় থলে পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে দিনের পর দিন অভাবী মানুষের সন্ধানে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে এক স্থানে বসে বিশ্রাম গ্রহণ করছে। সে দেখতে পেল কিছু দূরে একটি লোক বড় একটি বস্তা মাটিতে রেখে মলিন পোশাকে চিন্তিত মনে বসে আছে। প্রথম লোকটি চিন্তা করলোঃ এতদিনে বোধহয় একটি অভাবী মানুষের সন্ধান পেলাম। এই ধারণা করে সে টাকার থলে দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললোঃ "ভাই আপনার পোশাক ও চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি বোধহয় খুবই গরীব, আপনি এই জাকাতের অর্থগুলো গ্রহণ করে আমাকে পরিশ্রমের হাত থেকে উদ্ধার করুন।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললেনঃ "ভাই আপনি আমার পোশাক ও চেহারা দেখে ধারণা করেছেন আমি বোধহয় জাকাত গ্রহণের উপযুক্ত। আসলে আমার ঐ বস্তার মধ্যে জাকাতের টাকা। আমিও অভাবী মানুষ অনুসন্ধান করতে করতে আমার চেহারা ও পোশাক পরিচ্ছদ ধূলো বালিতে মলিন হয়ে গেছে"।

"আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন জাতীয় জীবনে এমনি সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জাকাত আদায় করে তা পরিকল্পিত উপায়ে ব্যবহার করলে দারিদ্রতার অভিশাপ থেকে জাতি সহজেই মুক্তি লাভ করতে পারে। মানুষেরা একটি সুখী সমৃদ্ধশালী নিরাপত্তাপূর্ণ ভীতিহীন পরিবেশ লাভ করতে পারে। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনই জাতির সমৃদ্ধির চাবিকাঠি।

তহশীলদার নই-আদর্শের বিস্তৃতিই কাম্য

বংশানুক্রমিক ধারানুযায়ী আল্লাহভীরু উমার ইবনে আবদুল আযীয যখন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হলেন তখন তিনি একটি বিরাট সাধারণ সম্মেলনের ব্যবস্থা করে সেই সম্মেলনে ঘোষণা করলেনঃ

প্রিয় দেশবাসী, আমার সম্মতি ও আপনাদের রায় গ্রহণ ব্যতিরেকেই আমাকে আপনাদের শাসক হিসেবে জাতির কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমার বাইয়াত ও আনুগত্য থেকে আমি আপনাদেরকে মুক্ত ও স্বাধীন করে দিলাম। এখন আপনারা আপনাদের স্বাধীন চিন্তাধারা অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তিকে আপনাদের পছন্দ, তাকেই খলিফা হিসেবে মনোনীত করুন।

উপস্থিত জনসাধারণ রায় দিলঃ "আপনাকেই আমরা খলিফা হিসেবে মনোনীত করলাম"। তিনি বললেনঃ "তাহলে আপনারা ঐ সময় পর্যন্তই আমার নির্দেশ পালন করে চলবেন যে সময় পর্যন্ত আমি ইসলামের বিধি অনুযায়ী চলবো"। এরপর তিনি যখন রাজপ্রাসাদের দিকে গেলেন তখন মরহুম খলিফা সোলায়মানের পরিবার পরিজন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে দেওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি তাদের ব্যস্ততা দেখে বললেনঃ রাজ প্রাসাদ নয়, আমার জন্যে একটি তাঁবুর ব্যবস্থা করেন আমি তাঁবুতেই বসবাস করবো।

হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) এর শাসনামল থেকে খলিফা সোলায়মানের শাসনকাল পর্যন্ত মুসলিম সাম্রাজ্যের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত এলাকা, লাভজনক জায়গীর ও উর্বর ভূমি যা ছিল তার সবই উমাইয়া বংশীয় লোকদের মধ্যে অন্যায়ভাবে বন্টন করা হয়েছিল। গোটা মুসলিম জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ সম্পদই রাজকীয় আদেশের বলে উমাইয়া বংশের লোকদের হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল। নারকীয় পুঁজিবাদ যেন মুসলিম উম্মাহর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিল।

জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত খলিফা হযরত উমার ইবনে আবদুল আযীয (রাহঃ) এই আগ্রাসী পুঁজিবাদের টুটি চেপে ধরলেন নিষ্ঠুর হাতে কোন শক্তির পরোয়া না করে। তিনি উমাইয়া বংশীয় ধনাঢ্য পুঁজিপতিদের আমন্ত্রণ করে বললেনঃ পূর্ববর্তী শাসকবৃন্দ স্বজনপ্রীতি ও অন্যায়ভাবে যে সমস্ত সম্পদ আপনাদেরকে দান করে গেছেন তা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে দান করতে হবে। কেননা ঐ সমস্ত সম্পদের প্রকৃত অধিকারী দেশের জনগণ। উমাইয়া বংশীয় পুঁজিপতিগণ তীব্র প্রতিবাদ করে খলিফাকে বললেনঃ আমাদের দেহে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত আমরা তা ফেরৎ দিব না।

তিনি পুঁজিপতিদের হুমকিতে নতি স্বীকার না করে দেশের জনগণকে প্রধান মসজিদে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে জনতা মসজিদে উপস্থিত হলো। তিনি পূর্ববর্তী খলিফাদের অন্যায় শাহী আদেশের বলে অধিকৃত তাঁর পরিবার ও উমাইয়াদের সকল সম্পদ ও জায়গীরের দলিলসমূহের এক বিরাট বস্তাসহ মসজিদে জনতার সামনে উপস্থিত হলেন।

খলিফার প্রধান সচিব এক এক করে এ সমস্ত দলিল হাতে নিয়ে পড়ে শোনাতে লাগলেন আর খলিফা জনসাধারণের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেনঃ এ দলিলের শক্তিতে অধিকৃত সম্পদ আমি তার প্রকৃত মালিক অথবা তাদের উত্তরাধিকারীর মালিকানায় ফেরৎ দিয়ে দিচ্ছি। সর্বসমক্ষে এভাবে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েই খলিফা ক্ষান্ত হলেন না, সেই সাথে জনতার উপস্থিতিতে সম্পত্তির সমস্ত দলিল তিনি নিজ হাতে কাচি দিয়ে কেটে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলে দিলেন।

বিশাল সাম্রাজ্যের পুঁজিপতিরা জনগণকে সংগঠিত করে তাঁর খেলাফতের বিরুদ্ধে হুমকি সৃষ্টি করবে এ ভয় তিনি করেননি। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে ঘোষণা করেনঃ "অন্যায়ভাবে প্রাপ্ত ভাতা ও সম্পদ থেকে যারা বঞ্চিত হয়েছো তাঁরা শুনে রাখো, গোটা পৃথিবীর সমস্ত মানুষেরা যদি তোমাদের সমর্থক হয়ে যায় তবুও আমি উমার ইসলামের বিধান লংঘন করে তোমাদের দাবী মঞ্জুর করবো না"। তিনি গোটা সাম্রাজ্যে আদেশ জারি করলেনঃ

"ইসলাম গ্রহণ করার পরে কোন ব্যক্তির নিকট থেকে একটি মাত্র দিরহামও আদায় করা যাবে না।" তাঁর এ ঘোষণা শুনে অমুসলিম নাগরিকগণ দলে দলে ইসলাম কবুল করতে লাগলো। ফলে জিজিয়া করের অভাবে রাষ্ট্রীয় অর্থ ভান্ডার প্রায় শূন্য হয়ে পড়লো। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করে খলিফাকে জানালেন

"জিজিয়া কর সম্পর্কে নতুন অধ্যাদেশ জারি হওয়ার ফলে অমুসলিমরা এত বিপুল হারে ইসলাম গ্রহণ করছে যে, জিজিয়া কর আমদানী প্রায় বন্ধ। অর্থ ভাড়ারে কোন অর্থ নেই। ফলে আমি কর্জ করে রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের বেতন দিচ্ছি"।

খলিফা প্রতিবেদক হাইয়ানকে লিখলেনঃ "মহানবী (সাঃ) বিশ্বমানবতার পথ প্রদর্শক হিসেবে পৃথিবীতে আগমন করেছিলেন, রাজস্ব আদায়ের তহশীলদাররূপে তিনি আবির্ভূত হননি। আমি কামনা করি সমস্ত মানুষই ইসলাম কবুল করুক। জিজিয়া করের প্রয়োজন নেই। আমরা যারা রাষ্ট্রীয় কর্মচারী তাঁরা দৈহিক শ্রম দিয়েই না হয় জীবিকা নির্বাহ করবো।"

একবার ইয়েমেনের রাজকোষ থেকে একটি দিনার হারিয়ে গেলে তিনি ব্যকুল হয়ে কোষাধ্যক্ষকে লিখলেনঃ "তুমি অন্যায়ভাবে জাতির অর্থ ব্যয় করেছো, আমি তা বলছি না। কিন্তু তোমার অসতর্কতা-ই যে এ জন্যে দায়ী এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। গোটা মুসলিম জনসাধারণের পক্ষ থেকে আমি দাবী করছি, ইসলামের আইনানুযায়ী তোমাকে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হবে যে, এ অর্থ হারানোর ব্যাপারে তোমার কোন হাত ছিল না।"

সৎলোকেরা শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে তাদের দৃষ্টি থেকে সামান্য ব্যাপারও এড়িয়ে যেতে পারে না। উমার ইবনে আবদুল আযীয তাঁর রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের কাছে একপত্রে লিখলেনঃ

"অতীতের সেই দারিদ্রতাপূর্ণ দিনগুলোর কথা তোমরা স্মরণে রেখ, যখন তোমরা আলোর অভাবে অন্ধকার পথে হেঁটে গিয়ে মসজিদে নববীতে নামাজ আদায় করেছো। আল্লাহর কসম! আজ তোমাদের অবস্থা অনেক ভালো। তোমাদের কলমের মাথার দিকে সরু করবে। যাতে জনগণের অর্থে ক্রয় করা কালি কম ব্যয় হয়। কাগজের উভয় পৃষ্ঠাতেই লিখবে। আর লিখার সময় দু'লাইনের মধ্যে যাতে বেশী ব্যবধান না থাকে সেদিকে নজর রাখবে। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মে ব্যয় সংকোচন নীতি অবলম্বন করবে। সাধারণ মানুষের অর্থ থেকে এমন কোন কর্মকান্ডে অর্থ ব্যয় করবে না যা দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে তাদের কোন উপকার না হয়।"

এক ব্যক্তি রাত্রিকালে খলিফার সাথে সাক্ষাৎ করতে এলেন। খলিফা তখন রাষ্ট্রীয় কর্মে ব্যস্ত। তিনি লোকটিকে প্রশ্ন করলেনঃ "আপনার প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় না ব্যক্তিগত?" লোকটি উত্তর দিলঃ "ব্যক্তিগত।" তিনি সাথে সাথে জ্বলন্ত মোম

বাতিটি নিভিয়ে দিয়ে অন্য একটি মোমবাতি জ্বালালেন। প্রয়োজনীয় আলোচনা শেষে লোকটি খলিফাকে প্রশ্ন করলেনঃ

"আমীরুল মুমেনীন, একটি বাতি নিভিয়ে অপরটি জ্বালালেন কেন?" খলিফা বললেনঃ "আমি যখন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত ছিলাম তখন রাষ্ট্রীয় মোমবাতি ব্যবহার করেছি। এখন আপনার সাথে ব্যক্তিগত কথা বললাম তাই আমার ব্যক্তিগত মোমবাতি ব্যবহার করলাম"। ইসলামী শাসনের অধিনে আল্লাহভীরু সৎলোকেরা রাষ্ট্রীয় সম্পদের দিকে এভাবেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন।

বাধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য যার গতি

সবুজ ঘন অরণ্যানী পরিবেষ্টিত পশ্চিম আফ্রিকা। আটলান্টিক মহাসাগর আর ভূমধ্যসাগরের নীল বারিধারায় বিধৌত অঞ্চল। শোষক শক্তির নির্মম অত্যাচারের যাঁতাকলে নিস্পেষিত মানবতা। জালিমের দুঃশাসনে বন্দী মানবাত্মা আর্তনাদ করছে। নিপিড়ীত মানুষেরা মুক্তির জন্যে হাহাকার করছে। কিন্তু কে শোনাবে তাদেরকে মহা মুক্তির অমিয় বানী? অত্যাচারী বলদর্পী রোমান শক্তিকে ধ্বংশ করার প্রলয় বীণা কে বাজাবে? ক্ষমতার আসনে মদমত্ত রোমানদেরকে কে মানবাধিকারের বাণী শোনাবে? কে–সে প্রশস্ত কলিজার অধিকারী?

অবশেষে রোমানদের নিস্পেষণে অতিষ্ঠ হয়ে পশ্চিম আফ্রিকার শোষিত নিপড়ীত ও নির্য্যাতিত জনতা মানব মুক্তি সনদের সংরক্ষণকারী মুসলিমদের কাছে আবেদন পাঠালোঃ "শোষকের লোলুপ থাবা থেকে আমাদের উদ্ধার করুন।" মুসলিম সাম্রাজ্যের শাসকের নির্দেশে সত্যের সিপাহসালার তাঁর বাহিনী নিয়ে বাধভাঙ্গা প্লাবনের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চললেন পশ্চিমের দিকে। বিরামহীন গতিতে সিপাহসালার উকবা ছুটে চলেছেন। সত্যের পতাকাধারী উকবার কোন ক্লান্তি নেই। পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের বজ্রশপথ নিয়েছেন উকবা। সামনের বাধার বিন্ধাচলকে ঝঞ্ঝার বেগে নিমিষে চূর্ণ বিচূর্ণ করছেন তাওহীদের এই নির্ভীক সৈনিক।

যেখানে আর্ত মানবতার ক্রন্দন রোল সেখানেই উকবার দৃঢ় পদচারণা। শোষকের চিহ্ন মুছে দিয়ে তিনি পুনরায় দুর্বার বেগে সামনে ছুটছেন। মানব রচিত বিধানের কালো আইন আর অসৎ লোকের নেতৃত্ব যেখানে, সেখানেই

উকবার তরবারী সূর্য কিরণে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। তিনি হন্য হয়ে খুঁজে ফিরছেন, এমন ভূখন্ড কোথায়? যেখানে এখনো আল্লাহর আইন আর সৎলোকের শাসন কায়েম হয়নি? আল–কুরআনের সাহসী সৈনিক উকবার আকুল প্রার্থনাঃ

"আল্লাহ্ আমাকে সন্ধান দিন, যে দেশে আপনার তাওহীদের বাণী এখনো পৌছায়নি, যেখানে এখনো আল– কুরআনের আলো প্রজ্জ্বলিত হয়ে শিরকের অন্ধকার দূর হয়নি এমন দেশের সন্ধান আমাকে দিন, আপনার দ্বীনের জন্যে আমার এই কোষমুক্ত অসি আর কোষাবদ্ধ হবেনা। আল্লাহ্, যে দেশে আপনার বিধানের অভাবে আর্তমানবতা ধুকে ধুকে মরছে, শোষকের নির্মম অত্যাচারে মানুষেরা মুক্তির পথ খুঁজে ফিরছে, এমন দেশের সন্ধান আমাকে দিন।"

মহাসত্যের বাণী বাহক ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্বনেতা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর আদর্শের পতাকাবাহী উকবার দূর্বার গতির সামনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এমন কোন শক্তির অস্তিত্ব নেই। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরীদের সাথে নিয়ে রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী সৈনিক প্রান্তরের পর প্রান্তর পেরিয়ে এসে উপস্থিত হলেন আটলান্টিক মহাসাগরের পাড়ে। সত্যই এবার উকবার গতি রুদ্ধ হলো। প্রকৃতির বাধা তাঁর অদম্য গতিবেগ রুখে দিল। সত্যের অকুতোভয় জানবাজ যাত্রীর সামনে প্রচন্ড বাধা অতল বারিধি আটলান্টিক মহাসাগর। পদব্রজে সে বাধা দূর্বিনীত, অলংঘনীয়।

আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে অশ্বের বলগা টেনে তিনি তাকিয়ে আছেন সাগরের বিক্ষুব্দ উর্মীমালার দিকে। দৃষ্টিতে তাঁর সত্য প্রচারের অদম্য তৃষ্ণা। বাতিল শক্তির প্রতি বিদ্রোহী উকবা। মরু সাইমুম সম বিদ্রোহী উকবার দূর্বার গতি। মিথ্যার প্রতি প্রলয় হুংকারে গর্জনশীল উকবার কণ্ঠ। উকবার সামনে সমুদ্রের অসীম বারি রাশি প্রচন্ড হুংকারে সম্মুখ পানে ধাবমান। অশ্রান্ত বিরামহীন গতিতে প্রবাহিত হচ্ছে আটলান্টিক। তার উত্তাল উর্মিমালা ডুবন্ত পর্বতে বাধা প্রাপ্ত হয়ে ঘূর্ণির সৃষ্টি করছে। উকবা অশ্বের বলগা ছেড়ে দিয়ে উল্কার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন উত্তাল সাগরের বুকে। আটলান্টিক তার তরঙ্গের বিক্ষুব্দ বাহু প্রসারিত করে শীতল আলিংগন করলো সত্যের সৈনিক উকবাকে।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে আলিশানে উকবা দু'হাত তুলে কৈফিয়ত জানালেনঃ হে আল্লাহ, আজ যদি সমুদ্রের অগাধ জলধী আমার গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি না করতো তাহলে আরো দেশ, আরো সাম্রাজ্য জয় করে

আপনার তাওহীদের আওয়াজকে বুলন্দ করতাম, বাতিল শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে আপনার দ্বীনের বিজয় কেতন উড়িয়ে দিতাম।

একদিন যারা ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে বিশ্বের বাতিল পরাশক্তিকে পরাজিত করে আর্তমানবতাকে নির্যাতনের নাগপাশ থেকে মুক্তি দেয়ার লক্ষ্যে দেশ-দেশান্তরে ঘোড়া ছুটিয়ে চলতো, যাদের দৃপ্ত পদভারে জালিমের তখতে তাউস ভেঙ্গে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যেত, আর আজ তাঁরাই বিশ্বের বুকে সবচাইতে নির্যাতিত জাতি। এই চরম নিষ্পেষণ থেকে মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করতে ছুটে আসছে না কোন উকবা, সালাহউদ্দিন, মুহাম্মদ বিন কাসিম। আজ মুসলিম উম্মাহ্ তাদের উপরে অর্পিত দায়িত্ব যদি সূচারু রূপে সম্পাদন করতো তাহলে বর্তমান এই করুণ অবস্থার মধ্যে তাঁরা নিপতিত হতোনা। সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার বজ্র শপথ নিয়ে বিশ্ব সভ্যতায় যে মুসলিম জনগোষ্ঠী যাত্রা শুরু করেছিল, আজ তাঁরা তাদের দায়িত্ব কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে বাতিল শক্তির পদলেহনে ব্যস্ত। ফলে ঘৃণা ও লাঞ্ছনার পরাধীন জীবন তাঁরা গ্রহন করতে বাধ্য হচ্ছে। হত্যা, নির্যাতন, নিষ্পেষন, শোষণ আর ধর্ষণ এ জাতির জন্য নিত্য নৈমিত্তিক পুরস্কারে পরিণত হয়েছে।

ভরসা মোদের এক আল্লাহ– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

দ্বীন প্রতিষ্ঠার দীপ্ত প্রত্যয়ে জেনারেল তারিক ইবনে জিয়াদ মাত্র সাত শত সৈন্যসহ ভূমধ্য সাগরের উত্তাল উর্মিমালা পেরিয়ে স্পেনের মাটিতে পা রাখলেন। তিনি এক পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করে তাওহীদের চাঁদ তারা খচিত পতাকা উড়িয়ে দিলেন। যে পাহাড়ের চূড়ায় তিনি ইসলামের বিজয় কেতন উড়িয়ে ছিলেন মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সেই পাহাড়ের নাম দিয়েছিল "জবলে তারেক" বা তারেকের পাহাড়। আর অমুসলিম ঐতিহাসিকরা ঐ একই পাহাড়কে "জেব্রালটার" নামে অভিহিত করেছে ইতিহাসে। জেনারেল তারিক যে জাহাজে করে স্পেনে এসেছিলেন সে জাহাজটিতে আগুন ধরিয়ে তিনি পুড়িয়ে দিলেন।

আল্লাহর পথের নির্ভীক সৈনিক জেনারেল তারিক সমবেত সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললেনঃ "প্রিয় সাথীরা! আমরা সাম্রাজ্যবাদী নই। সাম্রাজ্য বিস্তার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। ধন-সম্পদের আকর্ষণেও আমরা যুদ্ধ করি না। আমরা যুদ্ধ করি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার জন্যে। আমাদের যাবতীয়

তৎপরতা আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যেই পরিচালিত হয়। পৃথিবীর বুক থেকে বাতিল শক্তির শেষচিহ্ন মুছে দিয়ে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সংখ্যাধিক্যের প্রতি নির্ভরশীল নই। আমরা নির্ভর করি একমাত্র আল্লাহর সাহায্যের উপরে। তিনি বদর, ওহুদ, হুনাইন, ইয়ারমুক, কাদেশিয়া, মূতায় যেভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন, আজও সেই আল্লাহই আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

তোমরা সংখ্যাস্বল্পতার কারণে যদি ভয় পেয়ে ফিরে যেতে চাও, তাহলে চেয়ে দেখ সাগরের অগাধ জলরাশি প্রচন্ড গর্জন করছে আর তার দানবীয় উর্মিমালা সশব্দে বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে। ফিরে যাবার কোন পথ নেই। আর আল্লাহর দুশমনদের সাথে যুদ্ধ করে যদি তোমরা শহীদ হয়ে যেতে পারো তাহলে তোমাদের জন্যে আল্লাহর জান্নাতের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে আছে। আর যদি গাজী হতে পারো তাহলে কেয়ামতের বিভীষিকাময় দিনে আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমাদের জন্যে রয়েছে বিরাট মর্যাদা। এখন তোমরা কারা প্রস্তুত আছো বাতিলদের মুকাবিলা করে আমার সাথে আল্লাহর জান্নাতে যাবার জন্যে? যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চাও তাঁরা তাকবির দিয়ে আমার সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ো"।

জেনারেল তারিকের ভাষণ শেষ হতেই সাতশত মুসলিম সৈন্যই "আল্লাহু আকবর" বলে স্পেনরাজ রডারিকের সেনাপতি থিওডমির কর্তৃক পরিচালিত বিশাল সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাওহীদের নিশান বরদার মাত্র সাতশত মুজাহিদ বাহিনীর প্রবল প্রতিরোধের মুখে রডারিকের বিশাল বাহিনী ময়দান ছেড়ে পালিয়ে গেল। ইসলামী বাহিনী ও তার সিপাহসালার জেনারেল তারিকের যুদ্ধ নিপুনতা, শৌর্যবীর্য ও নির্ভীক পদচারণা দেখে স্পেন সেনাপতি থিওডমির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে রাজা রডারিকের কাছে পাঠানো এক পত্রে লিখলেনঃ "আমাদের বিশাল শক্তি প্রয়োগ করেও অবিশ্বাস্য ও অদ্ভুত বীরত্ব ও শৌর্যবীর্যের সংরক্ষণকারী মুসলিম বাহিনীর অপ্রতিরোধ্য গতিপথে আমি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারলাম না।"

মহাকালের ঘূর্ণায়মান চক্রের আবর্তনে স্পেনের রাজদন্ড তাওহীদের পতাকাবাহীদের হাতে চলে এলো। স্পেনরাজ রডারিক চেয়েছিল তাওহীদের আমানত সংরক্ষণকারী মুসলিমদেরকে ভূমধ্যে সাগরে সলিল সমাধি দিতে। কিন্তু কবির ভাষায়ঃ

তাওহীদ কি আমানত ছিনু মেঁ হ্যায় হামারে
মুম্‌কিন নাহি মিটানা না নাম্ ও নিশান হামারা,

তাওহীদের পবিত্র আমানত আমরা বক্ষে সংরক্ষণ করি, পৃথিবীর বুকে এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি আমাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলতে পারে।

বাতিল শক্তির দাম্ভিক প্রতিভূ রডারিক তাওহীদ বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হলো। স্পেনের বুকে স্বগৌরবে পত পত করে উড়তে লাগলো ইসলামের বিজয় কেতন। শিরকপুরের আঁধার ঘরে মুসলিমরা তাওহীদের প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন। স্পেন মুসলিম শাসনের আওতাধীনে এসে গোটা পৃথিবীর অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করলো। কর্ডোভা, গ্রানাডা, মালগাকে কেন্দ্র করে মুসলিম তাহযিব তমুদ্দুনের যে গোড়াপত্তন ঘটলো তা অন্ধকারাচ্ছন্ন গোটা ইউরোপের বুকে আলোর বন্যা সৃষ্টি করলো।

অজ্ঞানতার মহা সমুদ্রে নিমজ্জিত ইউরোপের কালো আকাশে প্রদীপ্ত সূর্যের মতই দিপ্তীমান ছিল কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়। জ্ঞানের কুঞ্জবন কর্ডোভায় ছুটে আসতো ইউরোপের জ্ঞানপিপাসু মধুমক্ষীকারা। মুসলিম শিক্ষা গুরুদের প্রচেষ্টায় ইউরোপবাসীর মূর্খতার ঘুম ভাঙ্গে। পরবর্তীতে ইউরোপে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারক যারা ছিলেন, মূলতঃ তাঁরাও কোন না কোনভাবে কর্ডোভার মুসলিম শিক্ষাগুরুদের কাছে ঋণী। বর্তমানে বিজ্ঞানের হিরণময় কিরণে উদ্ভাসিত পৃথিবীর গর্বিত মানব সভ্যতা বিনির্মাণে মুসলমানদের অবদানই সর্বাধিক। প্রকারান্তরে দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম জ্ঞান তাপসদেরকে বাতিল শক্তি ষড়যন্ত্রের কালো আবরণে আবৃত করে ইতিহাসের যবনিকার কারাগারে আবদ্ধ রেখেছে। মুসলিম জাতিকে তাদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মুসলমানদের স্মৃতি থেকে আল জাবের, আল কিমিয়া, ইবনুল হাইছাম, ইবনে খালদুন, ইবনে সিনা, ইমাম গাজ্জালী প্রভৃতি মুসলিম ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানীদের নাম মুছে দিয়ে অমুসলিম শিক্ষাবিদদের নাম মুসলিমদের স্মৃতির পাতায় লিখে দেওয়া হচ্ছে।

সামান্য কয়েক মুষ্টি মাটি বহনে যিনি অক্ষম

বাদশাহ হাকাম তাঁর দেশ স্পেনের রাজধানীর নিকটবর্তী একটি স্থান দিয়ে যাচ্ছেন। একটি স্থানে তাঁর দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল, স্থানটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত। হাকাম সে স্থানে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। স্থানটির মালিকানা ছিল এক বৃদ্ধার। তিনি সেখানে একটি কুঁড়ে ঘর নির্মাণ

করে বসবাস করছেন। বাদশাহ হাকাম স্থানটি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করার জন্যে প্রস্তাব প্রেরণ করলেন বৃদ্ধার নিকট। বৃদ্ধা স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন কোন কিছুর বিনিময়েও তিনি স্থানটি হাতছাড়া করবেন না।

হাকামের রাষ্ট্রে বাস করে তাঁরই এক বৃদ্ধা প্রজা, তাঁর ইচ্ছা পূরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে? না–তা হতে পারে না। বাদশাহ হাকাম শক্তিবলে স্থানটি দখল করে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত এক বিরাট রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করলেন। প্রাসাদের সামনে নয়নাভিরাম পুষ্প উদ্যান। বিভিন্ন ধরনের ফুলের সৌরভে রাজপ্রাসাদ আমোদিত।

স্থানটির মালিক বৃদ্ধা বাদশাহ হাকামের এই অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করলেন। তিনি সরাসরি হাকামের বিরুদ্ধে বিচারালয়ের বিচারপতির কাছে অভিযোগ করলেন। বিচারপতি বাদশাহ্ হাকামের বিরূদ্ধে আনিত অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করলেন। তিনি বৃদ্ধাকে আশস্ত করে বললেনঃ এই অন্যায়ের প্রতিবিধান করা হবে ইনশাল্লাহ। কিছুদিন পর বাদশাহ হাকাম বিচারপতিকে তাঁর সদ্য নির্মিত প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানালেন। বিচারপতি রাজপ্রাসাদে আসার সময় একটি গাধার পিঠে কয়েকটি বস্তা চাপিয়ে প্রাসাদে আসলেন। সুলতান হাকাম বিচারপতির এই অদ্ভূত কর্মকাণ্ডে বিস্মিত হলেন। বিচারপতি বাদশাহকে অবাক করে দিয়ে বললেনঃ "জাঁহাপনা, আমাকে এই বাগান থেকে কিছু মাটি ঐ বস্তার মধ্যে দিতে বলুন।" বিচারপতির এই অদ্ভূদ আচরণে বাদশাহ কৌতুকবোধ করলেন। তিনি ভেবে পেলেন না, বিচারপতির মাটি দিয়ে প্রয়োজনটা কি? বাদশাহ হাকাম তাঁর অনুরোধ রক্ষা করলেন।

মাটি দিয়ে বস্তা যখন পূর্ণ হয়ে গেল তখন বিচারপতি বাদশাহকে আরো বিস্মিত করে বললেনঃ "বাদশাহ নামদার, আপনি অনুগ্রহ করে বস্তাগুলো গাধার পিঠে তুলতে আমাকে সাহায্য করুন।" বিচারপতির গোটা আচরণই বাদশাহের কাছে কৌতুকপ্রদ মনে হলো। তিনি মোহাবিষ্টের মতই অগ্রসর হলেন মাটি ভর্তি বস্তা গাধার পিঠে তোলার জন্যে। কিন্তু বস্তাগুলো এতই ভারী ছিল যে, অনেক সাধ্য সাধনা করেও বাদশাহ সেগুলো তুলতে পারলেন না।

বিচারপতি এবার অপলক নেত্রে বাদশাহের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললেনঃ আপনি এই সামান্য কয়েক মুষ্টি মাটি বহু চেষ্টা করেও তুলতে পারলেন না, কিন্তু আদালতে আখিরাতে কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর নির্দেশে এই গোটা বাগানটা নিজে কাঁধে উঠিয়ে বৃদ্ধাকে কিভাবে ফিরিয়ে দেবেন?

স্তম্ভিত লজ্জিত বাদশাহ হাকাম অশ্রুসজল নেত্রে নতমস্তকে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠিয়ে বৃদ্ধাকে আনতে পাঠালেন। বৃদ্ধা উপস্থিত হলে তিনি তাঁর হাত ধরে ক্ষমা চাইলেন। শুধু ক্ষমাই চাইলেন না, সৌন্দর্যমন্ডিত বিশাল রাজপ্রাসাদ সহ পুষ্প উদ্যানটি তিনি বৃদ্ধাকে দান করলেন।

শাসনের কর্তৃত্বভার, এটা বিরাট গুরু দায়িত্ব। তার ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে কেয়ামতের ময়দানে ঐ রাজাধিরাজ মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের আদালতে পুংখানুপুংখরূপে হিসেব দিতে হবে। এজন্যে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্রের খলিফা, আল্লাহভীরু মুসলিম বাদশাহের রাতে ঘুম নেই। তাঁরা বিনিদ্র যামিনী অতিবাহিত করেন। সিজদায় পড়ে আল্লাহর কাছে কাঁদেন। দায়িত্বশীলের জীবন ফুলের শয্যা নয়—উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত। কোন শাসনকর্তা, দায়িত্বশীল মানবীয় দুর্বলতার কারণে যদি আত্মবিস্মৃত হয়ে ক্ষণিকের জন্যে নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুভারের কথা ভুলে যান, তখন বাস্তবতার রূঢ় আঘাত দিয়ে, আচার-আচরণ কৌশল ও বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার মাধ্যমে তাদের দিব্যজ্ঞান ফিরিয়ে আনতে হয়।

শিল্পীর ছেনির নির্মম আঘাতে পাষাণের বুকে ফুটে উঠে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমন্ডিত অপরূপ দৃশ্য। কিন্তু এ ক্ষেত্রে যেমন শিল্পীকেও হতে হয় অতি সতর্ক, দক্ষ ও পরিচ্ছন্ন কৌশলী, তেমনি পাথরকেও হতে হয় সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। মানুষতো ভুল ভ্রান্তির উর্ধের কোন অতিন্দ্রীয় সৃষ্টি নয়। সে ভুল করবে। ভুলের মধ্য দিয়েই অর্জিত হবে দক্ষতা কর্ম নৈপুর্ণতা। শুধুমাত্র ব্যক্তির ভুলে ব্যক্তিই দুর্ভোগে পতিত হয়। কিন্তু শাসনকর্তা বা দায়িত্বশীলতো শুধুমাত্র একটি ব্যক্তি নয়—তাঁরা একটি প্রতিষ্ঠান (INSTITUTION)। তাই তাদের ভুলের খেসারত দিতে হয় গোটা জাতিকে। দায়িত্বশীলের অধস্তন সকল পক্ষকেই তাঁর ভুলের মাশূল দিতে হয়। তাই শাসনকর্তা ও দায়িত্বশীলদের যাঁরা সহকর্মী (ASSISTANT) থাকেন, তাদেরকে হতে হয় সতর্ক ও কৌশলী। শাসনকর্তা এবং নেতৃবৃন্দের কর্মের প্রতি তাদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রয়োজনে নির্মমভাবে আঘাত হানতে হয়, অপ্রিয় ও রূঢ় সত্য কথা দিয়ে তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মোচিত করতে হয়।

যে ফুল যুগ যুগান্তরে সৌরভ ছড়ায়

রাতের নিকষ ঘনকালো অন্ধকারে কোথাও যদি আলোক শিখা প্রজ্জলিত হয়ে উঠে তখন নিশাচর প্রাণীরা আতংকগ্রস্ত হয়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে

ছোটে। গভীর নিস্তব্ধ নিঝুম যামিনীতে যাদের নিঃশব্দ পদচারণা, আলো তাদের আজন্ম শত্রু। আলো দেখলে এরা ভয়ে আৎকে উঠে। আলোর ভয়ে শিরায় শিরায় এদের ভীতি সঞ্চার হয়। মিথ্যা শক্তিও এভাবে সত্যের নাম শোনামাত্র আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সত্যের আগমনী ঘন্টা তাদের হৃদকম্পন সৃষ্টি করে। সত্যের বুলন্দ আওয়াজের মধ্যে তাঁরা তাদের ঘৃণ্য জীবনের মৃত্যুর বিভীষিকা দেখতে পায়।

মিথ্যার পূজারীরা হিংস্র আক্রোশে সত্যের প্রতি মৃত্যুবাণ নিক্ষেপ করে। সত্যের বাহকদেরকে তাঁরা নানাভাবে উৎপীড়িত করতে থাকে। পক্ষান্তরে ইতিহাসের গতিধারায় মিথ্যা বার বার আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

বাতিল শক্তির অন্ধ পূজারীরা সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় দীপ্তকণ্ঠ ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) কে যখন কোন ক্রমেই নিবৃত করতে পারলো না, তখন তাঁরা এই মহামানবকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করলো। কারাগারের অন্ধকার জগতে আবদ্ধ করে সত্যের বিপ্লবী আওয়াজকে স্তব্ধ করে দিতে চাইলো বাতিল শক্তি। ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বাতিলদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে কারাগারের নির্জন কক্ষে বসেও সত্যের নির্ভীক বাণীগুলোকে তিনি মসির তুলিতে আলপনা আঁকলেন কাগজের বুকে। বাতিলের বিরুদ্ধে তাঁর কলম উল্কার বেগে ছুটে চললো। তাঁর ক্ষুরধার লেখনীতে বাতিল শক্তি প্রমাদ গুণলো। ইমামের কারা জীবনের সঙ্গী কাগজ কলমও তাঁর কাছে থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হলো।

রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) বিন্দু মাত্র হতাশ হলেন না। তাঁর চোখের শেষ পলক না পড়া পর্যন্ত এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি তাকে সত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখবে? আসলে সত্য অনুসরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার আপ্রাণ চেষ্টা করাই মুসলিম উম্মাহর দায়িত্ব ও কর্তব্য। এ দায়িত্ব আল্লাহ রব্বুল আলামীন মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপরে ন্যস্ত করেছেন। এ দায়িত্ব কে কতটুকু কিভাবে আঞ্জাম দিয়েছে তার পুংখানুপুংখ হিসাব আদালতে আখিরাতে দিতে হবে। হিসেবে গড়মিল হলে শেষ পরিণতি হবে জাহান্নাম।

সত্য অনুসরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব অনুভূতি ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ)কে কারাগারের দুঃসহ দিনগুলোতেও ইস্পাত কঠিন দৃঢ়তা এনে দেয়।

বাতিল শক্তি তাঁর বিপ্লবী কণ্ঠকে স্তব্ধ করার লক্ষ্যে যখন তাকে কারাবদ্ধ করলো তখন তিনি কলমের সাহায্যে সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। বাতিল যখন তাঁর কাছে থেকে কাগজ কলম ছিনিয়ে নিল তখন তিনি কয়লার সাহায্যে কারাগারের দেয়ালে দেয়ালে সত্যের আলপনা এঁকে দিলেন। মহা সত্যের বাণীগুলো কয়লার কালো দাগে কারাপ্রাচীরের শোভাবর্ধন করলো। সত্য অনুসরণ, প্রচার ও প্রতিষ্ঠার যে দায়িত্ব অনুভূতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন এই ক্ষণজন্মা মহামানব তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনুপ্রেরণা যোগাবে সত্যের কাফেলার কর্মীদেরকে।

ইমাম ইবনে তাইমিয়ার কাছে থেকে কাগজ কলম ছিনিয়ে নিয়েও বাতিল শক্তি তাঁর গতিস্তব্ধ করতে পারেনি। তিনি কয়লা দিয়ে কারা প্রাচীরের গায়ে বাতিলের বিরুদ্ধে লিখতে থাকেন। কয়লা যখন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি মহাসত্যের বিপ্লবী বাণী মহাগ্রন্থ আল কুরআন উচ্চ কণ্ঠে তিলাওয়াত করে বাতিলকে জানিয়ে দেন "দুঃসহ নির্যাতন করে মুমিনদের কণ্ঠস্তব্ধ করা যায় না।" কারাগারের নির্জন দিনগুলো তিনি কুরআন তিলাওয়াত করে অতিবাহিত করতে থাকেন। এভাবেই শহীদি মিছিলের বিপ্লবী সৈনিক ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রাহঃ) কারাগারে শাহাদাত বরণ করেন।

তাইমিয়া নামক শহীদি ফুল ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে শাহাদাতের সৌরভে যুগ যুগ ধরে মাতোয়ারা করে তুলছে। পৃথিবীর ইতিহাসে বাতিল শক্তি নির্যাতন চালিয়ে সত্যকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে পেরেছে এমন দৃষ্টান্ত একটিও নেই। বরং বাতিলই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এমন নজির শত সহস্র। এই বিংশ শতাব্দীতেও সত্যের পতাকাবাহীরা এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাতিল শক্তি সত্যের জাগরণে আতংকগ্রস্ত হয়ে ইমাম সাইয়েদ কুতুব (রাহঃ) ইমাম মওদুদী (রাহঃ), ইমাম খোমেনী (রাহঃ), ইমাম আব্দুর রহিম (রাহঃ) ও বর্তমানে ইসলামী আন্দোলনের গোটা বিশ্বের শ্রেষ্ট সন্তান ইমাম অধ্যাপক গোলাম আযমকে কারারুদ্ধ করেও তাদের কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। তাঁরা কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠেও সত্যের শিখা প্রজ্জলিত করেন। মৌখিকভাবে, আচরণ দিয়ে, বই পত্র দিয়ে কারাগারের অধিবাসীদেরকে সত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকেন। লেখনীর সাহায্যে তাঁরা কারাগারে আবদ্ধ থেকেও সত্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার "দা'য়ী-ইলাল্লাহর" দায়িত্ব পালন করেন।

সত্যের পতাকাবাহীদেরকে ধরে বাতিল শক্তি যদি পা কেটে দেয়, তাহলে তাঁরা হাতের উপরে নির্ভর করে মঞ্জিলে মকছুদের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে।

বাতিল যদি তাদের হাত কেটে দেয়, তাহলে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের হাত-পা কাটা দেহটাকে গড়িয়ে মঞ্জিলে মকছুদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাতিল শক্তি যদি তাদের চোখ উপড়ে ফেলে, তাহলে তাঁরা চক্ষুর কোঠর দিয়ে গন্তব্য স্থলের দিকে তাকিয়ে থাকে। বাতিল যদি তাদের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাহলে রক্ত পিচ্ছিল পথের শহীদি যাত্রীরা মঞ্জিলে মকছুদে পৌছার দুর্বার আকাংখা নিয়ে আরশে আযীমের মহান অধিপতি আল্লাহ রব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে পৌছে যায়। নির্যাতনের লোমহর্ষক তান্ডবের ঘৃণ্য ইতিহাস সৃষ্টি করেও বাতিল বিজয়ী হয়নি, হচ্ছে না- হবেও না। 'যায়াল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, ইন্নাল বাতিলা কানা যাহুকা।'

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন যেথা অমর অক্ষয়

আবহমানকাল থেকেই বাতিল শক্তি ইসলাম ও মুসলমানদের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে। ওদের কাছে ন্যায় নীতি, সভ্যতা, ভদ্রতার সংজ্ঞা ভিন্ন। ইসলামের দুশমনেরা মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ও আত্মরক্ষার পদক্ষেপকে সন্ত্রাসবাদ নামে চিরকালই আখ্যায়িত করে আসছে। মুসলিম সমর নায়ক, স্বাধীনতার নায়কদেরকে তাঁরা চিহ্নিত করেছে সন্ত্রাসী হিসেবে। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের যাযাবর সিপাহসালার উরুজ বার্বারোসাকে ইউরোপের খৃষ্ট শক্তি আখ্যায়িত করেছে "ভূমধ্য সাগরের বোম্বেটে দস্যু" হিসেবে। ঐতিহাসিক (MORGAN) মরগান যাকে তদান্তিনকালের "শ্রেষ্ঠ সিপাহসালার" নামে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক লেনপূল (LENPOL) তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছেনঃ "আত্মীয় স্বজন ও স্বজাতির পৈচাশিক হত্যা লীলার প্রতিশোধ গ্রহণের লক্ষ্যে খৃষ্টশক্তির বিরুদ্ধে তিনি এক পবিত্র যুদ্ধে (HOLY WAR) নিয়োজিত।"

স্পেনের মুসলমানদের শেষ আশ্রয়স্থল গ্রানাডার পতন ঘটলো ১৪৯২ সনে। খৃষ্টান সম্রাট পঞ্চম চার্লস ও তাঁর পুত্র ফিলিপের লোমহর্ষক নির্যাতনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান শাহাদত বরণ করেছেন। অগনিত মুসলমানকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হয়েছে। যারা এখনো স্পেনের পৈতৃক ভিটা আঁকড়ে পড়ে আছে তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে খৃষ্টান বানানো হয়েছে। স্পেনের মুর (MOOR) মুসলমানেরা বেঁচে থাকার প্রাণান্তকর সংগ্রামে রত। ১৫১৭ সাল। তাওহীদের বিপ্লবী সিপাহসালার উরুজ বার্বারোসা মাত্র ১৫০০ শত তুর্কী ও মুর সৈন্য নিয়ে গোটা

খৃষ্টান জগতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। খৃষ্টান অপশক্তি যে কোন মূল্যের বিনিময়ে উরুজ বার্বারোসার কাটা মস্তক দেখতে চায়। মুসলিমদের ব্যথার সাথী উরুজ বার্বারোসা ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চল তিলিসমানে অবস্থান করছেন। ওরানের খৃষ্টান শাসক ডি কোমারেস (D-COMRESH) অগণিত খৃষ্টান বাহিনীসহ এগিয়ে আসছে উরুজ বার্বারোসাকে নিশ্চিহ্ন করতে।

সিপাহসালার উরুজ তাঁর মাত্র ১৫০০ শত বাহিনী নিয়ে আলজেরিয়ার দিকে রাতের অন্ধকারে যাত্রা করলেন। খৃষ্টান বাহিনী তাঁর পিছু ধাওয়া করলো। ১৫০০ শত মুসলমানদের সামনে বিরাট নদী। উরুজ চিন্তা করলেন এই নদী পার হতে পারলে এই সামান্য কিছু মুসলমান খৃষ্টানদের হিংস্রতা থেকে রেহায় পাবে। তিনি তাঁর অর্ধেক সৈন্যসহ নদী পার হয়েছেন। ইতিমধ্যে রক্তলোলুপ খৃষ্টান বাহিনী নদীর ওপারে সামান্য সংখ্যক মুসলমানদের উপরে বন্য হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়লো।

উরুজ নদীর এপারে দাঁড়িয়ে দেখলেন তাঁর সামান্য সংখ্যক মুসলিম বাহিনী হাজার হাজার খৃষ্টান বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছে। তিনি ইচ্ছে করলে এপারের মুসলমানদের নিয়ে নিরাপদে আলজেরিয়া চলে যেতে পারতেন। সেখানে তিনি শংকামুক্ত বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু বিপন্ন মুসলিম জাতির দুঃখ কষ্ট যার অন্তরে বেদনার আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে তিনি তো আর নিজ চোখে মুসলমানদের করুণ অবস্থা দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেন না?

রক্তপিচ্ছিল পথের নির্ভীক যাত্রী উরুজ বার্বারোসা এপারের ছয়শত মুসলিম সৈন্যদের বললেনঃ "আমার একটি মুসলিম ভাইকেও আমি খৃষ্টানদের অস্ত্রের খোরাকে পরিণত হতে দিতে পারিনা।" এই কথা বলেই তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন নদীতে। এপারের ছয়শত মুসলিম সৈন্য সিপাহসালার উরুজের অনুগামী হলেন। ওপারে পৌঁছিয়েই তিনি তাঁর ক্ষুদ্র বাহিনী সংগঠিত করে এক অসম যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সাগরের উত্তাল তরঙ্গ মালার মত খৃষ্টানদের সৈন্যবাহিনী মাত্র ১৫০০ শত মুসলিম যোদ্ধাদের উপরে আছড়ে পড়লো।

তাওহীদের বিপ্লবী সৈনিক উরুজ বার্বারোসার প্রতিটি সৈন্য শেষ মূহুর্ত পর্যন্ত খৃষ্টান অপশক্তিকে নিধন করতে করতে শাহাদাতের সূধা পান করলেন। ইতিহাস কথা বলেঃ সে দিনের রণপ্রান্তর থেকে একটি মুসলিম সৈন্যও পালিয়ে আসেনি। তাঁরা সিংহ বিক্রমে জীবনের শেষ শক্তি দিয়ে বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শাহাদাত বরণ করেছেন। উরুজ তাঁর ১৫০০ শত সৈন্য নিয়ে বাতিল শক্তির অগণিত সৈন্যবাহিনীর মুকাবিলা করে একথা আবারও প্রমাণ করেছেন

যে, মুসলমানরা শহীদ হতে জানে কিন্তু অন্যায়ের কাছে মাথানত করতে জানে না। রণপ্রান্তরে একটি বাহিনীর শেষ সদস্য পর্যন্ত শাহাদাত বরণ করা, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আজ পর্যন্তও কোন জাতি স্থাপন করতে পারেনি যা মুসলমানেরা করেছে। আজ পৃথিবীব্যাপী মুসলিম উম্মাহ্ বাতিল শক্তির হাতে যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছে, এখন প্রয়োজন উরূজ বার্বারোসার মত একজন আপোষহীন নেতার, যিনি বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, ফিলিস্তিন, বার্মা, শ্রীলংকা, ভারত, আলজেরিয়াসহ গোটা পৃথিবীর বিপন্ন মুসলিম জনগোষ্ঠির করুণ আর্তনাদে সাড়া দিয়ে ছুটে যাবেন তাদের পাশে। সংখ্যা স্বল্পতার পরোয়া না করে যিনি শাহাদাতের দুর্বার নেশায় বাতিলের মুকাবিলা করবেন। মুসলিম ভাই বোনদের করুণ আর্তচিৎকার যার চোখে অশ্রুর সাগর সৃষ্টি করবে। আজকের পৃথিবীতে এমন একজন ওমর, খালেদ, তারিক, মূসা, উকবা, উরূজ বার্বারোসা, মুহাম্মদ বিন কাসিম, আল মনসুর, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও শাহজালালের মত সিপাহসালারের প্রয়োজন।

প্রেমভরা আঁখি—নেতৃত্বের কঠোরতা

সাম্রাজ্যবাদী রোমানাস তখন কনষ্টান্টিনোপলের সম্রাট। স্বাধীন মুসলিম দেশ আরমেনিয়ার অস্তিত্ব সে স্বীকার করতে রাজী নয়। গোটা ইউরোপের খৃষ্ট শক্তির সহযোগীতা নিয়ে সে ১০৬৩ সনে আরমেনিয়ার দিকে আগ্রাসন পরিচালনা করলো। তাঁর সাথে স্বসৈন্যে যোগ দিল ফ্রান্স, ম্যাসিডনিয়া, বুলগেরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশ। আটলান্টিকের উর্মিমালার মত বিশাল বিক্ষুদ্ধ খৃষ্টবাহিনী ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছে আরমেনিয়ার দিকে। তাওহীদের পতাকাবাহী আরমেনিয়ার সুলতান আরসালান মাত্র ৪০ হাজার মুসলিম সৈন্য নিয়ে উল্কার বেগে ছুটে গেলেন দেশের সীমান্তের দিকে। তিনি জীবিত থাকতে আরমেনিয়ার মুসলিমরা খৃষ্টানদের পদানত হবে? অসম্ভব! তাঁর লাশের উপর দিয়ে ইসলামের দুশমনেরা আরমেনিয়ার সীমান্ত অতিক্রম করবে– তার পূর্বে নয়।

যুদ্ধ সাজে সজ্জিত ৪০ হাজার মুসলিম বাহিনীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সুলতান আলপ আরসালানের প্রাণ আর্তনাদ করে উঠলো। তাঁর মুসলিম ভাইদের রক্তে আজ রণপ্রান্তর রঞ্জিত হবে? মুসলিম ভায়েরা তাঁরই নির্দেশে যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে আর শত্রুর অস্ত্রের নির্মম আঘাতে তাদের দেহ ক্ষত বিক্ষত

হবে? তাঁরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে? এ সমস্ত প্রশ্নের উদ্রেকে মহাবীর সিপাহসালার আরসালানের প্রেমভরা আঁখি অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি সৈন্যবাহিনীকে লক্ষ্য করে ঘোষণা করলেনঃ "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যেতে চাও—যেতে পারো। আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধ্য করবো না। আরমেনিয়ার নেতৃত্ব আমার হাতে। আরমেনিয়ার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হেফাজতের জন্যে প্রয়োজনে আমি শাহাদাত বরণ করবো। তবুও তোমাদের দেহের রক্ত ঝরবে তা আমার পছন্দ নয়।"

যে সিপাহসালার তাঁর সৈন্য বাহিনীকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসেন, যিনি দেহের প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে তাঁর সেনাবাহিনীর প্রতিটি সদস্যের দুঃখ ব্যথা বেদনা অনুভব করেন, তাকে যুদ্ধের ময়দানে শত্রু বাহিনীর সামনে একা ছেড়ে দিতে পারেন না সেনাবাহিনীর জওয়ানরা। সুলতান আরসালানের ৪০ হাজার বাহিনীই তাঁর অনুগামী হলেন। তিনি অযথা রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে খৃষ্টশক্তির অধিপতি সম্রাট রোমানাসের কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। বিশাল সৈন্যবাহিনী ও সমরাস্ত্রের গর্বে মদমত্ত রোমানাস ঘৃণাভরে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলো।

কলিজা কাঁপানো রণদামামা গর্জন করে উঠলো। সুলতান অজু—গোসল করে শ্বেত শুভ্র পোশাকে তাঁর দেহ আবৃত করে সৈন্য পরিচালনার জন্যে ঘোড়ায় আরোহন করলেন। সেনাপ্রধানদের ডেকে তিনি বললেনঃ "রণপ্রান্তরের যে স্থানেই আমি শাহাদাত বরণ করি না কেন— সে স্থানেই আমাকে কবরে শায়িত করবে। তাওহীদের বিপ্লবী সৈনিক আলপ আরসালান শাহাদাতের দুর্বার আকাংখায় একটি বিশাল বাহিনীর বিরুদ্ধে মাত্র ৪০ হাজার সৈন্য নিয়ে রণপ্রান্তরে আবির্ভূত হলেন। তাঁর সেনাবাহিনীর প্রতিটি জওয়ানদের হৃদয়েও শাহাদাতের তীব্র কামনা।

আরমেনিয়ার রণপ্রান্তর। যুদ্ধ অবিরাম চলছে। বর্শা আর তীরের শোঁ শোঁ আওয়াজে, যোদ্ধাদের গুরু গম্ভীর হুংকার, অশ্বের হ্রেষা ধ্বনি, আহতদের আর্তনাদ সব মিলে ভয়াবহ এক পরিবেশ। ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনী নির্ভীক চিত্তে মুকাবিলা করে যাচ্ছে বাতিল শক্তির বিশাল বিপুল খৃষ্টবাহিনীকে। সামনের অগ্রবর্তী বাহিনী শহীদ হয়ে রণপ্রান্তরে লুটিয়ে পড়ার সাথে সাথে পেছনের সৈন্যবাহিনী শাহাদাতের দুর্বার আকাংখায় সামনের শূন্যস্থান পূরণ করছেন। রক্তের প্লাবনে রণপ্রান্তরে লহর সরোবর সৃষ্টি হয়েছে। শত্রু নিধন করে শাহাদাতের সঞ্জিবনী শূধা পানের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে মুসলিম বাহিনী।

মুসলিম বাহিনীর জীবনে যেন দুঃখের কোন স্পর্শ নেই। ব্যথা বেদনার কাতরোক্তি করতেও তাঁরা ভুলে গেছে। অশ্বের অবিশ্রান্ত গতি প্রবাহের সাথে তাদের জীবন-মৃত্যু, ভাঙ্গা-গড়া, সৃষ্টি-ধ্বংসের গতিবেগ যেন একাকার হয়ে গেছে। মুসলিম জীবনের সবকিছুই যেন একই মোহনায় এসে মিলিত হয়েছে। কোনদিকে কারো লক্ষ্য নেই। যুদ্ধের ময়দানে শত্রু নিধন অথবা শাহাদাত। দুটোর যে কোন একটা।

দিবাবসানে- গোধূলী লগ্নে, দিকচক্রবালের রক্তিম রেখায় যেন ফুটে উঠলো মুসলিম বাহিনীর বিজয় চিহ্ন। মাগরিবের আযানের সুরে সুরেই যেন আকাশ বাতাস মুখরিত করে ঘোষিত হলো ইসলামের বিজয় বার্তা বদর, ওহুদ, খন্দক, ইয়ারমুক, কাদেশিয়া, হুনাইন ও আজনাদাইনের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটলো আরমেনিয়ার রণপ্রান্তরে। সুলতান আল্প আরসালান বিজয়ী হলেন। বিশাল বাতিল শক্তি পরাজিত হলো। বন্দী হলো কনষ্টান্টিনোপল খৃষ্ট সম্রাট রোমানাস। সুলতান আরসালান রোমানাসকে প্রশ্ন করলেনঃ "আমার স্থানে যদি আপনি অবস্থান করতেন তাহলে আমার জন্যে আপনি কোন ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা করতেন?"

দাম্ভিক রোমানাস বললোঃ "চাবুকের আঘাতে আপনার দেহ রক্তাক্ত করে দিতাম।" অসহায়ের দাম্ভিকতা দেখে মুসলিম বীর আরসালানের ওষ্ঠাধারে হাসির রেখা দেখা দিল। তিনি মমতা জড়িত কণ্ঠে বললেনঃ "আপনার বাইবেলের শিক্ষা "শত্রুকে ক্ষমা কর," আমি আপনাকে মুক্তি দিলাম। "যান আপনি মুক্ত স্বাধীন।" এভাবেই মুসলিম বীরেরা ইতিহাসের পাতায় সোনার হরফে তাদের নাম লিখে গিয়েছেন। দুর্বলের বৃথা আস্ফালনে তাঁরা হিংস্র হয়ে উঠেননি। শত্রুকে দেখেছেন অসীম ক্ষমায়। ব্যবহার দিয়ে, আচরণ দিয়ে, মানবতা প্রদর্শন করে প্রাণের শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন ইসলামী আন্দোলনের বীর মুজাহিদরা।

হিংস্র ক্রুসেডার ও মুসলমানদের মানবতা

ইসলাম বিদ্বেষী খৃষ্টশক্তি বর্তমান পৃথিবীতে তাঁরা নিজেদেরকে সবচেয়ে সভ্য বলে দাবী করে থাকে। গোটা বিশ্বব্যাপী তাঁরা মানবাধিকারের শ্লোগানে উচ্চকন্ঠ। পক্ষান্তরে অতীত ইতিহাস এবং তাদের বর্তমান কর্মকান্ড এ কথা

স্পষ্টভাবেই প্রমাণ করে যে, তাঁরা ও তাদের দোসর জড়বাদী হিন্দু ও অভিশপ্ত ইহুদীরাই পৃথিবীতে মানবাধিকার বেশী লংঘন করেছে এবং করছে। ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানদের সাথে হিন্দুদের ঘৃণ্য আচরণ, মধ্যপ্রাচ্যে ইহুদীদের নির্মম অত্যাচার ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নির্লজ্জ নীতি, হার্জেগোভিনা-বোসনিয়ায় খৃষ্টশক্তি কর্তৃক পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন, এ সমস্ত ঘটনাই প্রমাণ করে যে, অমুসলিমরাই সাম্প্রদায়িক কাপালিকের ভূমিকায় শাণিত কৃপাণ হস্তে বিশ্বব্যাপী মুসলিম নিধনযজ্ঞে অবতীর্ণ হয়েছে।

১০৯৯ সনে খৃষ্টানরা জেরুজালেম দখল করে সত্তর হাজার মুসলিম নারী-পুরুষ-শিশুদের মধ্যে একটি প্রাণীকেও জীবিত রাখেনি। মাত্র কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে গোটা জেরুজালেম নগরী খৃষ্টানদের পৈচাশিকতায় মুসলিম শূন্য হয়ে যায়। পক্ষান্তরে পুনরায় ১১৮৭ সনে মাত্র ৮৮ বছর পরে মুসলমানেরা যখন জেরুজালেম পুনরুদ্ধার করে তখন একটি অমুসলিমেরও কোন ক্ষতি মুসলমানেরা করেনি। উপরন্তু সাহায্য সহযোগীতা দিয়ে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করেছে মুসলমানেরা।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতক অমুসলিম খৃষ্টশক্তি মুসলমানদের মানবতাকে দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করে বার বার মুসলিম জনতার রক্ত নিয়ে হোলি খেলেছে এবং খেলছে। তথাকথিত ক্রুসেডের ৯০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইউরোপ থেকে তৃতীয় ক্রুসেডারদের নব্য বাহিনী আগমন করে ফিলিস্তিনে ক্রুসেডারদের শক্তি বৃদ্ধি করলো। সিংহবীর সিপাহসালার সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ) ও খন্ড বিখন্ড মুসলিম শক্তিকে শিশাঢালা প্রাচীরের মত এক করে তুলছেন।

১১৮২-৮৩ সন। মিসর সহ সমগ্র এশিয়া-মাইনর ও তুর্কী অঞ্চল প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে সুলতান সালাহউদ্দিনের পতাকাতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। পক্ষান্তরে সমগ্র ফিলিস্তিন তখনো খৃষ্টশক্তির করতলগত। খৃষ্টানদের কারাগারে হাজার হাজার মুসলিম বন্দী অকথ্য নির্যাতন ভোগ করছে। বিগত ৮৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। বাইতুল মুকাদ্দাসের সুউচ্চ মিনার থেকে তাওহীদের বিপ্লবী ধ্বনি মুয়াযযিনের কন্ঠে উচ্চারিত হয়নি। জেরুজালেমের ওমর মসজিদের অভ্যন্তরে খৃষ্টান নরপিচাশরা যে মুসলিম হত্যাকান্ড সংঘটিত করেছিল, তার রক্তের লোহিত আলপনা এখনো হয়তঃ দৃষ্টি গোচর হবে।

তাওহীদের সিপাহসালার সালাহউদ্দিন অধির হয়ে উঠেছেন। একদিকে তাঁর দেহ মন মানসিকতা অস্থির চঞ্চল, অপর দিকে খৃষ্টানদের পৈচাশিক অত্যাচার আরো স্থির থাকতে দিল না। অকারণে কাপালিক খৃষ্টশক্তির হাতে মুসলিম

বাণিজ্য বহর ও মুসলিম বণিকরা আক্রান্ত হচ্ছে। মুসলিমদের সম্পদ লুণ্ঠিত হচ্ছে ও তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠছে ফিলিস্তিনের পবিত্র ভূমি। ১১৮৬ সনে খৃষ্টান অধিনায়ক এন্টিয়ক নগরী দখল করে ১০৯৯ সনে জেরুজালেম করায়ত্ত করে খৃষ্টানরা গডফ্রের নির্দেশে বন্য পশুর মত যেভাবে মুসলমানদের হত্যা করেছিল, সে নির্মম ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটালো এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টান প্রধান রেজিনাল্ড। ধৈর্য্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল সুলতান সালাহউদ্দিনের। তিনি ৯০ বছরের পুরাতন খৃষ্টান ক্রসেডারদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করতে বাধ্য হলেন।

১১৮৭ সনের মার্চ মাসে তিনি আশতারা নামক স্থানে শিবির স্থাপন করলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্য ফিলিস্তিনের সীমান্ত শহর তাইবেরিয়াস দখল করা। তাইবেরিয়াসের রাজা গেডিলুসিগানের নেতৃত্বে জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে, রিমন্ড, বিলিয়াম প্রমুখ কাপালিক ক্রসেড অধিনায়কদের অধিনে বারোশত খৃষ্টান নাইট সহ প্রায় পঞ্চাশ হাজার সৈন্য সমবেত হলো। তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী সিপাহসালার সালাহউদ্দিন তাঁর মুসলিম সৈন্য বাহিনী সমবিব্যহারে তাইবেরিয়াস অভিমুখে যাত্রা করলেন।

সিভিনের দু'মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে ফিলিস্তিনের লুবিয়া নামক গ্রামের সন্নিকটবর্তী রণপ্রান্তরে তাওহীদের সৈন্যবাহিনী বাতিলশক্তি খৃষ্টবাহিনীর মুখোমুখী দন্ডায়মান হলো। রক্তক্ষয়ী প্রচন্ড যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দাপটের মুখে বিশাল খৃষ্টান বাহিনী তৃণখন্ডের মত ভেসে গেল, তাঁরা শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করলো। খৃষ্টানদের জেরার্ড, রেজিনাল্ড, হামফ্রে প্রমুখ অধিনায়কসহ স্বয়ং রাজা ও তাঁর ভাই সালাহউদ্দিনের হাতে বন্দী হলেন, যুদ্ধে ত্রিশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য মৃত্যুবরণ করলো।

বিজয়ী সালাহউদ্দিন তাইবেরিয়াস নগরীতে প্রবেশ করলেন, ধীর স্থির শান্ত পদক্ষেপে তিনি নগর পরিদর্শন করছেন। চোখে মুখে নেই কোন প্রতিহিংসার চিহ্ন। মাত্র কিছুদিন পূর্বে খৃষ্টানরা জেরুজালেম ও এন্টিয়ক নগরী দখল করে আত্মসমর্পণকারী হাজার হাজার মুসলিম নরনারী ও শিশুকে তাঁরা যেভাবে আগুনে পুড়িয়ে, অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করেছিল সে স্মৃতি হৃদয় পটে ভেসে উঠে সালাহউদ্দিনের দৃষ্টিকে শুধু অশ্রুসজলই করেছিল প্রতিশোধের আগুন জ্বেলে দেয়নি।

মুসলমানরা একটি খৃষ্টানের শরীরে ফুলের আঘাতও করেনি। অগণিত লুন্ঠণ আর হত্যাযজ্ঞের পুরোহিত রেজিনাল্ডকেই শুধু তাঁর পাপের দু'শ সহযোগীসহ প্রাণদন্ডে দন্ডিত করলেন সালাহউদ্দিন। আর এন্টিয়ক নগরীতে খৃষ্টানরা যেখানে

শহীদ মুসলিমদের লাশ কবর থেকে তুলে মাথা কেটে বর্শায় গেঁথে এন্টিয়কের রাস্তায় বন্য জংলী নৃত্য উল্লাস করে বেড়িয়েছিল, সেখানে সুলতান সালাহউদ্দিন তাইবেরিয়াসের পরাজিত বন্দী খৃষ্টান রাজাকে হাতে ধরে নিজের পাশে বসিয়ে প্রাণ শীতলকারী ঠান্ডা শরবত পান করিয়েছিলেন।

এর নাম মানবতা–মানবাধিকার, ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া, হার্জেগোভিনা, বোসনিয়ার দুর্বল মুসলমানদের আত্মরক্ষার অধিকার না দিয়ে তাদের উপরে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে শক্তিশালী ইহুদী, খৃষ্টান ও স্বৈরাচারী সামরিক জান্তার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে হত্যাযজ্ঞে উৎসাহ দেওয়ার নাম মানবাধিকার নয়। এর নাম সাম্প্রদায়িকতা, এর নাম মানবাধিকারের নির্লজ্জ লংঘন। বর্তমান স্বঘোষিত বিশ্বমোড়ল আন্তর্জাতিক দস্যু সন্ত্রাসী খৃষ্ট জগত মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এভাবেই সাধারণ মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করার ঘৃণ্য পাঁয়তারা চালাচ্ছে।

অতীত থেকে শুরু করে বিশ্বের মানবমন্ডলী ইসলামী আন্দোলনের রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের নিকট থেকেই মানবতা পেয়েছে আর অন্য সবার নিকট থেকে পেয়েছে নিষ্ঠুরতা। রণপ্রান্তরে একজন মুসলিম সৈন্যের তরবারীর আঘাতে খৃষ্টান সম্রাট রিচার্ডের ঘোড়া ধরাশায়ী হলো। মুসলিম হত্যাযজ্ঞের অন্যতম নায়ক নরপশু রিচার্ডকে নিজ আয়ত্তে পেয়ে মুসলিম সৈন্যরা তাঁর দিকে শানিত অস্ত্র হাতে ছুটে এলেন।

এই সেই নরঘাতক নিষ্ঠুর রিচার্ড, যে রিচার্ড মাত্র কয়েক দিন পূর্বে "একর" নগরীতে পাঁচ হাজার মুসলিম বৃদ্ধ, যুবক, নারী–শিশুকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর, লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করেছে। যার সম্পর্কে তাঁরই জ্ঞাতি ভাই ঐতিহাসিক "লেনপুল" তাঁর বর্বর হত্যাকান্ড সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন "নিষ্ঠুর কাপুরুষোচিত"। এই খৃষ্টান নরপশু রিচার্ডকে ঐতিহাসিক "গিবন" চিহ্নিত করেছেন "শোণিত পিপাসু" হিসেবে। আর ঐতিহাসিক কক্সবার্টের ভাষায় রিচার্ড হলো, "মানব জাতির নির্মম চাবুক"।

নরপশু রিচার্ডকে নিয়ন্ত্রণে পেয়ে মুসলিম বাহিনী উন্মাদ হয়ে উঠেছে তাকে হত্যা করার জন্যে। রিচার্ড নিজেকে বাঁচাবার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করছে। মুসলিম বাহিনী ক্রমে তাকে বেষ্টন করে ফেলছে। তাঁর জীবন প্রদীপ মুসলমানদের হাতেই নির্বাপিত হয়ে যাতে। এমন সময় মহানুভবতার মূর্ত প্রতীক গাজী সালাহ্উদ্দিনের দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ হলো। দূর থেকে তিনি

রিচার্ডের এ দুর্দশা লক্ষ্য করলেন। রিচার্ডকে আত্মরক্ষায় মরিয়া দেখে তিনি ব্যথিত হলেন।

শোণিত পিপাসু কাপালিক রিচার্ডের শত সহস্র পাশব আচরণ সত্ত্বেও তাঁর বীরত্বের কথা স্মরণ করে মহামতি সালাহউদ্দিন তাঁর প্রতি সদয় না হয়ে পারলেন না। অথচ তিনি তরবারির এক আঘাতেই রিচার্ডকে মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে পাঠিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু বিপদাপন্ন শত্রুর উপর তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চাইলেন না। যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঘোড়ার তীব্র অভাব সত্ত্বেও গাজী সালাহউদ্দিন দুটি তেযস্বী আরবী ঘোড়া রিচার্ডের কাছে পাঠালেন। এর নাম মানবতা। মুসলমানেরা এভাবেই মানবতা প্রদর্শন করেছে যুগে যুগে, আর সেই নির্মল নিষ্কলুষ মানবতাকে নিষ্ঠুর পায়ে বার বার পদদলিত করেছে অমুসলিমরা।

রিচার্ডও তাই করলো। সালাহউদ্দিনের উপহার আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে সেই উপহারকেই মুসলিম হত্যার মাধ্যম বানালো খৃষ্টান রিচার্ড। নরঘাতক রিচার্ড সুলতানের দেওয়া ঘোড়ায় আরোহণ করে নতুন শক্তিতে তরবারী হাতে মুসলিম বাহিনীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

এ যুদ্ধের কিছুদিন পরেই রিচার্ড রোগাক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো। যুদ্ধ ক্লান্ত পরাজিত খৃষ্টান বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য তাকে পরিত্যাগ করে স্বদেশের পথ ধরলো। শয্যাশায়ী রুগ্ন রিচার্ডকে সালাহউদ্দিন ইচ্ছে করলে যে কোন মুহূর্তে পৃথিবী থেকে বিদায় করে দিতে পারতেন। কিন্তু সালাহউদ্দিন তা না করে গোপনে তিনি রিচার্ডের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। তিনি রিচার্ডের জন্য প্রতিদিন সুস্বাদু ফল ও সুশীতল পার্বত্য বরফ প্রেরণ করতে লাগলেন। অবশেষে সালাহউদ্দিনের উদারতার কাছে রিচার্ডের পশুসুলভ মানসিকতা পরাজিত হতে বাধ্য হলো। রিচার্ড নিজেই সন্ধি ও শান্তির প্রস্তাব নিয়ে মুসলিম শিবিরে আগমন করলো।

এ জন্যেই সুলতান গাজী সালাহউদ্দিন ইউরোপের যুদ্ধবাজ সমরনায়কদের কাছে "ত্রাস" হিসেবে চিহ্নিত হলেও ইউরোপের অধিবাসীদের কাছে তিনি SALAH UDDIN THE GREAT নামেই অধিক পরিচিত। তিনি ইসলামের গৌরবময় স্বর্ণ উজ্জ্বল ইতিহাসের এক মহান নায়ক। তিনি তাঁর জীবনের স্বর্ণালী যৌবনের উজ্জ্বল দিনগুলো বাতিল শক্তির মুকাবিলায় সমরাঙ্গণেই অতিবাহিত করেছেন। জেরুজালেম মুসলমানদের হস্তগত হওয়ার ফলে গোটা খৃষ্টান ইউরোপ বন্য হায়েনার মত মুসলিম নিধনে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল।

ENGLAD, FRANCE, GERMAN, DENMARK, ETALY তথা গোটা খৃষ্টান জগত ১১৮৯ সনে ছয় লক্ষ সৈন্য সহ হন্যে কুকুরের মত ছুটে এসেছিল ফিলিস্তিনে। তাঁরা সাথে করে নিয়ে এসেছিল গোটা ইউরোপবাসীর উপার্জনের এক দশমাংশ। দীর্ঘ তিন বছর যাবৎ সালাহউদ্দিন হিংস্র ক্রুসেডারদের সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে খৃষ্টান জগতকে অপমানজনক পরাজয়বরণ করতে বাধ্য করলেন। তাঁর ঈমানী শক্তির সামনে বাতিলশক্তি খৃষ্টান জগতের সম্মিলিত বাহিনী তৃণখন্ডের মত উড়ে যেতে বাধ্য হয়েছে রণাঙ্গণ থেকে।

প্রায় ৫ লক্ষ খৃষ্টান সৈন্যকে ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমিতে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত করে ইউরোপীয় ক্রুসেডার দানবেরা তল্পী তল্পা গুটিয়ে লাঞ্ছিতাবস্থায় মধ্যপ্রাচ্য ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। ফিলিস্তিন সহ গোটা প্রাচ্যের অবিসংবাদিত অধিপতি হয়ে থাকলেন সিপাহসালার সালাহউদ্দিন আইয়ুবী (রাহঃ)। তিনি গোটা খৃষ্ট জগতে যে কি ভয়ানক ভীতির সৃষ্টি করেছিলেন, তার প্রমাণ যুদ্ধ তহবিল গঠন করার জন্যে ইউরোপ জগতে গঠিত হয়েছিল TAX OF SALAH UDDIN.

ঘুমিয়ে গেছে শ্রান্ত হয়ে

১১৯৩ সন। হজ্ব সমাপন করে হাজীরা দেশে ফিরছেন। সালাহউদ্দিন গেলেন হাজীদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপণ করতে। হঠাৎ তাঁর শরীরে ঠান্ডা অনুভূত হলো। তিনি জ্বরে আক্রান্ত হয়ে শয্যা গ্রহণ করলেন। সে শয্যাই পরিণত হলো তাঁর অন্তিম শয্যায়। ১১৯৩ সনের মার্চ মাসের চার তারিখে গোটা মুসলিম জাহানকে বিষাদ সিন্ধুতে নিমজ্জিত করে এ নশ্বর ধরাধাম থেকে তিনি চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। যিনি ছিলেন তাওহীদের অতন্দ্র প্রহরী, বাতিল শক্তির আতংক, মুসলমানদের দরদী বন্ধু, আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, তিনি আর নেই। মুসলমানরা এতিম হয়ে গেল।

সিপাহসালার সালাহউদ্দিনের শূন্যস্থান দুর্ভাগা মুসলমানেরা আজও পূরণ করতে পারেনি। দ্বীনে হকের আন্দোলনে আত্মোৎসর্গিত এই মহামানব যখন তাঁর শেষ বিশ্রাম স্থলের দিকে যাত্রা করেন তখন তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। তিনি বাতিলশক্তি ইউরোপীয় খৃষ্টানদের কাছে "আতংক" হিসেবে বিবেচিত হলেও এই মহান সম্রাটের কোন সিংহাসন ছিল না। ছিল না প্রাচুর্যতায় পরিপূর্ণ বিলাসী অট্টালিকা–রাজপ্রাসাদ। তাঁর রাজ্যের বিশাল অর্থ ভান্ডার ছিল। কিন্তু

তাঁর ব্যক্তিগত কোন অর্থ ছিল না। নিজের জীবন যৌবন অর্থ সম্পদ সবকিছু, তিনি বিলিয়ে দিয়েছিলেন আল্লাহর রাস্তায় –জেহাদে।

তিনি যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে বিপুল শক্তি সামর্থ্য নিয়োগ করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করার মাধ্যমে নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিলাসী জীবন যাপন করতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি চাননি। তিনি চেয়েছিলেন ইসলামের বিজয় দেখতে। এ পথেই তিনি তাঁর শেষ শক্তি পর্যন্ত ব্যয় করেছেন। এ জন্যেই তিনি বাতিলের মুকাবিলা করার জন্যে প্রান্তর থেকে প্রান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন। তাঁর যেদিন ইন্তেকাল হলো সেদিন জানাযার সামান্য খরচ সংকুলানের অর্থও তাঁর তহবিলে পাওয়া যায়নি। অপরের কাছে থেকে অর্থ ধার করে এই তাওহীদের মহান সিপাহসালারের জানাযা আদায় করা হয়েছিল। কঠিন সমরাঙ্গণেও তাঁর হৃদয় ছিল মোমের মতই কোমল। যুদ্ধের ময়দানে একটি খৃষ্টান মহিলা চিৎকার করে কাঁদতে কাঁদতে সুলতান সালাহউদ্দিনের তাঁবুর দিকে ধাবিত হলো। কিন্তু প্রহরীরা তাকে তাঁবুর প্রবেশ পথে থামিয়ে দিল। মহিলাটি প্রহরীদের প্রতি করুণ আবেদন জানালো তাকে যেন সুলতান সালাহউদ্দিনের সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়া হয়। প্রহরী তাকে সুলতানের নিকটে নিয়ে গেলে মহিলাটি কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বললেনঃ

"আপনার সৈন্যবাহিনী আমার শিশু সন্তানকে ধরে নিয়ে এসেছে। আপনি দয়া করে আমার কলিজার টুকরাকে আমার বুকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।" সন্তান হারা মায়ের করুণ আর্তনাদে সালাহউদ্দিনের চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগলো। তিনি সাথে সাথে মুসলিম সৈন্যদের শিবিরগুলো তল্লাসীর নির্দেশ দিয়ে শিশুটিকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করলেন। সন্তান বিরহিনী মায়ের কোলে সন্তানকে ফিরিয়ে দিয়ে তিনি যে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছেন, খৃষ্টান জগত তাঁর সে মহানুভবতাকে নির্মম পায়ে পিষ্ট করে মুসলিম শিশুদেরকে বেয়নেট চার্জ করে, শ্বাসরুদ্ধ করে, আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করছে। গর্ভবতী মুসলিম নারীর পেট চিরে সন্তান বের করে সে সন্তানকেও পাথরের উপরে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে হিংস্র খৃষ্টান জাতি।

সত্যের বিজয় কেতন

ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে দেখা যায় মুসলিম শাসকদের মধ্যে কেউ ছিলেন ন্যায় পরায়ণ প্রজাহিতৈষী আল্লাহভীরু শাসক, আবার কোন শাসক

ছিলেন প্রজা নিপিড়নকারী নিষ্ঠুর নির্মমতার প্রতীক স্বৈরাচারী একনায়ক। কেউবা ইসলামী আদর্শের প্রতি ছিলেন সহানুভূতিশীল, কেউবা ছিলেন কঠোর বিরোধী। কিন্তু সম্রাট আকবরের মত মুশরীকি মনোভাবাপন্ন আহাম্মক শাসক মুসলিম শাসকদের ইতিহাসে দেখা যায়না। বাতিল কুফুরী শক্তির প্রভাবে তিনি এতটা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন যে, তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারা দেখলে তিনি হিন্দু, না বৌদ্ধ, না খৃষ্টান না কোন ধর্মাবলম্বী তা অনুধাবন করা ছিল কষ্টকর।

প্রধানত তিনি হিন্দু জড়বাদী সম্প্রদায়ের মনোতুষ্টির লক্ষ্যে বিভিন্ন ধর্মের কিছু কিছু নীতিমালা একত্রিত করে এক কিম্ভূতাকিমাকার মতাদর্শ তৈরী করেন। এই আজব মতাদর্শের নাম দিলেন তিনি "দ্বীনে ইলাহী।" তাঁর শাসনামলে গোটা দেশ থেকে ইসলামী নীতিমালা উচ্ছেদ করা হয়। ইসলামকে বিদ্রুপ করে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য প্রকাশ করা হয়। সম্রাট আকবর নিজেও অমুসলিম মহিলাদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর প্রাসাদে পূজাপার্বণ জপতপ শুরু করেন। দেশে গরু জবাই বন্ধ করে দেন। তাঁর দরবারে সিজদা করার প্রথা প্রচলন করেন। তাঁর এ সমস্ত কর্মকান্ডের সহযোগিতা ক'রে এক শ্রেণীর দরবারী আলেম সম্প্রদায়। তাঁরা সংকীর্ণ স্বার্থের বিনিময়ে ইসলামের নীতিমালাসমূহ বিকৃত করার ঘৃণ্য প্রচেষ্টার সহযোগীর ভূমিকা পালন ক'রে। এভাবে তাঁরা তাদের আখিরাত বরবাদ করে দেয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার এহেন বিকৃতি দেখে শেখ আহমদ সরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানী (রাহঃ) আহত সিংহের মতই গর্জন করে উঠেন। তিনি আকবরকে এ ধরনের ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে হুশিয়ার করে দেন। গোটা দেশের মানুষকে তিনি আকবরের "দ্বীনি ইলাহী" থেকে সতর্ক থাকার আহবান জানান।

নেমে আসে তাঁর উপর নিষ্ঠুর নির্যাতন। নির্মম রাজদন্ডের কোপানলে পড়েও তিনি তাঁর আন্দোলনে শিথিলতা প্রদর্শন করলেন না। তিনি দূর্বার বেগে তাঁর অভিযান চালিয়ে যেতে লাগলেন। এক শ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী তথাকথিত মাওলানা গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে বৃষ্টির মত ফতোয়া বর্ষণ করতে লাগলেন। ইসলামী আন্দোলনের বিপ্লবী কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুগেই এই ধর্ম ব্যবসায়ী গোষ্ঠী আলেমদের আলখেল্লা পরিহিত এক শ্রেনীর জালেমেরা বাতিল শক্তির অর্থপুষ্ট হয়ে ফতোয়া বিক্রি করেছে– এখনো করছে, আগামীতেও করবে। পক্ষান্তরে জাতির উপর এদের মিথ্যে প্রভাব সাময়িক–চিরস্থায়ী নয়। সত্যপন্থী আলেম ওলামা পীর মাশায়েখদের প্রচন্ড আঘাতে এ সমস্ত ভন্ড আলেমদের মুখোশ যখন খুলে প'ড়ে জাতি তখন এদের কদর্যরূপ সঠিকভাবে উপলব্ধি

করতে পারে। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে মৃত্যু এসে আকবরের জগাখিচুড়ী মার্কা পৌত্তলিক জীবনের অবসান ঘটালো। ক্ষমতার মসনদে আসীন হলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর। তিনিও পিতার প্রবর্তিত ইসলাম বিরোধী নীতি বহাল রাখলেন। সম্রাটের কৃপাদৃষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ইসলামের দুশ্মন এক শ্রেণীর মুনাফিকরা আলফেসানীর বিরুদ্ধে মিথ্যা কল্প কাহিনী তৈরী করে সম্রাট জাহাঙ্গীরকে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললো।

পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে যে কত রকমের, কত প্রকারের পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে হয় তা সত্যপন্থী ছাড়া আর কেউ উপলব্ধি করতে পারেনা। ইসলামী আন্দোলনের পতাকাবাহীগণ কর্ম ক্ষেত্রে, পারিবারিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কত প্রকারের সমস্যার মুকাবিলা করে তাঁরা নিজ আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না।

সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হয়ে শেখ আহমদ সেরহিন্দী মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে তাঁর দরবারে ডেকে পাঠালেন। সত্যের সাহসী সৈনিক আলফেসানী জাহাঙ্গীরের দরবারে বীর পুরুষের ন্যায় আগমন করলেন। প্রচলিত বাতিল নিয়মানুযায়ী তিনি সম্রাটকে সিজদা তো করলেনই না, মাথানিচু করে কুর্নিশও করলেন না। দরবারের তোষামদকারী চাটুকাররা আলফেসানীকে বললোঃ আপনি বাদশাহকে সম্মান করে সিজদা করলেন না যে? সত্যের আপোষহীন সৈনিক আলফেসানী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সামনেই গর্জন করে উঠলেনঃ "তোমাদের মত আখিরাত বিক্রয়কারী চাটুকাররা বাদশাহকে সিজদা করতে পারে, কিন্তু আমি আলফেসানী তা করতে পারিনা। আমি মুসলমান। আমার মাথা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে নত হয়না। আমি বাদশাহকে সিজদা করবো না। ইসলাম আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সিজদা করার অনুমতি দেয়না।"

আলফেসানীর সাহস দেখে গোটা দরবারের লোকেরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইসলামী আন্দোলনের ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে মহাসত্যের ধারক বাহকেরা বাতিল শক্তির সামনে এ ভাবেই হুংকার দিয়ে সত্য প্রকাশ করেছেন। মিথ্যার দাপট দেখে তাদের কণ্ঠ কখনো ম্লান হয়নি। সত্যের সাহায্যকারী মহান আল্লাহর উপরে নির্ভরশীলতাই সত্য পন্থীদেরকে মিথ্যার সামনে আপোষহীন অনমনীয় বেপরোওয়া করে তোলে। সম্রাট জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধকণ্ঠে আলফেসানীকে বন্দী করার আদেশ দিলেন। তাকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দীকরে রাখা হয়। এ

মুজাহিদকে বন্দী করেও বাতিল শক্তি ক্ষান্ত হয়নি। তাঁর বাসগৃহে হামলা চালিয়ে লুট পাঠ করা হয়।

তাঁর কারাজীবনের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কিছু সংখ্যক আলেমগণ তাঁর কাছে ইসলামী আইনের গ্রন্থসমূহ প্রেরণ করে তাকে বুঝানোর চেষ্টা করেন যে, "জীবন রক্ষার জন্যে সিজদা করা জায়েজ আছে" তিনি দৃঢ় কণ্ঠে এর জবাব দেনঃ "যিনি অপারগ বা যার ওজর আছে সেটা তাঁর জন্যে প্রযোজ্য হলে হতেও পারে আমার জন্যে নয়। আমার কোন ওজর নেই। আমি মনে করি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ছাড়া অন্য কাউকে সিজদা না করাই ইসলামের বিধান।" শহীদি কাফেলা ইসলামী আন্দোলনের অমিত তেজী বীর আলফেসানী চরম নির্যাতনের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সামনেও মিথ্যার কাছে তাঁর চীর উন্নত শির নত করেননি।

দীর্ঘ দিন পরে সম্রাট জাহাঙ্গীর নিজের ভুল ত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরে লজ্জিত হয়ে মুজাদ্দিদে আলফেসানীকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু সত্য প্রতিষ্ঠায় প্রাণ উৎসর্গকারী আলফেসানী কতিপয় শর্ত আরোপ করে বলেনঃ আমার শর্তগুলো যদি বাদশাহ পূরণ করেন তাহলে আমি জেলের বাইরে যাবো নতুবা নয়। আমার শর্তগুলো হলোঃ

এক ঃ সম্মান পূর্বক সিজদা প্রথা বাতিল করতে হবে।

দুই ঃ ভারত বর্ষে যত মসজিদ ধ্বংস করা হয়েছে সে সব মসজিদ পুনরায় নির্মাণ করে দিতে হবে।

তিন ঃ গরু জাবাইয়ের নিষিদ্ধ আইন বাতিল করতে হবে এবং সম্রাটকে স্বহস্তে গরু জবাই করতে হবে।

চার ঃ গোটা দেশে ইসলামী আইন চালু করতে হবে এবং ইসলামী আইনানুযায়ী বিচারক নিযুক্ত করতে হবে।

পাঁচঃ অমুসলিমদের নিকট থেকে জিজিয়া কর আদায় করতে হবে।

ছয়ঃ ইসলাম বিরোধী যাবতীয় অনুষ্ঠানাদী বর্জন করতে হবে।

সাতঃ ইসলামী আন্দোলন করতে গিয়ে আন্দোলনের যে সমস্ত কর্মীদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছে তাদেরকে বিনাশর্তে মুক্তি দিতে হবে।

সম্রাট জাহাঙ্গীর সমস্ত শর্ত মেনে নিয়ে আলফেসানীকে জেল থেকে মুক্তি দেন। পরবর্তীতে জাহাঙ্গীর ইসলামের মহান সেবকে পরিণত হন।

মিথ্যা হুংকারের মোকাবেলায় যে দিল অবিচল

বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজি তাঁরই নিয়োগকৃত প্রধান বিচারপতিকে দরবারে ডেকে এনে প্রশ্ন করলেনঃ "অসৎ দুর্নীতিবাজ লোকদেরকে হাত-পা কেটে বিকলাঙ্গ করে শাস্তি দিতে চাই। আপনার অভিমত কি?" বিচারপতি অম্লান বদনে বললেনঃ "এ ধরনের নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বন ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।" বিচারপতির মন্তব্য শুনে বাদশাহ রাগান্বিত হলেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেনঃ "যুদ্ধেপ্রাপ্ত সম্পদের অধিকারী আমি না দেশের সাধারণ মানুষ?" বিচারপতি নির্ভীক কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ "মুসলিম সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ করে যে সম্পদ অধিকার করেছে, তার মালিক আপনি হতে পারেননা, এ সম্পদ রাষ্ট্রীয় তহবিলে জমা দিয়ে দিন।"

বিচারপতির নির্ভীক উত্তর শুনে বাদশাহ আলাউদ্দিন খিলজীর চোখ দুটো আগুনের গোলকের মতই জ্বলে উঠলো। ক্রোধে উম্মাদ হয়ে তিনি চিৎকার করে বললেনঃ "রাষ্ট্রীয় তহবিলে আমার ও আমার পুত্র পরিজনদের প্রাপ্য কতটুকু?" বাদশাহের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সত্যপথের নির্ভীক যাত্রী বিচারপতি স্পষ্ট ভাষায় রায় দিলেনঃ "দেশের একজন সাধারণ নাগরিক রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে যতটুকু পায় আপনি ও আপনার পুত্র পরিজনেরা তার থেকে বিন্দু পরিমাণ বেশী পেতে পারেন না। আপনি যদি আপনার ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্রীয় তহবিল ব্যবহার করেন তাহলে মনে রাখবেন, কেয়ামতের ময়দানে রাষ্ট্রীয় তহবিল তছরুপের দায়ে আপনাকে আল্লাহর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।"

বিচারপতির সাহসী ভূমিকায় বাদশাহ ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূণ্য প্রায়। তিনি বিচারপতিকে হুমকী প্রদর্শন করলেন। বাদশাহের হুমকীর জবাবে দেশের প্রধান বিচারপতি রক্ত পিচ্ছিল পথের অকুতোভয় সৈনিক গর্জন করে বললেনঃ "আপনি আমাকে ফাঁসিই দিন অথবা যা খুশী করতে পারেন, কিন্তু সত্য বলা থেকে আমার কণ্ঠকে কেউ স্তব্ধ করতে পারবেনা।" বাদশাহ তাঁরই নিযুক্ত প্রধান বিচারপতির সাহসে মুগ্ধ হয়ে বিচারপতিকে পুরস্কৃত করলেন। যাঁরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করে চলে, তাঁরা দুনিয়ার কোন শক্তির ভয়েই সত্যের বিধান পরিবর্তন করতে পারেন না। নিজে ফাঁসিকাষ্ঠে আত্মাহুতি দিয়েও সত্যের আলোক শিখা প্রজ্জ্বলিত রাখেন। আর এটাই হলো সত্যপন্থীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট। মিথ্যা শক্তির প্রাবল্য দেখে সত্যের বাহকেরা মুহূর্তের জন্যেও দূর্বল

হয়না। "বাঁধন যত তীব্র হয় বাঁধন ছেড়ার তীব্রতা ততই বেড়ে যায়।" তেমনি সত্যপন্থীদের সামনে মিথ্যা থাবা বিস্তার করলে সত্যপন্থীরা প্রবল ঝাপটায় বাতিলের সে থাবা গুটিয়ে নিতে বাতিলকে বাধ্য করে। সত্যের মহিমায় বাতিল পরাজিত হতে বাধ্য।

ইতিহাসের অলিন্দে সৎলোকদের দৃপ্ত পদচারণা

আল্লাহভীরু সৎলোকদের শাসনামলে তাঁরা ন্যায় নিষ্ঠা ও সততার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন তা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি আজ পর্যন্তও স্থাপন করতে পারেনি। কারণ মানুষকে আখিরাতের জবাবদিহির অনুভূতিই কেবল পারে সততা ও ন্যায় নিষ্ঠার অনুসারী রূপে গড়ে তুলতে। ক্ষমতার শীর্ষে অবস্থান করেও তাঁরা হন নিরহংকারী। খলিফা মামুনের রাজপ্রাসাদে তৎকালিন সম্মানিত জ্ঞানী ব্যক্তি ইয়াহ্ইয়ার আগমন ঘটলো অতিথি হিসেবে।

গভীর রাত। গোটা প্রকৃতি সুসুপ্তিতে নিমগ্ন। রাজপ্রাসাদের ভৃত্যরাও ঘুমে অচেতন। খলিফা আর তাঁর সম্মানিত অতিথি ঘুমাননি। তাঁরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জ্ঞানগর্ব আলোচনায় মত্ত। হঠাৎ অতিথি আলোচনা স্থগিত করে এদিকে ওদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কি যেন অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অতিথির আচরণ খলিফা মামুনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তিনি মেহমানকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞাসা করলেনঃ আপনার কোন কিছুর প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে?

অতিথি ইয়াহ্ইয়া বললেন, "তৃষ্ণা পেয়েছে, পানির প্রয়োজন" খলিফা সাথে সাথে উঠে দাঁড়ালেন পানি আনার জন্যে। অতিথি শশব্যস্তে বলে উঠলেনঃ "আপনি উঠলেন যে? কোন ভৃত্যকে ডাকলে হয় না?" খলিফা মামুন বললেনঃ "না–না, তা হয় না। আমি খলিফা বলেই কি আপনি আমাকে একথা বলছেন? খলিফা পানি নিয়ে আসবে এতে অসম্মানের কি আছে? আল্লাহর নবী (সাঃ) বলেছেন, "জাতির প্রধান ব্যক্তি জনগণের একজন ভৃত্য মাত্র"।

অতিথি বিশাল মুসলিম সাম্রাজ্যের কর্ণধারের এ কথার কোন উত্তর খুঁজে পেলেন না। ইসলাম ও মহানবী (সাঃ) এর প্রতি শ্রদ্ধায় তাঁর চিত্ত অবনত হয়ে এলো। কি অপূর্ব আদর্শ। কি অপরিসীম তার মোহনীয় শক্তি? যে শক্তি সাম্রাজ্যের প্রভাবশালী সম্রাটকেও জাতির সাধারণ ভৃত্যে পরিণত করেছে।

ইসলামী আদর্শের অনুপম গুণাবলী শাসককে জাতির সেবক ও রক্ষক তৈরী করেছে।

৮৪০ সন। খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর শাসনকাল। তিনি রাজকীয় সমারোহে সুসজ্জিত তেজীঅশ্বে আরোহণ করে চলেছেন রাজপথ দিয়ে। জনতা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিয়ে খলিফাকে সালাম জানাচ্ছে। দেশের নাগরিকদের সালামের উত্তর দিতে দিতে খলিফা মৃদুহাস্যে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। পথে একটি বৃদ্ধ লোকের দুর্বল শরীরের প্রতি খলিফার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। লোকটি খলিফার আগমনের কথা শুনে শশব্যস্তে রাজপথ ছেড়ে দিয়ে পাশে অবস্থান গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

কিন্তু বয়সের ভারে নুব্জ দুর্বল শরীর। বৃদ্ধ নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলেন না। পথিপার্শ্বে নর্দমায় পড়ে গেলেন। নর্দমার পূঁতি গন্ধময় আবর্জনায় বৃদ্ধের গোটা শরীর মলিন হয়ে গেল। তিনি নর্দমা থেকে উঠার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সাহায্যের আশায় তাঁর দুর্বল হাত দুটি নিজের অজান্তেই উপরের দিকে উঠে গেছে।

খলিফার কোমল হৃদয় আর্তনাদ করে উঠলো। তিনি বিদ্যুৎ গতিতে ঘোড়া থেকে নেমে ছুটে গেলেন নর্দমার পাশে। বৃদ্ধকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন বুকের মধ্যে। উপরে অতি যত্নের সাথে তুললেন বৃদ্ধকে। তাঁর দেহের পূঁতি গন্ধযুক্ত কাদা ময়লা খলিফার দেহের রাজকীয় সজ্জাকেও কর্দমাক্ত পূঁতি গন্ধময় করে দিল। খলিফার সেদিকে কোন দৃষ্টি নেই। তাঁর আগমনের বার্তা শুনে এই বৃদ্ধ পথ ছেড়ে দিতে গিয়ে নর্দমায় পড়ে গেছে এই বেদনায় খলিফার হৃদয় এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় মুহ্যমান। তিনি খলিফা বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় পরিচয় হলো তিনি জনগণের সেবক। জাতিকে কষ্ট দেওয়া তাঁর দায়িত্ব নয়। জাতির সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। বৃদ্ধটির মুখে তৃপ্তির হাসি দেখে খলিফার দু'নয়নে আনন্দের বন্যা দেখা দিল।

আদালতে এজলাসে প্রধান বিচারপতি উপবিষ্ট। অষ্টম শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ সমর শক্তির অধিকারী, সমৃদ্ধশালী ও উন্নত মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিপতি খলিফা আল মানসুরের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হলো। বাদী সামান্য এক উট চালক। শুধু সামান্য উট চালক তাঁর এই পরিচয়ই শেষ নয়– সে এমন এক সাম্রাজ্যের নাগরিক যেখানে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন বলবৎ আছে।

গোটা সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের তখন ছিল পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। সত্য ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ে প্রদীপ্ত ছিল তাদের জীবনধারা। দেশে "আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন বলবৎ আছে" এই শানিত চেতনা জাগ্রত ছিল গোটা জাতির মন মস্তিস্কে। রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ যে জাতির সেবকমাত্র সে চিন্তা চেতনা ছিল তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় ক্রিয়াশীল। জনগণের দাবীর কাছে বলিষ্ঠ জনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে রাষ্ট্রীয়প্রধান ব্যক্তিরাও বিন্দুমাত্র কুন্ঠাবোধ, অসম্মান বোধ করতেন না।

আদালত থেকে আসামী খলিফা আল মানসূরের নিকট সমন এলো। খলিফাকে আদালতে উপস্থিত হতে হবে। খলিফা আদালতে উপস্থিত হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করে রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের বললেন, "আদালত আমাকে তলব করেছে, বিচারকের সামনে আমি একজন আসামী বৈ- কিছু নয়"। যথাসময়ে খলিফা আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হলেন। খলিফার সাথে কোন দেহরক্ষীও নেই।

মহামান্য খলিফাকে দেখে তাঁরই নিয়োগকৃত বিচারপতি বিচারকের আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে খলিফাকে সম্মান প্রদর্শন করলেন না। এমন কি খলিফার দিকে দৃষ্টিও নিক্ষেপ করলেন না। দৃষ্টি তাঁর আদালতের নথিপত্রের উপর নিবদ্ধ। জনগণের বিচারকর্মে তিনি ব্যস্ত। বিচার অনুষ্ঠিত হলো। খলিফার বিরুদ্ধে বিচারপতির বজ্রকন্ঠ ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হলো। রায় উট চালকের পক্ষে- খলিফার বিপক্ষে।

বিচারপতির কন্ঠে রায় ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে খলিফা হর্ষধ্বনি করে বলে উঠলেনঃ "আপনার এই ন্যায় বিচারের জন্যে আমি আল্লাহর প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আমি সামান্য দশ হাজার দিরহাম আপনাকে পুরস্কার দেওয়ার আদেশ দিলাম।"

আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসনে বিচার বিভাগ হয় সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বাধীন। স্পেনের নাবালক সুলতান দ্বিতীয় হিশাম। আর প্রকৃত শাসক ছিলেন সিপাহসালার আল মানসূর। সত্য ন্যায় নিষ্ঠ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ এক বাক্যে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেনঃ "দশম শতাব্দীর বিশমার্ক আল মানসূর।" ঐতিহাসিক ডোজী মন্তব্য করেছেনঃ "শুধু দেশ ও জাতি নয়, পৃথিবীর সভ্যতাও তাঁর কাছে ঋণী।" বিচার কালে তিনি ব্যক্তির মর্যাদার দিকে দৃষ্টি দিতেন না, দৃষ্টি দিতেন ন্যায় নীতির দিকে।

স্পেনের এক নাগরিক তাঁর কাছে তাঁরই ঢাল রক্ষকের বিরুদ্ধে ফরিয়াদ জানালোঃ "মাননীয় বিচারক, আপনার অধিনস্থ ঢাল রক্ষক, যাকে আপনি বিরাট সম্মানের আসনে আসীন করেছেন। আমার সাথে সে চুক্তি ভঙ্গ করেছে। বিচারের জন্যে তাকে আদালতেও উপস্থিত করা যায়নি। আল মানসুর ক্রোধে গর্জন করে উঠলেনঃ কি! সে আদালতে উপস্থিত হয়নি। আর বিচারপতি তাকে আদালতে হাজির হতে বাধ্য করেনি?

আল মানসুর তাঁর ঢাল রক্ষককে বললেনঃ তুমি তোমার দায়িত্ব অন্য কাউকে বুঝিয়ে দিয়ে এই মুহূর্তে আদালতে উপস্থিত হও। তারপর তিনি পুলিশ বাহিনীকে আদেশ দিলেন এই দু'ব্যক্তিকে আদালতে নিয়ে গিয়ে বিচারপতিকে বলবেঃ আমার ঢাল রক্ষক ফরিয়াদীর সাথে চুক্তিভঙ্গ করেছে। আমি তাঁর উপযুক্ত শাস্তি চাই।

ফরিয়াদী তাঁর মামলায় জিতে আল মানসুরকে ধন্যবাদ দিতে আসলে তিনি বললেনঃ "তোমার প্রশংসা থেকে আমাকে হেফাজত করো। তুমি ন্যায় বিচার পেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছো কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। তাঁর এত বড় সাহস! আমার চাকুরীতে বহাল থেকে যে আইন সে লংঘন করেছে, ঐ শাস্তি তাঁর পাওনা আছে"।

তিনি কিছু বন্দীর প্রতি একবার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। মুক্তির আদেশপ্রাপ্ত বন্দীদের তালিকায় তাঁর দৃষ্টি। হঠাৎ একটি নামের উপরে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো। চোখে তাঁর দেখা দিল ক্রোধের চিহ্ন। লোকটির সাথে তাঁর শত্রুতা। তিনি লোকটির নামের পাশে লিখে দিলেনঃ মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এর জীবনের পরিসমাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত সে কারারুদ্ধ থাকবে।

গভীর রজনী। স্পেনের গোটা প্রকৃতি নিদ্রার আরামদায়ক কোলে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। নিস্তব্ধ নিঝুম বসুন্ধরা। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। আল মানসুরের চোখে ঘুম নেই। তিনি দুগ্ধফেনিল শয্যায় এপাশ ওপাশ করছেন আর বিবেকের দংশনে হৃদয় তাঁর ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। ন্যায় নিষ্ঠ মানসুরের শাণিত চেতনা যেন কোষমুক্ত তলোয়ার। সে তলোয়ার তাকে ঘুমুতে দিচ্ছে না। একের পর এক নিষ্ঠুর আঘাত করছে তাঁর কোমল হৃদয়ে আর করুণ সুরে যেন বিলাপ করছেঃ

মানসুর তুমি এ কি করলে? কেন ঐ লোকটিকে মুক্তি দিলে না? কি অন্যায় করেছে লোকটি তোমার প্রতি? এখন তুমি আরামশয্যায় শায়িত। আর

নজর করে দেখো তো। ঐ বন্দীর প্রতি অন্তরের অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দেখতে পাও কি? পাথর নির্মিত শক্ত মেঝেয় প্রচন্ড ঠান্ডায় লোকটি হাত-পা কুকড়ে পড়ে আছে। কি জবাব দিবে তুমি আদালতে আখিরাতে? মানসুর। লোকটির প্রতি যে অন্যায় আচরণ তুমি করেছো তার প্রায়শ্চিত্ত আদায় কর।

আল মানসুর শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। প্রহরীকে ডেকে কারাগারের নথিপত্র নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। বন্দীর নামের পাশে তাঁরই লিখা পূর্বের আদেশ তিনি নিজ হাতে কেটে দিয়ে নতুন করে লিখলেনঃ বন্দীকে এখুনি মুক্তি দেওয়া হোক। আর এই বন্দীর মুক্তির জন্যে সমস্ত প্রশংসা ঐ মহান আল্লাহর যিনি গোটা বিশ্বের প্রতিপালক।

আল্লাহর ভয়ে ভীত অন্তরসমূহের চেতনা খাপখোলা তরবারীর মতই থাকে সুতীক্ষ্ণ শানিত। মিশরের এক বিচারপতি। ৭৬১ সনে তিনি নিয়োগ লাভ করেন। পরকালে জবাবদিহির অনুভূতি তাঁর মধ্যে এতই প্রবল ছিল যে, বিচারপতি হিসেবে তিনি যে বেতন পেতেন তা গ্রহণে তিনি অত্যন্ত সতর্ক ছিলেন। তিনি পরিশ্রমের সময় ভাগ করে কতটুকু সময় ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে ব্যয় করলেন, আর কতটুকু সময় নিজের ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করলেন তা হিসেব করে ঐ পরিমাণ অর্থ নিজ বেতন থেকে কম গ্রহণ করতেন।

তিনি অবসর সময়ে প্রতিদিন দুটি করে ঘোড়ার মুখের সাজ তৈরী করতেন, সাজ দুটি বিক্রয় করে তার একটির পয়সা নিজে ব্যয় করতেন আর অপরটির বিক্রয়লব্ধ অর্থ আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর এক বন্ধুর নিকট প্রেরণ করতেন। তাঁর সে বন্ধু বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত ছিলেন। মানুষের বিবেক সচেতন না হলে প্রকৃত মানবতা তার মধ্যে স্থানলাভ করতে পারে না। কারণ এটা পরীক্ষিত সত্য যে, মানুষের বিবেক কখনো সত্যের বিপরীত রায় দেয় না।

সম্রাট বাবর। যিনি ভারতে বিরাট মোঘল সামাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর চরিত্র ছিল হীরকের মতই উজ্জ্বল। তিনি যখন মধ্য এশিয়ার ফারগানা রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন তখন একটি বাণিজ্য কাফেলার মালিক ইন্দিজান পাহাড় এলাকায় বজ্রপাতে ইন্তেকাল করেন। বাবর এ কাফেলার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করে মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ দিলেন। প্রায় দুই বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ঐ সম্পদের উত্তরাধিকারীরা এসে সমস্ত সম্পদ ফেরৎ চায়। বাবর সম্পদগুলো তাদের হাতে হস্তান্তর করেন। তাঁরা বাবরকে উপঢৌকন দিতে গেলে তিনি তা গ্রহণে অস্বীকার করেন। উপরন্তু তাদের আসা যাওয়ার যাবতীয় খরচ বাবর তাদেরকে দিয়ে দেন। আল্লাহর কাছে জবাব

দেওয়ার ভয়ে মানুষ আমানত যেমন রক্ষা করে তেমনি অপরের সম্পদের প্রতিও থাকে না কোন লোভ। মুসলিম রাজা বাদশাহ্‌রা এক দিকে যেমন ছিলেন স্বেচ্ছাচারী অপরদিকে অধিকাংশ রাজা বাদশাহগণই আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন।

বিচার ফয়সালা যাতে নিরপেক্ষ হয় সেদিকে তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন। পক্ষান্তরে অধিকাংশ অমুসলিম ঐতিহাসিকরা মুসলমান শাসকদের চরিত্রের উন্নত দিকগুলোও কলমের এক আঁচড়ে কদর্যরূপে ফুটিয়ে তুলেছে ইতিহাসে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন মালিক ফয়েজকে বাদায়ুনের শাসনকর্তা নিয়োগ করলেন। প্রভূত অর্থ শাসনকর্তাকে বিলাসী মদ্যপ করে তুললো। মালিক ফয়েজ একদিন মদ্যপ অবস্থায় তাঁরই দাসকে হত্যা করে বসলেন। রাজ্যের অনেকেই প্রতিবাদ করতে চাইলেন। কিন্তু স্বেচ্ছাচারী মদ্যপ শাসনকর্তার নিকট থেকে সুবিচার পাওয়া যাবেনা বিধায় তাঁরা নিরব রইলেন। হঠাৎ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন বাদায়ুন প্রদেশে আগমন করলেন।

সুলতানের আগমন উপলক্ষ্যে তাকে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্যে মালিক ফয়েজ এক সাড়ম্বর অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন। সুলতান তাঁর শাসনকর্তার কুশলবার্তা জেনে খুশী হলেন। রাজ্যের জনগণের প্রকৃত অবস্থা অবগত হওয়ার লক্ষ্যে তিনি পর দিন উন্মুক্ত দরবারে উপবেশন করলেন। দেশের জনগণ দলে দলে এসে সুলতানের কাছে তাদের সমস্যা বর্ণনা করতে লাগলেন। হঠাৎ সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো এক পর্দাবৃত মহিলা। সুলতান তাকে বিনয়ের সাথে কাছে ডাকলেন। প্রশ্ন করলেন তিনি দরবারে কোন অভিযোগ নিয়ে এসেছেন কি–না। মহিলা অশ্রু সজল নয়নে সুলতানের পার্শে রাজকীয় পোশাকে মূল্যবান আসনে উপবিষ্ট মলিক ফয়েজের দিকে আঙ্গুলী সংকেত করে বললেনঃ জাঁহাপনা, আপনার নিকট উপবিষ্ট বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজ আমার প্রাণপ্রিয় স্বামীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছে।

মহিলার অভিযোগে গোটা দরবারে যেন বজ্রপাত ঘটলো। মুখরিত দরবার মুহূর্তে নিরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মহিলার অভিযোগ শুনে সুলতান কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লেন। তিনি হতবিহবলতা কাটিয়ে দৃষ্টি ফেরালেন পাশে উপবিষ্ট বাদায়ুনের মদমত্ত স্বেচ্ছাচারী শাসক মালিক ফয়েজের দিকে। সুলতানের সে দৃষ্টিতে শত সহস্র প্রশ্ন। সে দৃষ্টির সামনে মালিক ফয়েজের পক্ষে স্থির হয়ে বসে থাকা সম্ভব হলোনা। তিনি কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

সুলতানের অনুসন্ধানী অন্তর্ভেদী দৃষ্টির শত সহস্র প্রশ্নের কোন উপযুক্ত উত্তর নেই মালিক ফয়েজের মুখে।

কিন্তু তাঁর ভীতিগ্রস্ত মুখমন্ডলের প্রতিটি রেখায় পাপের কলূষ কালিমার চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠলো। সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন দৃষ্টি ফিরালেন বোরখাবৃত মহিলার দিকে। বেদনাহত কণ্ঠে বললেনঃ "মা তুমি ফিরে যাও, অচিরেই দেখতে পাবে আল্লাহর আইনে বিচারপতির বিচারালয়ে আসামী মালিক ফয়েজের বিচার হচ্ছে। আমিই তোমার পক্ষে বাদী হয়ে কোর্টে দাঁড়াবো"।

বিচারালয়ে বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক ফয়েজকে সন্দেহাতীতভাবে দোষী সাব্যস্ত করে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হলো। সুলতান স্বয়ং দাঁড়িয়ে সে আদেশ কার্যকরী করালেন। তারপর স্বৈরাচারী সেই শাসনকর্তার লাশ তিনি ঝুলিয়ে রাখলেন বাদায়ুন শহরের প্রধান প্রবেশ পথে। যাতে মানুষেরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করলে তার শাস্তি কত ভয়াবহ।

অযোধ্যার শাসনকর্তা হয়বত খাঁন যখন তাঁর দাসকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলেন তখন নিহত দাসের স্ত্রী সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করলেন। গিয়াসউদ্দিন বলবন শাসনকর্তাকে পাঁচশত বেত্রাঘাতের আদেশ দিলেন এবং নিহত দাসের বিধবা স্ত্রীর দাসত্বে তাকে নিয়োজিত করলেন। পরে কয়েক হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে হয়বত খাঁন সেই বিধবা মহিলার নিকট থেকে মুক্তি ভিক্ষা চেয়ে নেন।

আল্লাহর আইনের অধীনে সৎলোকদের শাসনে জাতি মুক্তির নিঃশ্বাস এভাবেই গ্রহণ করেছে। আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে আসামীর পদমর্যাদা বা সামাজিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়নি। দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে আল কুরআনের বিধিমালার দিকে।

সুলতান ফিরোজশাহ। তিনি হযরত বেলালের দেশ অবিসিনিয়ার অধিবাসী। কৃষ্ণাংগ ফিরোজ শাহ দারিদ্র্যতার অসহনীয় যন্ত্রণার সাগর পাড়ি দিয়ে আজ বাংলার সিংহাসনে সমাসীন। দারিদ্রতা যে কত বড় অভিশাপ, অর্থের প্রয়োজনীয়তা যে কত বেশী, তা ফিরোজশাহের থেকে আর কে বেশী উপলব্ধি করতে পারবে? তবুও তিনি যখন বাংলার সিংহাসনে আসীন হলেন তখন তিনি প্রতিদিন রাজকোষ থেকে একলক্ষ রৌপ্য মুদ্রা জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে লাগলেন। তিনি অনেক ছোট থেকে, নিম্ন অবস্থান থেকে আজ দেশের সবচেয়ে সম্মানের আসনে আসীন হয়েছেন। অভাবের তাড়নায় তাকে যে কত

কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে, সেই দারিদ্র পীড়িত দিনগুলোর দুঃসহ স্মৃতি আজও তাঁর নয়ন যুগোল অশ্রুসজল করে তোলে।

রাজ সিংহাসনে বসে তিনি তাঁর অতীতের যাতনাময় দারিদ্র্য পীড়িত দিনগুলোর ব্যথাভরা ঘটনার স্মৃতিচারণ যখন করেন, তখন তাঁর শাসনাধীন বাংলার দারিদ্র্য পীড়িত বুভুক্ষ জনতার সীমাহীন দারিদ্র্যতার কথা ফিরোজের মনে পড়ে যায়। চোখ দু'টো তাঁর অশ্রুসজল হয়ে উঠে। এক অব্যক্ত বেদনায় তাঁর হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলো আর্তনাদ করে উঠে। গোটা পৃথিবীর ধনভান্ডারের মালিক যদি তিনি হতেন, তাহলে সমস্ত ধনভান্ডার গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তিনি মানুষকে দারিদ্রতার নির্মম অভিশাপ থেকে মুক্ত করতেন। দরবারের মন্ত্রীরা মহাবিপদে পড়লো। এভাবে যদি প্রতিদিন রাজকোষ থেকে একলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা গরীবদের মধ্যে দানকরা হয় তাহলে তো অচিরেই রাজকোষ শূন্য হয়ে যাবে? মন্ত্রীরা পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো, সুলতান তো খুবই গরীব ছিলেন, তিনি অর্থের মর্যাদা বোঝেন না। আর একলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা একত্রিত করে তিনি কোন দিন দেখেননি। যদি তিনি একলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা একত্রিত করে দেখেন তাহলে তাঁর অর্থের উপরে মমতাবোধ সৃষ্টি হবে। তখন তিনি আর এই ভাবে অমিতচারীর মত অর্থ দান করতে পরবেন না। তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে একদিনের দানের অর্থ একলক্ষ রৌপ্যমুদ্রা সুলতান ফিরোজশাহের সামনে এনে স্তুপিকৃত করলো। একজন মন্ত্রী বিনয়ের সাথে বললেনঃ "মহামান্য সুলতান, আজ এই অর্থ গুলোই দানের জন্যে নির্ধারিত করা হয়েছে। সুলতান ফিরোজ শাহ অর্থের বিশাল স্তুপের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্ত কন্ঠে বললেনঃ "তাই নাকি! এ টাকা তো খুবই অল্প বলে মনে হচ্ছে? তোমরা রাজকোষ থেকে আরো একলক্ষ টাকা এর সাথে যোগ করে অভাবী মানুষদের মধ্যে বিলিয়ে দাও"।

মন্ত্রীদের চোখ সুলতানের আদেশ শুনে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে গেল। সুলতানের আদেশ তৎক্ষণাৎ পালনে তাঁরা ব্যস্ত হয়ে পড়লো। আল্লাহভীরু সৎলোকদের শাসনে রাষ্ট্রীয় কোষাগার এভাবেই জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। বাদশাহ আওরঙ্গজেব প্রায় পঞ্চাশ বছর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইতিহাসে তিনি ন্যায় বিচারক হিসেবে বিখ্যাত হয়ে আছেন। তিনি বলতেনঃ বিচারের ক্ষেত্রে আমার সন্তানদেরকেও আমি দেশের সাধারণ একজন নাগরিকের তুলনায় বড় মনে করিনা। তিনি সাম্রাজ্যে এক আইন জারি করে ঘোষণা করেন যে, "দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে জনসাধারণকে

জানিয়ে দেওয়া হোক যে, বাদশাহের বিরুদ্ধে যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে তাহলে নির্ভয়ে তা পেশ করতে পারবে। সরকারী প্রতিনিধি সে সমস্ত অভিযোগের জবাব দিবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযোগকারী তাঁর অধিকার বুঝে পাবে। আর যদি বাদশাহ নিজেই সরাসরি দায়ী হন তাহলে তিনিই তার প্রতিকার করবেন।"

মির্যাকামবখ্‌স ছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহের পুত্র। মির্যাকামবখসের দুধ ভাইয়ের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আরোপিত হয়। আওরঙ্গজেব আদেশ দিলেন, "বিচারালয়ে এর তথ্যানুসন্ধান করা হোক, তদন্তের নিরপেক্ষতা যাতে কোন ভাবে ক্ষুণ্ন না হয়, কোন সুপারিশ যেন গ্রহণ করা না হয়, সুপারিশকারী যদি বাদশাহের সন্তানও হয় তবুও তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করা যাবেনা।"

সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র মির্যাকামবখ্‌স তাঁর দুধ ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করলেন, তদন্তে বাধা সৃষ্টি হলো। সম্রাট তাঁরই কলিজার টুকরা সন্তানকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করে তদন্ত কমিটিকে বললেনঃ "এবার আপনারা নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করুন। প্রকৃত হত্যাকারী কে? তা খুঁজে বের করুন।"

ন্যায় বিচারের প্রতি কত গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও আখিরাতে জবাবদিহীর অনুভুতি কি পরিমাণ শানিত হলে একজন মানুষ তাঁর সন্তানকে কারাগারে অবরুদ্ধ করতে পারেন, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সম্রাট আওরঙ্গজেব। অথচ অমুসলিম ঐতিহাসিকগণ সাম্প্রদায়িকতার দুষ্ট ক্ষতে কলুষিত তাদের হৃদয় দর্পণে আল্লাহভীরু মুসলিম শাসকদের শাসনের ছবিতে সাম্প্রদায়িক ভূত দর্শন করে চমকে উঠে সত্য আড়াল করে ইতিহাসকে কালিমা লিপ্ত করেছেন। মুসলমানদেরকে "কলহ প্রিয়" "দস্যু তস্কর" "বিদেশী" "অত্যাচারী" ইত্যাদি হিসেবে ইতিহাসে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা করেছেন। হ্যাঁ,একথা অস্বীকার করার অবকাশ নেই যে, মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ ঘটেছে। কিন্তু সে সংঘর্ষের পেছনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে অমুসলিমদের ষড়যন্ত্রের কালোহাত সক্রিয় থেকেছে। জড়বাদী অমুসলিমদের মত বর্ণবাদ আর গোত্র ভেদের ঘৃণ্য ধুয়া তুলে মুসলমানেরা স্বধর্মের লোকদের রক্ত নিয়ে হোলিখেলে ইতিহাস কলংকিত করেনি। ১৯৭১ সনে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের উস্কানীতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের তল্পী বাহকেরা বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণ যারা ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ছিল, তাদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাহিলিয়াতের অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বাঙ্গালী–অবাঙ্গালী মুসলমনাদের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। যে লক্ষ্যে

আসমুদ্র হিমাচল রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাভীলাসি ভারত এই সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছিল, সে লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা শোচনীয় ভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

তাদের বর্তমান পোষ্যপুত্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বাংলাদেশে হালে পানি পাচ্ছে না। মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের দুশমনদের চক্রান্তে মাঝে মধ্যে যে ভ্রাতৃসংঘর্ষের সূচনা হয়েছে তার মধ্য দিয়েও তাওহীদের কালজয়ী অমর আদর্শের কিরণচ্ছটা যুদ্ধের ভয়াবহতাকে ম্লান করে দিয়েছে।

অভূত পূর্ব দৃশ্য

বলখ ও বাদাখশান রাজ্যের সীমান্ত সন্নিহিত পর্বতময় মালভূমিতে ভ্রাতৃঘাতি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে। রণপ্রান্তরের একদিকে অবস্থান গ্রহণ করেছে শাহজাদা অওরঙ্গজেবের সেনাপতিত্বে মোঘল বাহিনী। অপরদিকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত বলখের সুলতান আযীয খানের সৈন্যবাহিনী। মোঘল বাহিনী প্রেরণ করেছেন দীল্লির সম্রাট শাহজাহান তাঁর পিতৃভূমি বলখ-বুখারা- বাদাখশান পুনরুদ্ধার করতে।

আযীয খান যুদ্ধে অবতীর্ন হয়েছেন তাঁর রাজ্য ও বাদশাহী টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে। তিনি যুদ্ধের ময়দানে স্বয়ং সেনাপতিত্ব করছেন। সিংহাসন রক্ষা, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব, রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতিকরণ ও সম্মান রক্ষার লক্ষ্যেই এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ ঘটছে। আফগানিস্তানের উত্তর-পশ্চিমে এক পর্বতময় মালভূমিকে রণপ্রান্তর হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। সর্বনাশী রণদামামা বেজে চলেছে। অবিরাম গতিতে যুদ্ধ চলছে। সূর্য্য যেন এই ভ্রাতৃঘাতি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের কলংকময় দৃশ্য অবলোকনে ঘৃণা বোধ করছে। দিনমনি অস্তাচল গমনে উদ্যোগী। দ্রুত বেগে তার নিলয় পরিক্রমায় উঠে এলো মধ্য নীলিমায়। দখিনা মলয় সমিরণে আঘাত পাওয়া কোমল লতার মতই সূর্য্য হেলে পড়লো পশ্চিম গগনে।

সেনাপতি শাহজাদা অওরঙ্গজেব মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করলেন। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়লো জোহর নামাজের সময় সমাগত। চেহারায় ফুটে উঠলো দায়িত্ব পালনের গভীর চিহ্ন। ক্ষণিক পূর্বের সেই হিংস্রভাব চেহারায় আর অবশিষ্ট নেই। সে শূন্যস্থানে এখন আল্লাহভীতি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। হস্তে ধারণকৃত যুদ্ধাস্ত্র বেগে ছুড়ে দিলেন মৃত্তিকা প্রান্তরে। সন্ত্রস্তাবস্থায় অশ্বপিঠ থেকে

মৃত্তিকায় অবতরণ করলেন। কোমরবন্ধ উন্মুক্ত করে শরীর স্বাভাবিক করলেন। জায়নামাজ বিছিয়ে তিনি কা'বা মুখী হয়ে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে নতশিরে দন্ডায়মান হলেন। মরণপণ যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে। আকাশ আড়াল করে উল্কার বেগে ছুটে আসছে প্রতিপক্ষের তীর বর্শা, পরস্পরের তরবারীর সংঘর্ষে অগ্নিস্ফুলিংগ নির্গত হচ্ছে। রণবিপ্লবীরা স্বশব্দে হুংকার দিয়ে পর্বতময় মালভূমিতে কম্পন সৃষ্টি করছে। আহতদের গগনবিদারী করুণ আর্তনাদ আর অশ্বের বিকট হ্রেষা রবে এক বিভীষিকাময় পরিবেশের অবতারণা ঘটেছে।

তরুণ শাহজাদা সেনাপতি আওরঙ্গজেবের কর্ণকুহরে এ সবের কোন শব্দই ঝংকার সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছে। কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। তাঁর দৃষ্টি অবনত। জায়নামাজের উপরে নিবিষ্ট। হৃদয় মনমস্তিস্ক আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন। অখন্ড মনোযোগে নামাজ আদায় করছেন শাহজাদা আওরঙ্গজেব। শত্রু পক্ষের দৃষ্টি ও অস্ত্রের আওতায় দন্ডায়মান তিনি। যে কোন মুহূর্তে প্রতিপক্ষের অস্ত্রের আঘাতে তাঁর জীবন নাটকের শেষ যবনিকা মঞ্চস্থ হতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির ভয় শূন্য– স্রষ্টার ভয়ে আতংকিত হৃদয়ে তিনি নামাজে দন্ডায়মান। তিনি বিনয়াবনত চিত্তে, একাগ্রমনে ঐ রাজাধিরাজ মহান সম্রাট জগতাধিপতি মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দরবারে নতশির। তাঁর ভাবলেশহীন সৌম্যমূর্তি দর্শনে মনে হচ্ছে যেন তিনি কোন এক বিরল উপত্যকায় শ্যামল অরণ্যানী পরিবেষ্টিত নিরব নিঝুম পরিবেশে গভির প্রশান্তিতে নামাজ আদায় করছেন।

এই অপরূপ চিত্তাকর্ষক, মনোমুগ্ধকর হৃদয়গ্রাহী দৃশ্য, অশ্বে সমাসীন সুলতান আযীয খানের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। তাঁর দৃষ্টি অপলক নেত্রে নিবদ্ধ হলো শাহজাদা আওরঙ্গজেবের উপরে। তাঁর গোটা দেহে তড়িৎ বেগে শিহরণ সৃষ্টি হলো। হৃদয়ের কোমল তন্ত্রীগুলো শত সহস্র ঝংকারে করুণ আর্তনাদ করে উঠলো। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ? এ কোন মহামানবের বিরুদ্ধে তাঁর তরবারী রণপ্রান্তরে বন্য নৃত্য করছে? এ যে আমার মুসলিম ভাই। আমার কালজয়ী অমর আদর্শের রক্ষক। সুলতান ঘৃণাভরে তরবারী বেগে নিক্ষেপ করলেন মৃত্তিকায়। করুণ সুরে তাঁর কন্ঠ আর্তনাদ করে উঠলোঃ বন্ধ কর। বন্ধ কর এ ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ। কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। কিসের জন্যে যুদ্ধ।

রণপ্রান্তর নিরব নিস্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। ক্ষণিক পূর্বের ভ্রাতৃঘাতি রণদামামা স্তব্ধ হয়ে পড়লো। পরাজিত হলো ব্যক্তি স্বার্থ। উড্ডীন হলো আদর্শ, জাতীয় স্বার্থ আর ভ্রাতৃ সম্পর্কের গৌরব মন্ডিত সুমহান পতাকা। ইসলাম যেন সৌভ্রাতৃত্বের মূর্তিমান রূপ ধারণ করে অবস্থান গ্রহণ করলো রণপ্রান্তরে

দু'ভাইয়ের মাঝখানে। প্রমাণ হলো ইসলাম, একমাত্র ইসলামই শান্তি, আপোষ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সর্বশেষ ভিত্তি।

রুদ্ধ যেথায় শোষণের পংকিল পথ

ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে শোষকশ্রেণী চিরদিনই ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ মেহনতি মানুষ, যারা ধর্মীয় ভাবাবেগে তাড়িত তাদেরকে শোষণ করেছে। কখনো বা মাজার ও দরগাহ পূজার নামে, কখনো বা পীর মুরিদীর নামে কখনো বা ওরশের নামে, কখনো বা খানকাহ স্থাপন করে। এ সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ী ধর্মের শত্রুদের অপতৎপরতার কারণে হক্কানী পীর ও তাদের খানকাহ- যারা আল্লাহর জমিনে, আল্লাহর দ্বীন কায়েমে নিবেদিত অদের সম্পর্কে মানুষেরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ তাদের একশ্রেণীর ধর্মীয় নেতাদের নিষ্ঠুর শোষণে সর্বগ্রাস্ত হয়েছেন। মন্দির, মূর্তি, মঠ, প্যাগোডা, আশ্রম, মন্ডপ, তীর্থস্থান ও গির্জার নামে শোষণ চলেছে- এখনো চলছে। BHABESH ROY তাঁর BELIEVE IT OR NOT নামক গ্রন্থে এ ধরনের শোষণমূলক বহু ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তিনি প্রমাণসহ উল্লেখ করেছেন যে, প্রতারণার মাধ্যমে কিভাবে মূর্তির মুখ দিয়ে কথা বলানো এবং বিচিত্র আওয়াজ সৃষ্টি করা হয়েছে।

অজ্ঞ সাধারণ ভক্ত গোষ্ঠী পাষাণ মূর্তির মুখ থেকে অলৌকিক শব্দ শুনে ভক্তি গদ গদ চিত্তে তাদের শেষ সম্বল উজাড় করে দিয়েছেন পূজার বেদীমূলে। যা ভোগ করেছে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত গোষ্ঠী। সোমনাথ মন্দিরে জড়বাদীদের দেবতা সোমনাথ শূন্যে অবস্থান করতো। কোন বেদী ছাড়াই কঠিন পাষাণ মূর্তি মন্দিরের মধ্যে অবস্থান করে, এতো ভারী আশ্চর্য্যের ব্যাপার? এতবড় বিশাল, ওজনদার মূর্তি কিভাবে কোন বস্তুর সাহায্য ছাড়াই মহাশূন্যে অবস্থান করে? নিশ্চয়ই সোমনাথ নামক দেবতা, এখন আর দেবতা নেই- সাক্ষাৎ ভগবানে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। নইলে এতবড় ক্ষমতা এ মূর্তি পেল কোথায় যে, মহাশূন্যে কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া বিশাল পাষাণ মূর্তি অবস্থান করবে? আসলে প্রকৃত রহস্য ছিল, ধাতব পদার্থ মিশ্রিত দ্রব্য দিয়ে মূর্তি নির্মিত হয়েছিল। আর মন্দিরের উপর নীচ ও চতুরপার্শে শক্তিশালী চুম্বক কৌশল করে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যা ভক্ত সধারণের দৃষ্টির আড়ালে ছিল লুকায়িত। ঐ

চম্বুকের আকর্ষণ ও বিকর্ষণে মূর্তি মহাশূণ্যে স্থির থাকতো। এক শ্রেণীর পুরোহিতগণ এই চাতুরীর মাধ্যমেই অজ্ঞ জড়বাদীদের শোষণ করতো।

ব্যস, আর যায় কোথায়? জড়বাদী জনতা পঙ্গ পালের মতই ভীড় জমালো মন্দির প্রাঙ্গণে। ষষ্ঠাঙ্গে প্রণামের জন্যে তাঁরা হুমড়ী খেয়ে পড়লো সোমনাথের পাষাণ পদতলে। ভক্তবৃন্দ প্রতি মুহূর্তে অর্পণ করতে লাগলো তাদের অর্ঘ্য ও নৈবদ্য। স্বর্ণ, রৌপ্য, মনিমানিক্য, হীরা জহরতের বিশাল পাহাড় গড়ে উঠলো সোমনাথ মন্দিরে। প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা আমদানী হতে লাগলো। যার ভোগ দখলকারীরা ছিল উচ্চবর্ণের একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পুরোহিত শ্রেণী। পাঁচশত নর্তকী, তিনশত কির্তনী–গায়ক এবং মন্দিরে প্রবেশ পথে ভক্তদের মাথার কেশ মুন্ডনের জন্যেই তিনশত নরসুন্দর–নাপিত নিয়োজিত ছিল এ বিশাল মন্দিরে।

মানুষকে ধর্মের নামে শোষণ করে প্রাচুর্য আর বিলাসিতার গড্ডালিকা প্রবাহে দেহ মন এলিয়ে দিয়েছিল পুরোহিত গোষ্ঠী। তাদের গেরুয়া বসনের অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে যেত শত শত কোটি টাকা। সুলতান মাহমুদ একে একে গজনী থেকে সতের বার অভিযান পরিচালনা করেছেন ভারতে। জড়বাদী ঐতিহাসিকগণ তাকে "সম্পদ লোভী" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আসলে তাঁরা তাদের স্বার্থে প্রকৃত সত্য গোপন করেছেন। সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দিরে ধন সম্পদের লোভে অভিযান চালাননি। তিনি সোমনাথ মন্দিরে অভিযান চালিয়ে ছিলেন মানুষকে শোষণের যাঁতাকল থেকে মুক্তি দেওয়ার উদ্দেশ্য।

সোমনাথ জয়ের পরে সুলতান মাহমুদ মন্দিরে প্রবেশ করে মহাশূন্যে অবস্থানরত মূর্তির নাক প্রথমে ভেঙ্গে দিলেন। তারপর মূর্তিটি গুড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণগণ তাঁর কাছে প্রস্তাব দিলোঃ "আপনি যদি মূর্তিটি না ভাঙ্গেন তাহলে আপনাকে শত শত কোটি টাকা মূল্যের হিরা, পদ্মরাগ মনি, মুক্তা ও অঢেল স্বর্ণ রৌপ্য দেওয়া হবে"। মাহমুদের কতিপয় সঙ্গীও মাহমুদকে পরামর্শ দিল, মুর্তি ভেঙ্গে কি লাভ। তার চেয়ে ব্রাহ্মণরা যা দিতে চায় তা গ্রহণ করে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেও সওয়াব পাওয়া যাবে।

তাওহীদের চেতনায় উজ্জিবীত সুলতান মাহমুদ তাদের প্রস্তাব শুনে মৃদু হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে বললেনঃ "মাহমুদ মূর্তি বিক্রয় করতে আসেনি। এসেছে মূর্তি ধ্বংস করতে"। মূর্তি ধ্বংস করা হলো। মানুষেরা পুরোহিতদের শোষণ থেকে রক্ষা পেল। ন্যায় বিচারক হিসেবে, গরীবের বন্ধু হিসেবে

ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন। সুলতান মাহমুদ ছিলেন পরাক্রমশালী শাসক এবং বিশাল বিত্ত বৈভবের অধিকারী।

পক্ষান্তরে অতুলনীয় শক্তি ও বিত্ত তাকে স্বেচ্ছাচারীর কালোপথের পথিক করতে পারেনি। ন্যায় বিচারকে তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উর্ধে স্থান দিতেন। এক ব্যক্তি এসে সুলতানের নিকট অভিযোগ করলো, তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি অসক্ত হয়ে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁর গৃহে হানা দিয়ে তাকে প্রহার করে ঘর থেকে বের করে দিয়ে তাঁর স্ত্রীকে ধর্ষণ করে। অভিযোগ শ্রবণ করে ক্রোধে সুলতানের চোখ দুটি অগ্নি গোলকের মতই রক্তিম বর্ণ ধারণ করলো। তিনি বললেনঃ "পুনরায় সে কুলাংগার তোমার ঘরে প্রবেশ করলে আমাকে সংবাদ দিবে"।

কয়েক দিন পর এক রাত্রিতে লোকটি ছুটে এসে সুলতানকে সংবাদ দিল। সুলতান নাঙ্গা তরবারী হাতে একাই ছুটলেন অপরাধীর বিচার করার জন্যে। সুলতান গিয়ে দেখেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র লোকটির স্ত্রীর পাশে। তিনি ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে তরবারীর এক আঘাতে ভ্রাতুষ্পুত্রের মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেললেন। তারপর সুলতান আলো জ্বালিয়ে ভীষণ তৃষ্ণা পেলে মানুষ যেভাবে পানি পান করে তিনিও সেভাবে পানি পান করলেন।

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে লোকটি সুলতানকে প্রশ্ন করলেনঃ ''আপনি আলোই বা নিভিয়ে দিলেন কেন আর এভাবে পানি পান করার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন কেন"?

সুলতান বললেনঃ ''ঐ যুবককে আমি গভীর স্নেহ করতাম। আমি শংকিত ছিলাম এই ভেবে যে আমার চোখ তাঁর উপরে পড়লে আমার হৃদয়ে মমতার উদ্রেক হয় আর আমি ন্যায় বিচার করতে ব্যর্থ হই। এই জন্যে আমি আলো নিভিয়ে দিয়েছি। আর পানি পান করার কারণ হলো ঃ তোমার অভিযোগ শুনে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে আমি একবিন্দু পানিও গ্রহণ করবো না। আমি আজ তিনদিন যাবৎ অনাহারে আছি।

সুলতান মাহমুদ ছিলেন আদর্শ পিতার আদর্শ সন্তান। তাঁর পিতা সুলতান সবুক্তগীন ছিলেন আদর্শ শাসক। একবার তিনি শিকারে গিয়ে একটি হরিণ শাবক ধরে আনছিলেন। শাবকটির মা মমতাভরা চোখে সুবক্তগীনের পিছে পিছে আসছিল। এই দৃশ্য দেখে তিনি তাড়াতাড়ি হরিণ শাবকটিকে তার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দেন। মাহমুদ একটি সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করে দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের সহ তাঁর পিতা সবুক্তগীনকে প্রাসাদে দাওয়াত দেন। সবাই

প্রাসাদের ভূয়সী প্রশংসা করছে। কিন্তু সুলতান সবুক্তগীন গম্ভীর হয়ে আছেন। মাহমুদ পিতার মন্তব্য শোনার জন্যে ব্যাকুল।

প্রাসাদ পরিদর্শন শেষে সুবক্তগীন মন্তব্য করলেনঃ আমার ধারণায় গোটা প্রাসাদটিই একটি খেলাঘর। যে কোন লোক অর্থ ব্যয় করে এর চেয়ে মনোরম প্রাসাদ গড়তে পারে। একজন শাহজাদার প্রকৃত কাজ হলো, উত্তম কর্ম ও সুখ্যাতির এমন শক্ত ভিত রচনা করা যা যুগ যুগ ধরে মানুষ অনুসরণ করবে এবং অতি সহজে সে ধরনের উত্তম কর্ম ও সুখ্যাতি কেউ অর্জন করতে পারবে না।

পরবর্তীতে সিংহাসনে আরোহণ করে সুলতান মাহমুদ পিতার কথা বাস্তবে প্রতিফলিত করেছিলেন। তাঁর বিচারের নিরপেক্ষতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষকে বিচারের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে।

কুহেলিকায় কৌমুদী-কিরণ

ঘন তমসাবৃত যামিনী দুর্গম গিরি কান্তার মরুর যাত্রীদের দৃষ্টি পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে চাইলেও অগ্রসরমান যাত্রীরা তাদের যাত্রা ক্ষণিকের জন্যেও স্থগিত করেন না। কারণ তাঁরা জানেন যে, অন্ধকার যত বেশি গভীর হবে পূর্ব দিগন্তে নবারুণের আগমনী বার্তা ততই জোরে ঘোষিত হতে থাকবে। অন্ধকারের সূচীভেদ্য আবরণ ভেদ করে সাহসী যাত্রীরা সম্মুখপানে অগ্রসর হলে পূর্ব নীলিমায় তরুণ তপন উদিত হয়ে গোটা ধরণীকে যখন আলোয় উদ্ভাসিত করে তোলে তখন তমসাবৃত যামিনীর তেজোদৃপ্ত দুর্বীনিত যাত্রীদের পথের যাবতীয় বাধা অপসৃত হয়।

পথিক তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পথিমধ্যে বাধার অলংঘনীয় বিন্ধাচলের দিকে হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই সে তার লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে ব্যর্থ হবে। লক্ষ্যস্থল যদি যোজন যোজন দূরে অবস্থিত হয় আর পথের দূরত্বের দূর্ভাবনায় পথিক যদি যাত্রা পথে চরণ উঠানোর পূর্বেই মনের ক্লান্তিতে

অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সে পথিক তাঁর কাংখিতস্থানে পৌছতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়।

প্রকৃতির অপরূপ সৃষ্টি হিমশীতল শুভ্র তুষার আবৃত পর্বতের গগণচুম্বী শৃঙ্গ বিজয় আকাংখায় যারা মনস্থির করেছেন তাঁরা শৃঙ্গ আরোহণ পথে প্রতি পদক্ষেপে নিষ্ঠুর মৃত্যুর শীতল হাতছানিকে নির্মম পায়ে পদদলিত করেই তাদের লক্ষ্যস্থলে দৃঢ়পদে পৌছতে সক্ষম হয়েছেন।

ভয়াল জলধির উত্তাল উর্মিমালার হিংস্র কিরীটে পদাঘাত করে যারা যাত্রা আরম্ভ করেছেন তাঁরাই কেবল বিশ্বের দেশ মহাদেশের অবস্থান নিরূপণ করতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথিবীব্যাপী মিথ্যার বিজয় ভেরীর উচ্চ নিনাদে যারা কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করে মসজিদের চার দেওয়ালের মধ্যে আত্মরক্ষা করে তাদের পক্ষে সত্যের দুন্দুভী বাজানো অসম্ভব। গাজী অথবা শাহাদাতের দূর্দমনীয় উগ্র কামনা হৃদয়ে যারা পোষণ করে তাঁরাই কেবল মহাসত্যের দুন্দুভীতে প্রতিধ্বনী সৃষ্টি করতে সক্ষম।

মহাসত্যের রত্মালংকারজাল–সমালংকৃত রূপের প্রভায় মিথ্যার অন্ধকার অপসৃত–মলিন হয়ে পড়ে। মহাসত্যের বিশাল আয়ত লোচনের মাধুরীমায় প্রজ্জোল দৃষ্টিতে অসীম পথের মিথ্যে তমসা অপসৃত হতে বাধ্য হয়। সত্য এমনি প্রভাময়! এমনি মাধুর্যময়!

মহাসত্যের আজন্ম শত্রু মিথ্যের অর্বাচীন পূজারীরা উদ্বাহু নৃত্যে এগিয়ে আসে সত্যের বাহকদের কন্ঠনালী চেপে ধরার লক্ষ্যে। মহাসত্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় সেখানে মিথ্যে শক্তি গর্জন করবে এটাই চিরন্তন নীতি। পক্ষান্তরে সত্যের বাহকদেরকে যদি মিথ্যের অনুসারীরা পুষ্পমাল্যে বরণ করে স্বাগত জানায় তাহলে বুঝতে হবে ওটা সত্য নয়–সত্যের আবরণে সত্যের সংহারক–মিথ্যের সহযোগী শক্তি।

মিথ্যের কুহেলিকা মানবমন্ডলীর সুকুমারবৃত্তিগুলোকে যখন আবৃত করার প্রয়াসে লিপ্ত তখনই মহাসত্যের কৌমুদী তার প্রভাময় কিরণচ্ছটা দান করে মনুষ্য জাতিকে তমসামুক্ত করেছে। বিপদের ঘনঘটা অবলোকন করে সত্যের বাহকেরা সত্য প্রকাশে কৃপণতা করেননি। বাগদাদের স্বৈরাচারী শাসনকর্তার তীব্র সমালোচনা করে একবার জগদ্বিখ্যাত দার্শনিক মহাসত্যের অকুতোভয় সৈনিক ইমাম গাজ্জালী (রাহঃ) বলেনঃ

বর্তমানকালের শাসকবৃন্দের ধন--সম্পদ বা অধিকাংশ সম্পদরাশি অবৈধ। এ সকল শাসকদের কারো সাথে দেখা করা উচিত নয়। তাদের প্রতি শত্রুতার মনোভাব পোষণ করা এবং তাদের প্রশংসা না করা জনগণের কর্তব্য। তাদের সাথে কোন সম্পর্ক রাখা উচিত নয় এবং যারা সম্পর্ক রাখে, তাদের স্পর্শ থেকেও দূরে থাকা উচিত।

এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাগদাদের শাসনকর্তা ইমাম গাজ্জালীকে দরবারে ডেকে কৈফিয়ত তলব করলে ইমাম সাহেব দৃঢ়তার সাথে বলেন ঃ 'তোমার ঘোড়ার ঘাড় অলংকার ভারে না ভাঙ্গলে কি হয়েছে? মুসলমানদের ঘাড়তো দুর্বহ ক্ষুৎ-পিপাসায় মৃত্তিকা স্পর্শ করার উপযোগী হয়ে পড়েছে। সেদিকে তোমার কোন দৃষ্টি নেই।'

যেখানেই অন্ধকার তার আবাস নির্মাণে স্বচেষ্ট হয়েছে মহাসত্যের কৌমুদী সেখানেই তার কিরণ কিরীট উজ্জ্বল করে অন্ধকার দূরীভূত করার লক্ষে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।

খলিফা মুকতাজি আমিরিল্লাহ ইয়াহিয়া ইবনে সা'দ নামক এক অত্যাচারী ব্যক্তিকে বাগদাদের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত করেন। জনগণ এ কাজীকে ইবনুল মালাজেম নামে স্মরণ করতো।

একদিন এক মসজিদে শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাহঃ) বক্তৃতা করছিলেন। সেখানে খলিফা মুকতাজিও উপস্থিত ছিলেন। সুযোগ বুঝে বড় পীর সাহেব খলিফার সমালোচনা করেন এবং ইয়াহিয়া ইবন সাঈদকে বাগদাদের কাজীর পদে অধিষ্ঠিত করায় খলিফাকে উদ্দেশ্য করে সরাসরি বলেন, হে মুকতাজি, তুমি মুসলমানদের ওপর এমন ব্যক্তিকে সমাসীন করেছ-যে আজলাদুজ জালেমীন, অর্থাৎ অত্যাচারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কাল কেয়ামতে আরহামুর রাহেমীন অর্থাৎ দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে তুমি কি জবাব দেবে?

মুকতাজি এ কথা শুনে থর থর করে কেঁপে উঠলেন এবং তখনই ইয়াহিয়াকে বরখাস্তের আদেশ জারি করলেন।

বিংশ শতাব্দীতে গোটা পৃথিবী যখন মিথ্যেশক্তির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন তখন তমাসা অপসৃত করে মানব গোষ্ঠীকে আলোর পথে পরিচালিত করার লক্ষ্যে যারা মহাসত্যের কৌমুদী- কিরণদানে মানব জাতিকে ধন্য করেছেন ইমাম

হাসান আল বান্না (রাহঃ) ও ইমাম সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রাহঃ) তাদের মধ্যে অন্যতম।

হাসান আল বান্না (রাহঃ) ১৯০৬ সনে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরের এক ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শায়খ আবদুর রহমান আল বান্না ছিলেন একজন বিজ্ঞ আলেম এবং প্রখ্যাত মোহাদ্দিস।

হাসান আল বান্না বাল্যকালে তাঁর পিতার নিকট থেকেই ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন। তিনি যখন অল্প বয়সে আল কুরআন হিফ্জ করেন তখন উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তাকে আলেকজান্দ্রিয়ার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রেশাদে দ্বীনিয়াতে প্রেরণ করা হয়। ছাত্র জীবনে অত্যন্ত মেধাবী ও চরিত্রবান হিসেবে তিনি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

শিক্ষকবৃন্দ কিশোর ছাত্র বান্নাকে নিয়ে গর্ব করতেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কিশোর বান্নার সাথে বহু জটিল বিষয় নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা করতেন। এখানের শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে তিনি ১৯২০ সনে টির্চাস ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হন। ট্রেনিং শেষে কিছু দিনের জন্যে তিনি শিক্ষকতা করেন। শিক্ষকতার জীবনেই হাসান আল বান্না অসাধারণ প্রজ্ঞা ও ইসলাম দরদী হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। এ সময় থেকেই মিথ্যে শক্তির সৃষ্ট কুহেলিকার আবরণ ভেদ করার লক্ষ্যে তাঁর কলম সত্যের কৌমুদী– কিরণ ছড়াতে থাকে।

প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকতার ক্ষুদ্র গন্ডীতে আবদ্ধ থেকে বৃহত্তর সমাজ–জীবনে কোন বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ সম্ভব নয় বিধায় যুবক বান্না উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের লক্ষ্যে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আল আজহার মুসলিম জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি যুগে আজহারের ছাত্ররা মুসলিম জাহানের সভ্যতা–সংস্কৃতিতে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আজহারের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এবং বৃহত্তম জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যুবক হাসানের সত্যানুসন্ধিৎসু মনের খোরাক ছিল অপরিসীম। এখান থেকে তিনি ১৯২৭ সালে কৃতিত্বের সাথে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার প্রকৃতির মধ্যে মহাসত্যের যে দীপ্তি ও জেহাদের অগ্নি লুকায়িত ছিল এখান থেকেই তা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কায়রোতে অবস্থান কালেই তিনি মিশরের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন ধরণের সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত হয়ে তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য "ইসলামী বিপ্লব" ঘটানোর ভিত্তি রচনা করেন।

তদানীন্তন পাশ্চাত্য প্রভাবিত মিশরীয় সমাজ-জীবনে যে সমস্ত অনাচারের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল সেই সবের প্রতিরোধ এবং মুসলিম জনগণকে সকল কুসংস্কার ও অনাচারের পঙ্ক হতে উদ্ধার করার চিন্তায় তখন থেকেই তাঁর অনুভূতিপ্রবণ অন্তর আবেগে উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কোথাও কোন সংস্কার প্রচেষ্টা দৃষ্টিগোচর হলেই তার সাথে যুক্তভাবে কাজ করার জন্য তিনি সাগ্রহে এগিয়ে যেতেন।

'আনজুমানে ইনসিদাদে-মুহাররামাত,' 'জামিয়াতে-মাকারেমে-আখলাকে ইসলামী' প্রভৃতি সামাজিক সংস্থা তখন মিশরের বিভিন্ন এলাকায় কাজ করে যাচ্ছিল। অন্যায়ের প্রতিরোধ এবং মুসলিম সমাজকে সত্য ও ন্যায়ের পথে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই সব সংস্থার সক্রিয় কর্মী হিসাবে হাসানুল বান্না ছাত্রজীবনেই একজন দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

সামাজিক কাজ কর্মের সাথে জড়িত হওয়ার ফলে যৌবনের প্রারম্ভ ভাগেই তিনি মিশরীয় মুসলিম সমাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। পাশ্চাত্যের খৃষ্টানশক্তি এবং ইহুদী পুঁজিপতিদের গভীর ষড়যন্ত্রজালের আড়কাঠি হিসাবে শিক্ষিত মুসলমান সমাজের বিরাট একটি অংশ যেভাবে সামান্য কিছু স্বার্থের বিনিময়ে বিবেক বিক্রয় করে দিয়েছিল, হাসানুল বান্নার পক্ষে সে সবের ঘৃণ্য স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যক্ষভাবে অবগত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

মিশরে তখন রাজতন্ত্র চলছে, ফারূক নামেমাত্র রাজা। গোটা মিশরের প্রশাসন যন্ত্রের সব গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো খৃষ্টান ও ইহুদী কাপালিকরা করায়ত্ব করে রেখেছে। তাঁরা মিশরের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন রাখার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা প্রতিটি বিভাগেই ইসলাম বিরোধী শক্তি তাদের নগ্ন থাবা বিস্তার করে রেখেছে। রাজতন্ত্রের দূর্বল ভিত্তিভূমি ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। এজন্যে রাজতন্ত্র-শাসিত মিশর ভূমিতে পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্রকারীদের দীর্ঘকালের ঘৃণ্য আকাংখা বাস্তবায়িত হতে দেরী হলো না।

ইঙ্গ-মার্কিন-ইহুদী সাম্রাজ্যবাদীদের পোষ্যপুত্র রাজা ফারূক তাদের সাথে বিভিন্ন ধরণের ঘৃণ্য চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে মিশরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ইসলামের দুশমন ইহুদী-খৃষ্টানদের হাতে উঠিয়ে দেয়। ফলে বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত মিশর হয়ে পড়ে ইহুদী-খৃষ্টানদের ক্রীড়াভূমি-করদরাজ্য

(TRIBUTARY STATE)। তাদের সম্মিলিত ষড়যন্ত্রে মিশরের সর্বত্র নৈশক্লাব, রঙ্গমঞ্চ এবং অশ্লীল নগ্নতায় পরিপূর্ণ চলচ্চিত্র–প্রেক্ষাগৃহ, যৌন আবেদনমূলক সাহিত্য, পত্র পত্রিকা ও কুরুচিপূর্ণ নৃত্য–গীতসহ ব্যভিচারের প্লাবন বইয়ে দিয়ে মুসলমানদের চরিত্র ধ্বংসের যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

গোটা মিশরের বাতিল শক্তির উদ্বাহ নৃত্য অবলোকন করে রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যুবক হাসান আল বান্নার স্পর্শকাতর হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হলো। ইসলামী ঐহিত্যের সুপ্রাচীন লালনক্ষেত্র, অসংখ্য সংগ্রামী সাধকদের চারণভূমি তথা আওলাদে–রাসূল (সাঃ) শায়খ আহমদ কবীর রেফায়ীর (রহঃ) পূত পবিত্র পদরেনু ধন্য মিশরের বুক থেকে বাতিল শক্তি কর্তৃক সৃষ্ট কুহেলিকা অপসারণ করে কিভাবে মহাসত্যের দীপ্তিমান কৌমুদী–কিরণ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, এই চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে তুললো। ঘন কুহেলিকা যেমন উদ্বাহ নৃত্যে পথিকের সর্বদেহ বেষ্টন করে তেমনিভাবে মিশরের নরশার্দুল মুসলিমদেরকে গ্রাস করে আছে ইহুদী–খৃষ্টশক্তি। এদের কবল থেকে মুসলিমদেরকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হলে একদিন মিশরের বুক থেকে আজানের ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে পড়বে।

হাসান আল বান্না সম্পূর্ণ একা নিঃস্ব নিঃসঙ্গ অবস্থায় কর্মপন্থা নির্ধারণ করে ফেললেন। বাতিলের আবর্জনা দূর করে তাওহীদের কৌমুদী–কিরণ ছড়িয়ে দিতে ঝাপিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ এক বছরের অক্লান্ত শ্রমে তিনি মাত্র ছয়জন জিন্দাদীল মুজাহিদকে সঙ্গী হিসেবে তাঁর যাত্রা পথে খুঁজে পান। এ ছয় জন ছিলেনঃ (১) হাফেজ আবদুল হামিদ, (২) আবদুর রহমান হাসবুল্লাহ (৩) জাকী উল মাগরেবী (৪) আমানুল হাসরী (৫) ইসমাঈল ইজ্জত এবং (৬) ফুয়াদ ইবরাহীম।

১৯২৮ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই কয় ব্যক্তি আলেকজান্দ্রিয়ায় হাসানুল বান্নার ক্ষুদ্র বাসভবনে একত্রিত হয়ে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে "আল–ইখওয়ানুল মুসলেমীনের" ভিত্তি স্থাপন করেন। প্রাথমিক পাঁচটি বৎসর আলেকজান্দ্রিয়াতেই সংস্থার সদর দফতর চলতে থাকে। এখান থেকেই চারিদিকে বিস্তৃত প্রতিকুল পরিবেশের বিভীষিকা অতিক্রম করে দেশের বিভিন্ন এলাকায় এই আন্দোলন উল্কার গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে রাজধানী কায়রো ছিল সর্বাপেক্ষা সমস্যা জর্জরিত এলাকা। তাই পাঁচ বৎসর পর কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে ইখওয়ানের সদর দপ্তর আলেকজান্দ্রিয়া হতে স্থানান্তরিত করা হয় রাজধানীতে। কায়রোর বর্ণাঢ্য পরিবেশে আল্লাহর কয়েকজন নিরীহ বান্দা অকুতোভয়ে দাওয়াতের কাজ

চালিয়ে যেতে থাকলেন। প্রাথমিক অবস্থায় কিছুটা শক্তি সঞ্চয় হওয়ার পর ইখওয়ান কর্মীগণ সর্বাত্মক অভিযান শুরু করলেন। তাঁরা কফিখানার অলস আড্ডাগুলোতে পর্যন্ত হানা দিয়ে আত্ম বিস্মৃত মানুষকে আত্মউপলব্ধির দাওয়াত দিতে লাগলেন। প্রথম প্রথম বিদ্রুপ ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হলেও অল্প দিনের মধ্যেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে লাগলো। পথ ভ্রান্ত মানুষ পঙ্গ পালের মতই দলে দলে ইসলামী আন্দোলনে শামিল হতে লাগলো।

মুরশিদে আম বা প্রধান পরিচালক হিসেবে ইমাম বান্না যে সমস্ত বক্তৃতা দিতেন তার প্রতিটি বাক্যই মুসলিম মানসে গভীর আলোড়ন সৃষ্টি করতো। ইমামের আহ্বান যেন ঐন্দ্রজালিক সূত্রের মতই মানুষের মন-মস্তিষ্কে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করতো। মাত্র বিশ বছরের সাধনায় লক্ষ লক্ষ তরুণ-যবুক বাতিল উৎখাতের শহীদি শপথে এই আন্দোলনে শামিল হলো। মিশরের সরকারী ভবন থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের অন্ধকার কুঠুরীতেও ইমামের আন্দোলন তরঙ্গ সৃষ্টি করলো।

ইখওয়ানুল মুসলেমীন মিশরে বিভিন্ন ধরণের প্রতিষ্ঠান তৈরী করে মানুষকে ইসলামী বিপ্লবের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে লাগলো। এ আন্দোলনের তরঙ্গ গোটা মধ্যপ্রাচ্য অতিক্রম করে সুদূর তুরস্কেও গিয়ে আঘাত করলো। মিশরে ইসলামের জয়যাত্রা দেখে পুঁজিবাদী শোষক আমেরিকা, লাল সাম্রাজ্যবাদী নাস্তিক তদানিন্তন অখন্ড রাশিয়া ও অভিশপ্ত ইহুদী গোষ্ঠী এবং ভারতীয় ব্রাহ্মন্যবাদী-জড়বাদী গোষ্ঠী নিজেদের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে হীন চক্রান্তে মেতে উঠলো। তাঁরা তাদের ক্রীড়নক রাজা ফারুককে নির্দেশ দিল ইখওয়ানকে নির্মূল করার জন্যে।

পক্ষান্তরে ইমাম হাসান আল বান্না বাতিলের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে মিশরের তদানিন্তন আইনমন্ত্রীর কাছে এক পত্র প্রেরণ করলেন। পত্রে তিনি লিখলেনঃ

'পঞ্চাশ বছর থেকে অনৈসলামী আইন-কানুন যাচাই করা হচ্ছে এবং সেসব নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে, এবার ইসলামী শরীয়তের বিধি বিধান যাচাই করা দরকার। ইখওয়ানুল মুসলিমুনের দাবী হলো যে, আমাদের সরকারকে ইসলামী শরীয়তের পথে প্রত্যাবর্তন করতে হবে এবং মিশরের আইন ব্যবস্থাকে অনতিবিলম্বে শরীয়তের ভিত্তিতে পুনর্বিণ্যাস করতে হবে। আমরা একটি মুসলিম জাতি। আমরা অঙ্গীকার করছি যে, শুধুমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের আইন-কানুন, কুরআন এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ)-এর শিক্ষা ও

আদর্শের সমুন্নতির সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো। এজন্য যতো বড় মূল্য দিতে হয় তার জন্য কিছুতেই আমরা পশ্চাৎপদ হবো না।'

শেখ হাসানুল বান্না সব সময় বাদশাহ ফারুকের দরবার থেকে দূরে থাকেন। একবার হাসানুল বান্না একজন উর্ধতন সরকারী কর্মকর্তাকে (আনোয়ার সাদাত) বলেন, 'শাহ ফারুক ইখওয়ানের দাওয়াতের ফলে মারাত্মক আশংকা প্রকাশ করছেন। তার কানে এ কথা পৌছেছে যে, জনগণের বাইয়াত ও ইচ্ছা অনুযায়ী সরকার গঠিত হবে এটাই ইখওয়ানে দাওয়াতের ভিত্তি। উত্তরাধিকার সূত্রে বাদশাহ মনোনীত করার নীতি ইসলাম অনুমোদন করে না। এজন্য বাদশাহ ভাবছেন কি করে ইখওয়ানকে নিশ্চিহ্ন করা যায়।"

মিশরের বাতিল গোষ্ঠী এবার মহাসত্যের কৌমুদী-কিরণকে কুহেলিকাচ্ছন্ন করার ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র বাস্তবায়িত করতে শুরু করলো। তাঁরা ইখওয়ানুল মুসলেমীনকে নিষিদ্ধ করে সংগঠনের হাজার হাজার নেতা-কর্মীকে কারারুদ্ধ করলো। দ্বীনি কাফেলার যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলো স্বৈরাচারী রাজা ফারুক ও তাঁর মন্ত্রী আবদুল হাদী পাশা। ইসলামী আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করলেও মুরশিদে আম হিসেবে ইমাম বান্নাকে গ্রেফতার করা হলো না। কারণ রাজা ফারুক ও আবদুল হাদী পাশার উপরে ইসলামের আন্তর্জাতিক শত্রুদের নির্দেশ ছিল ইমামকে হত্যা করতে হবে। ইমাম হাসান আল বান্নার বিপ্লবী কণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ এলো মস্কো, পিকিং, ওয়াশিংটন, পেন্টাগণ এবং দিল্লী থেকে। প্রভুদের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মিশরের বাতিল শাসক গোষ্ঠী ১৯৪৯ সনের ১২ই ফেব্রুয়ারী দিনটিকে নির্বাচন করলো।

ইমাম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সংগঠনের প্রিয় কর্মীদের এক সভায় বক্তৃতা দিয়ে গোধূলী লগ্ন অতিবাহিত হওয়ার সামান্যক্ষণ পরে মিশরের রাজপথ দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। তাঁর গাড়ী লক্ষ্য করে বাতিল শক্তির হিংস্র দানবদের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠলো। ইমামের পবিত্র দেহ থেকে রক্তের প্লাবনধারা বইতে লাগলো। শত কোটি মুসলিমদের প্রাণ প্রিয় নেতা, ইসলামের দরদী বন্ধু ইমাম বান্না শহীদি মিছিলে শামিল হলেন। গুলী করার পর হাসানুল বান্নাকে যে হাসপাতালে নেয়া হয় সে হাসপাতালের চারদিকে কড়া প্রহরা মোতায়েন করা হয় যেন কেউ তাঁকে দেখার উদ্দেশ্যে যেতে না পারে। শহীদের বৃদ্ধ পিতা শেখ আবদুর রহমান আল বান্না একাকী জানাযার নামাজ আদায় করেন এবং

পরিবারের মেয়েরা শহীদকে চির নিদ্রায় শায়িত করে দেন। কারো পক্ষে তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনও সম্ভব হয়নি।

ইমাম বান্নাকে শহীদ করে সত্যের কৌমুদী–কিরণ–কুহেলিকাচ্ছন্ন করা যায়নি। তাঁর শহীদি শোণিতধারা বেগবান বন্যার অপ্রতিরোধ্য গতিতে আজও সম্মুখ পানে ধাবমান। ইমামের পবিত্র রুধির বিধৌত সংগঠন আল ইখওয়ানুল মুসলেমীন ক্রমাগতভাবে শহীদি নজরানা পেশ করে তার মনজিলে মকসূদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তদানিন্তন বিশ্বে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আর এক মর্দে মুজাহিদ প্রশস্ত বক্ষে বাতিলের সামনে দাঁড়িয়ে হিমাচলের মতই বাধার বিন্ধ্যাচল সৃষ্টি করেন। তিনি হলেন, ইমাম সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদূদী (রাহঃ)। মওলানা মওদূদী পাকিস্তান সরকারের ভ্রান্ত নীতির কঠোর সমালোচনা করতেন এবং কখনোই কোন কিছুকে পরোয়া করতেন না। নিজের মতাদর্শ সম্পর্কে তিনি লিখেছেনঃ 'আমার নিকট আল্লাহর দ্বীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সবচেয়ে মূল্যবান। যখন আমি দেখি, কোন ব্যক্তি জেনে বা না জেনে এ দ্বীনের ক্ষতি সাধন করছে, তখন তার প্রতিবাদ করা আমি আমার কর্তব্য বলে মনে করি। যদি সেই ব্যক্তি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়, শিক্ষাগুরু হয় বা আমাদের জাতির কোন বড় ব্যক্তি হয়, তবুও এ ব্যাপারে কোন প্রকার আপোস বা নমনীয়তা প্রদর্শন করতে আমি অক্ষম।'

এই স্পষ্টবাদিতার জন্য মওলানা মওদূদীকে বারবার কারারুদ্ধ করা হয়। প্রথমবার তিনি উনিশ মাস কারাগারে থাকেন এবং নিজের আদর্শে অটল থাকেন। জেল থেকে মুক্তি পেলে তিনি সরকারকে বলেন ঃ 'যদি কেউ মনে করে যে, আমার চিন্তাধারা, মানসিকতা ও জীবনাদর্শকে শক্তি প্রয়োগ ও কারারুদ্ধ করে পরিবর্তন করা যাবে, তাহলে তাকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে, তার স্থান সরকারী তখতে নয় বরং মস্তিষ্ক রোগের হাসপাতালে। যদি সে এটা মনে করে থাকে যে, তার চাপ সৃষ্টিতে আমি নিজের বিবেক তার কাছে বন্ধক রাখব এবং ভবিষ্যতে সংকুচিত মনোভাব প্রকাশ করব; তাহলে তাকে জানিয়ে দিতে চাই যে, সে আমার জীবনাদর্শকে নিজের জীবনাদর্শের দৃষ্টিতে মূল্যায়নে ভুল করছে। আমার অন্তর সব সময়ে সত্যের জন্য অবারিত। আমার মতামতকে জ্ঞান ও বিবেকের দলিল দিয়ে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু আমার ঈমান–আকীদা ও বিশ্বাস বিক্রয়যোগ্য পণ্য নয়। অতীতে যারা এ

চেষ্টা করেছে, তারা ব্যর্থ হয়েছে, ভবিষ্যতে যারা করবে–ইনশাল্লাহ তারাও ব্যর্থ হতে বাধ্য।'

ইতিহাসের বর্বর নির্যাতন-অটল সে নারী

সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্ব এ পৃথিবীর চিরন্তন নীতি। যেখানে সত্য তার নিজস্ব আলো প্রজ্জ্বলিত করেছে, সেখানেই অন্ধকারপুরের অধিবাসী মিথ্যা শক্তি প্রবল ঝাপটা দিয়ে সত্যের সে আলো নির্বাপিত করতে চেয়েছে। সত্যের পতাকা হাতে যেখানে ইব্রাহিম (আঃ) এগিয়ে গিয়েছে সেখানেই নমরূদ বাধার বিন্ধাচল তৈরী করেছে। মুছা (আঃ) যেখানেই সত্যের প্রদীপ জ্বেলেছেন সেখানেই ফেরাউন ঝড় সৃষ্টি করেছে। মুহাম্মাদ (সাঃ) ও উম্মতে মুহাম্মাদী যেখানেই সত্যের বজ্রকণ্ঠ উচ্চকিত করেছেন সেখানেই আবু জেহেল ও তাঁর প্রেতাত্মারা সত্যের টুটি চেপে ধরার জন্যে থাবা বিস্তার করেছে। কিন্তু সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্বে আবর্তিত পৃথিবীর ইতিহাস প্রমাণ করে, মিথ্যা শক্তি সাময়িকের জন্যে প্রভাব বিস্তার করলেও চিরস্থায়ী হয়নি। সত্যের প্রবল আক্রমণে মিথ্যা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। সত্য তার ঐতিহ্য অনুযায়ী মাথা চির উন্নতই রেখেছে।

সত্য প্রতিষ্ঠার রক্তঝরা উত্তপ্ত ময়দানে পুরুষেরা যেমন ঈমানের অগ্নি পরীক্ষা দিয়েছে নারীরাও কোন কোন ক্ষেত্রে আরো এক ধাপ এগিয়ে পরীক্ষার অনল গহবরে নির্যাতিতা হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীরা বাতিল শক্তির কোপানলে পড়ে এই বিংশ শতাব্দীর আধুনিক ফেরাউনদের জাহান্নামে যে ভাবে নির্যাতিতা হয়েছেন সে লোমহর্ষক ইতিহাসের কাহিনী মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও ম্লান করে দিয়েছে। ইরানের ফেরাউন রেজাশাহ পাহলভী সেখানের ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের গ্রেফতার করে তাদের সামনেই প্রাণাধিক পুত্র, প্রিয়তমা স্বামীকে পৈচাশিকভাবে হত্যা করেছে। তবুও যখন তাদেরকে আন্দোলনের পথ থেকে বিরত রাখতে পারেনি, তখন বিশ্বের স্বঘোষিত মোড়ল মানবাধিকারের ফেরীওয়ালা আমেরিকার নির্দেশে ইরানের "সাভাক বাহিনী" পানি গরম করে সেই পানি কাঁচের শিশিতে ভরে, উত্তপ্ত শিশি মহিলাদের গোপন অঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করিয়েছে। এ আন্দোলনের মহিলা কর্মীরা শাহাদাতের মিছিল ভারী করেছে তবুও বাতিলের কাছে মাথানত করেনি।

মিশরে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে সত্যের প্রদীপ শিখা যারা প্রজ্জলিত করলেন জয়নাব আল–গাজালী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইসলামী আন্দোলনের মহিলা বিভাগের সিপাহসালার। অত্যন্ত বিদুষী এই মহিলা গোটা মিশরের সম্মানিত নেত্রী। মিশরের কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র যুবক, বুদ্ধিজীবি মহল তথা সর্বস্তরের মানুষের প্রিয় নেত্রী জয়নাব আল–গাজালী। তাঁর সাংগঠনিক প্রজ্ঞায় মিশরের ইসলামী আন্দোলনের শহীদি কাফেলা আল ইখওয়ানুল মুসলেমীন পুনরায় সংগঠিত হচ্ছে আল্লাহর দ্বীন কায়েমের লক্ষ্যে। বহু পূর্ব থেকেই ফেরাউনের দেশে ইখওয়ান বাতিল শক্তির কাপালিক কর্তৃক আইনগত ভাবে নিষিদ্ধ। দ্বীনের পতাকাবাহী এই সংগঠনকে মিশরের বিংশ শতাব্দীর ফেরাউনেরা নিষিদ্ধই শুধু করেনি, সংগঠনের প্রায় নেতৃবৃন্দকেই তাঁরা গুলী করে, ফাঁসি দিয়ে শহীদ করেছে। ইখওয়ানুল মুসলেমীনের হাজার হাজার কর্মীকে কারাগারে আবদ্ধ করে চরম নির্যাতনের মুখে নিক্ষেপ করেছে। শত নির্যাতনের নোংড়া পথ বেছে নিয়েও বাতিল শক্তি তাওহীদের প্রদীপ যখন নির্বাপিত করতে পারেনি, তখন তাঁরা মরিয়া হয়ে ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীদের উপরে শুরু করে লোমহর্ষক নির্যাতন।

নাস্তিক্যবাদী পরাশক্তি তদানিন্তন অখন্ড রাশিয়া ও পূঁজিবাদী আমেরিকার নির্দেশে মিশরের বিংশ শতাব্দীর ফেরাউন নাসের মিশর থেকে ইসলামের শেষচিহ্ন মুছে ফেলার লক্ষ্যে এক ঘৃণ্য অভিযান শুরু করে। বাংলাদেশে যেমন ১৯৭১ সালে কোন মানুষের মাথায় টুপি, মুখে দাড়ি দেখলেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদের তল্পীবাহক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীরা তাকে স্বাধীনতার দুশমন আখ্যা দিয়ে নির্মম নির্যাতনে হত্যা করতো, যার ঘৃণ্য ধারাবাহিকতা এখনো চলছে। তেমনি মিশরের ফেরাউন নাসের ও তাঁর কমিউনিষ্ট সাঙ্গ পাঙ্গরা কোন মানুষকে নামাজ আদায় করতে দেখলেই তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ খাড়া করে সামরিক কারাগারে নিক্ষেপ করতো। মিশরের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের যারা দূরতম আত্মীয় স্বজন ছিল, তাদের উপরেও চলে সীমাহীন নির্যাতন।

১৯৬৫ সনের ২০ শে আগষ্ট মিশরের ইসলামী আন্দোলনের মহিলা বিভাগের প্রধান জয়নাব আল গাজালীকে তাঁর বাড়ী থেকে অত্যন্ত ন্যাক্কার জনকভাবে নাসের সরকার গ্রেফতার করে। ইতোপূর্বে ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দ্বারা গোটা মিশরের জেলখানা গুলো পরিপূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহর দ্বীনের কোন কর্মীকে গুলী করে শহীদ করা হয়েছে। কোন কর্মীকে

ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শহীদ করা হয়েছে। কালের শ্রেষ্ট সন্তান হাসান আল বান্নাকে গুলী করে, আব্দুল কাদের আওদাহ, শায়খ ফরগালী, ইউছুফ তেলওয়াত, ইব্রাহিম তাইয়েব ও হিন্দাভী দুয়াইরকে ফাঁসি দিয়ে শহীদ করা হয়েছে। এ সমস্ত নেতৃবৃন্দ ছিলেন শহীদি কাফেলা আল ইখওয়ানুল মুসলেমীনের প্রথম কাতারের সৈনিক।

জয়নাব আল-গাজালীকে গ্রেফতারের সময় তাঁর সাথে অত্যন্ত জঘন্য ব্যবহার করা হয়। তাকে ধাক্কা মেরে গাড়ীতে উঠতে বাধ্য করা হয়। ইতিপূর্বে তাকে হত্যা করার লক্ষ্যে নাসেরের নির্দেশে তাঁর পোষ্য গোলামেরা জয়নাব আল গাজালীর গাড়ীর উপরে হামলা চালায়। ফলে তাঁর পায়ের হাড় ভেঙ্গে যায়। রক্ত পিচ্ছিল পথের এই মহিলা যাত্রীকে নিয়ে নাসেরের জল্লাদ বাহিনী সামরিক কারাগারে আবদ্ধ করে। গোটা কারাগারের প্রতিটি কক্ষ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের দ্বারা পরিপূর্ণ। নির্যাতন করার আধুনিক যাবতীয় সরঞ্জামের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে এই কারাগারে। এই কারাগারকে ফেরাউন নাসেরের ঘৃণ্য অনুসারীরা বলতো "নাসেরের জাহান্নাম।"

কারাগারের প্রতিটি কক্ষে মিশরের সম্মানিত নাগরিক ইখওয়ানের কর্মীদের উপরে চলছে লোমহর্ষক বর্বর নির্যাতন। আল্লাহর দ্বীনের কোন মুজাহিদকে পা উপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় রক্ত পিচ্ছিল পথের এই সমস্ত সাহসী যাত্রীদের উপরে পড়ছে হান্টার আর চাবুকের অবিরাম বর্ষণ। কোন কক্ষের মধ্যে উত্তাপ উৎপাদনকারী যন্ত্রের সাহায্যে প্রচন্ড তাপ সৃষ্টি করে সেই বদ্ধ কক্ষে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বন্দী করে রাখা হয়েছে, কাউকে দুর্গন্ধময় প্রচন্ড ঠান্ডা পানির মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হয়েছে। লোহার শলাকা উত্তপ্ত করে কারো দেহে দাগ দেওয়া হচ্ছে, কারো দেহ থেকে গোস্ত কেটে রক্ত বের করে কুকুরকে খেতে দেওয়া হচ্ছে, কারো দেহের উপরে ক্ষুধার্ত হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে, কুকুরেরা ইখওয়ানের কর্মীদের দেহ থেকে গোস্ত খুবলে খুবলে তুলে খাচ্ছে। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে যারা জ্ঞানহারা হয়ে পড়ে যাচ্ছে, তাদেরকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করা হচ্ছে। পাষন্ড ডাক্তার তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে এনে আরো নির্যাতন সহ্য করার উপযুক্ত বলে যখন সার্টিফিকেট দিচ্ছে, তখন ফেরাউনের জল্লাদ বাহিনী দ্বিগুণ উৎসাহে আল্লাহর পথের নির্ভীক মুজাহিদদের প্রতি হিংস্র হায়েনার মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে।

দিনের পর দিন অতিবাহিত হচ্ছে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে সামান্য এক টুকরো শুকনো রুটি দূরে থাক– এক বিন্দু পানি পর্যন্ত দেওয়া হচ্ছে না। মলমূত্র ত্যাগ করতে না দিয়ে হাত–পা বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে মাথায় গরম পানি এবং দেহে আগুনের ছেকা দেওয়া হচ্ছে। সীমাহীন নির্যাতনে যারা শাহাদাত বরণ করছে তাদের পবিত্র দেহকে সামরিক কারাগারের হিংস্র কুকুরদের মধ্যে ছুড়ে ফেলা হচ্ছে। ইসলামী আন্দোলনের শহীদি কাফেলা ইখওয়ানুল মুসলেমীনের নেতা কর্মীদেরকে সদ্যজাত শিশুদের মত উলঙ্গ করে পূর্বের আঘাতের রক্তাক্ত চিহ্নগুলোর উপরে পৈচাশিক কায়দায় হান্টার আর চাবুকের নির্মম আঘাত করা হচ্ছে। গোটা কারাগার থেকে ইখওয়ানের কর্মীদের দেহের রক্ত ড্রেন দিয়ে প্লাবণের পানির মত বেরিয়ে আসছে। জেলখানার বহুদূর থেকেও শোনা যাচ্ছে আল্লাহর পথের মুজাহিদদের হৃদয় বিদারী করুণ আর্তনাদ।

মিশরের ফেরাউন জামাল আব্দুন নাসেরের কারাগারের নির্যাতনের সামান্য চিত্র উপরে উল্লেখ করা হলো। পৃথিবীর সৃষ্টি লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত ইতিহাসের কোন অধ্যায়ে এ ধরনের নির্মম বর্বরতার কোন নজির দেখতে পাওয়া যায় না। যাদের উপরে এ ধরনের পৈচাশিক নির্যাতন চলছে তাঁরা কোন মামুলি ব্যক্তি নয়। এরা সবাই দেশ ও সমাজের সেই সমস্ত নৈতিক চরিত্রবান উত্তম মানুষ, যাদেরকে দেশের গোটা জাতি তাদের অনুসরণীয় মনে করে। নির্যাতন ভোগকারী রক্ত পিচ্ছিল পথের এই যাত্রীদের মধ্যে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, বৈমানিক, সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার, নৌবাহিনীর কর্মকর্তা, ক্রীড়াবিদ, আলেম ওলামা থেকে শুরু করে কুলি, মজুর, ব্যবসায়ী, পেশাজীবি ও গৃহবধুও আছেন।

কি এদের অপরাধ? কোন অপরাধের কারণে ইসলামী আন্দোলনের এই সমস্ত মুজাহিদদের উপরে চলছে নির্মম নিষ্ঠুর পৈচাশিক নির্যাতন? তাদের একমাত্র অপরাধ, তাঁরা কুরআনের কথা বলে। এদের অপরাধ, এরা নিজেরা আল্লাহর আইন মেনে চলে। এই মুজাহিদদের একমাত্র অপরাধ এরা মানুষের তৈরী জুলুম মূলক মতবাদের শোষণ থেকে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করে আল্লাহর দেওয়া জীবন বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। এদের অপরাধ এরা অন্ধকারে আলোর শিখা প্রজ্জলিত করে। এরা নির্যাতিত হওয়ার একমাত্র কারণ, দেশ ও জাতির ঘোর অমানিশার ক্রান্তিলগ্নে এরা মুক্তির মশাল হাতে মজলুম মানবতাকে মুক্তির পথ দেখায়। আল কুরআনের ভাষায়ঃ "ওয়া মা নাকামু মিন হুম ইল্লা আইয়ুমিনু বিল্লাহিল আযিযিল হামিদ," আল্লাহ বলেনঃ এরা ঐ

মহামহিয়ান– গরিয়ান চরম প্রশংসিত আল্লাহকে বিশ্বাস করে এটাই এদের অপরাধ।

মিশরের এই কারাগারের জল্লাদদের অন্যতম জল্লাদ ছিল হামযা বিসিউনি আর শামসবারদান। এদেরই এক ঘৃণ্য অনুসারী ছিল বাংলাদেশে ১৯৭১ সনে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের জেলার বাবু নির্মল রায়। তিনি আক্ষরিক অর্থেই জেলখানাকে 'নিমূল' (?) করে ছাড়েন। দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের দিয়ে বাংলাদেশের কারাগারগুলো পরিপূর্ণ করা হয়। জড়বাদী ভারতের বাহ্মন্যবাদের দোসর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধ্বজাধারীরা তখন দেশের ক্ষমতার মসনদে আসীন। নির্মল বাবু দেশে তাঁর পছন্দের সরকার পেয়ে জেলখানায় বন্দী ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের বিরুদ্ধে এক ঘৃণ্য 'নির্মূল' অভিযান শুরু করেন।

মিশরের সামরিক কারাগারে জয়নাব আল গাজালীকে আবদ্ধ করা হলো। শুরু হলো তাঁর উপরে ফেরাউন নাসেরের নির্দেশে ইতিহাসের বর্বর নির্যাতন। তাঁর পায়ে লোহার শিকল লাগিয়ে উল্টো করে জবাই করা পশুর মত ঝুলিয়ে দেওয়া হলো। তাঁর কোমল শরীরে বৃষ্টির মত পড়তে লাগলো হান্টার আর চাবুকের আঘাত। কয়েক মিনিট পর পর আগুনের ছেকা। গোস্ত পোড়া গন্ধে আর নারী কণ্ঠের করুণ আর্তনাদে মিশরের আসল ফেরাউনের মমিগুলোর চোখ থেকেও বোধ হয় পানি ঝরছে। আল্লাহর পথের এই মহিলা মুজাহিদের আর্তচিৎকারে মিশরের পিরামিডে শায়িত লাশগুলোরও ঘুম বোধ হয় ভেঙে যাচ্ছে। কয়েকদিন যাবৎ চললো এ ধরনের নির্মম অত্যাচার। তারপর তাঁর অচেতন দেহ নিক্ষেপ করা হলো হিংস্র ভয়াল দর্শন কুকুরের মধ্যে।

অকথ্য নির্যাতনে তাঁর কোমল শরীর থেকে ঝর্ণার মত রক্ত ঝরতে থাকে। গোটা শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়ে শরীর ফুলে যায়। ছয় সাত দিন যাবৎ বিছানাপত্র ছাড়াই এককক্ষে মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে ফেলে রাখা হয়। এ সময় কোন খাবার বা একবিন্দু পানিও দেওয়া হয়নি। এমনকি মিশরের সর্বজন শ্রদ্ধেয়া এই সম্মানিতা মহিলাকে মলমূত্র পর্যন্ত ত্যাগ করতে দেওয়া হয়নি। তাঁর জ্ঞান ফিরে আসলে তিনি শুনতে পান আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদদের করুণ আহাজারি। নামাজ আদায় করতে চাইলে আল্লাহর দুশমন কমিউনিস্টরা তাকে বুট পরিহিত অপবিত্র পা দিয়ে লাথি মারে। পুনরায় তাকে জল্লাদ শামৃস বারদানের কাছে তলব করা হয়। নির্যাতনের আঘাতে গোটা শরীরে অসহনীয় ব্যাথার ফলে তিনি হাঁটতে অক্ষম হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় তাকে টেনে হিচ্‌ড়ে নেওয়া হয়। চলতে

থাকে তার উপরে কিল ঘুষি লাথি আর হান্টার ও চাবুকের বর্ষণ। চাবুকের প্রতিটি আঘাতে তার শরীর থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসতে থাকে। তাকে বলা হয়, তুমি ইসলামী আন্দোলনের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিলেই তোমাকে মুক্তি দেওয়া হবে। তিনি তা দৃঢ়কণ্ঠে অস্বীকার করেন।

শুরু হয় আবার নির্যাতন। তিনি জ্ঞানহারা হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। আল্লাহর দ্বীনের এই মহিলা কর্মীর পবিত্র রক্তে কারাকক্ষ সিক্ত হয়ে উঠে। তাকে কারাগারের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে জ্ঞান ফিরে এলেই প্রথমে তাঁর স্মরণে আসে নামাজের কথা। গোটা দেহ আগুনের মত জ্বলছে, পরনের কাপড় রক্তে লাল হয়ে গেছে। বিন্দু পরিমাণ নড়াচড়া করতে গেলে মনে হয় শরীরের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলো ছিটকে পড়বে। তিনি ইশারায় নামাজ আদায় করেন। আবার তাকে এমন এক কক্ষে বন্দী করা হয় যে কক্ষে আগুন উৎপাদন করা হচ্ছে। আগুনের প্রচন্ড তাপে তিনি ছুটাছুটি করতে থাকেন আর মুখে আল্লাহ নামের জিকির করতে থাকেন। সেখান থেকে বের করে তাকে পুনরায় আল্লাহর দ্বীনি আন্দোলনের শহীদি কাফেলা আল ইখওয়ানের বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতি দিতে বলে নাসের সরকার। প্রতিদানে তাকে মিশরের সমাজ কল্যাণ মন্ত্রীর পদ দেওয়ার প্রলোভন দেওয়া হয়। তিনি ঘৃণার সাথে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।

শুরু হয় পুনরায় লোমহর্ষক নির্যাতন। হান্টার আর চাবুকের আঘাত, আগুনের ছেকা, কুকুরের কামড়, বুটের লাথি আর অকথ্য গালি। নির্যাতনের এক পর্যায়ে তিনি আবার জ্ঞানহারা হয়ে পড়েন। এবার তাকে নিক্ষেপ করা হয় পঁচা পূঁতি গন্ধময় পানির মধ্যে। দিনের পর দিন এ ভাবে তাকে পানির মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করে রাখা হয়। তিনি ইশারায় নামাজ আদায় করেন। শহীদি কাফেলার এই সাহসী যাত্রী ইসলামের জন্য সব ধরনের নির্যাতন সহ্য করার শক্তি কামনা করতে থাকেন মহান আল্লাহর কাছে। প্রতিদিন তাঁর চোখের সামনে তাঁরই প্রাণপ্রিয় সংগঠন ইখওয়ানুল মুসলেমীনের তরুণ যুবক কর্মীদের এনে তাদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতন চালানো হয়। নির্যাতনের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তাঁরা তাঁর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আম্মা, আম্মা, বলে চিৎকার দিয়ে বলতে থাকেঃ "আম্মা, আমরা সত্য পথের যাত্রী। বাতিল আমাদেরকে শহীদ করা ছাড়া তার বেশী কিছু করতে পারবেনা। আর শাহাদাত বরণ করাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য। আপনি হিম্মত হারা হবেন না।"

ঈমানের শক্তির মূল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হলে জীবনের এই কঠিন মুহূর্তেও সত্যের উপরে প্রতিষ্টিত থাকা যায়। কল্পনা করা যায় রক্ত গোস্তে গড়া কোন শরীর এ ধরনের লোমহর্ষক নির্যাতন সহ্য করেও সত্যের উপরে দৃঢ় থাকে? রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রীরা সব ধরনের নির্যাতন হাসি মুখে বরণ করে নেওয়ার মানষিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেই শহীদি মিছিলে শামিল হয়। কারণ এরা জানে, মুসলমানের-জীবন শুরুই হয় মৃত্যু যবনিকার অন্তরাল থেকে। শাহাদাত বরণ করার অদম্য দূর্বার আকাংখা নিয়েই এরা ইসলামী আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে পা রাখে। এদের রক্তের প্লাবনেই ভেসে যায় শোষকের ক্ষমতার মসনদ। সেখানে উড়তে থাকে শোষিত নিপড়ীত ও নির্যাতিত জনতার মুক্তি সনদ আল ইসলামের বিজয় কেতন।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ধরে চলতে থাকে ইসলামের এ মহান সেবিকার উপরে পৈচাশিক নির্যাতন। শত নির্যাতনেও তিনি যখন বাতিলের কাছে মাথানত করলেন না তখন তাকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়। তিনি আম্লান বদনে বললেনঃ "আল হামদুলিল্লাহ্, আমি শাহাদাতের প্রত্যাশায় অপেক্ষমান।" পুনরায় তাঁর উপরে শুরু হয় চাবুকের কঠিন আঘাত। আঘাতে আঘাতে তিনি চেতনা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। জয়নাব আল গাজালীর বিরুদ্ধে অভিযোগ খাড়া করলো বাতিল শক্তি, তিনি ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নাকি নাসেরকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। আসলে বাতিল শক্তি প্রতিটি যুগেই সত্যের টুটি চেপে ধরার লক্ষ্যে এ ধরনের বানোয়াট অভিযোগেই ইসলামী আন্দোলনকে অভিযুক্ত করে তার গতি পথ রুদ্ধ করতে চেয়েছে। অবশেষে ফেরাউন নাসের বিচারের নামে প্রহসন করে শতাব্দীর শ্রেষ্ট সন্তান সাইয়েদ কুতুব, আব্দুল ফাত্তাহ ইসমাইল ও মুহাম্মদ হাওয়াশকে ফাঁসিতে ঝুলায়। অসংখ্য নেতা কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ বিভিন্ন মেয়াদের কারাবাস দেওয়া হয়। সাইয়েদ কুতুবকে যখন ফাঁসিতে ঝুলানো হয় তখন তার বোন হামিদা কুতুবও সামরিক কারাগারে নির্যাতন ভোগ করছিলেন। তিনিও ইসলামী আন্দোলনের মহিলা বিভাগের অন্যতম নেত্রী।

জয়নাব আল গাজালী ও হামিদা কুতুবকে ২৫বছরের কারাদন্ড দেওয়া হয়। লোমহর্ষক নির্যাতনের বেড়াজাল অতিক্রম করে জয়নাব আল গাজালী ও হামিদা কুতুবসহ মিশরের অগণিত মহিলা কর্মীরা ইসলামী আন্দোলনের রক্ত পিচ্ছিল পথে দৃঢ়পদে অবস্থান গ্রহণ করেন।

পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী চক্র এবং সমাজবাদী লাল সাম্রাজ্যবাদী বাতিল গোষ্ঠি ও জড়বাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির নির্মম নির্যাতন, শোষণ এবং ষড়যন্ত্র থেকে কোটি কোটি বঞ্চিত নিপড়ীত মানব সন্তানকে মুক্তি –শান্তি ও সমৃদ্ধির সোনালী মঞ্জিলে পৌছিয়ে দেওয়ার বলিষ্ঠ শপথ নিয়ে আজ বিশ্বের দিকে দিকে ইসলামী আন্দোলনের শহীদি কাফেলার বিপ্লবী কর্মী বাহিনী আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। বাতিলের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে এ আন্দোলন মুসলিম বিশ্বের সীমান্ত পেরিয়ে শ্বেত পুঁজিবাদী, জড়বাদের মোড়কে ব্রাহ্মণ্যবাদী ও লাল সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় দুর্গের ভিতও কাঁপিয়ে তুলেছে। রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রীরা আল্লাহর পৃথিবীতে আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েম করে সর্বমানবতার মৌলিক অধিকার এবং স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার বজ্র প্রতিজ্ঞায় তাঁরা বদ্ধ পরিকর।

ইসলামী আন্দোলনের দুর্গম পথে একদিকে যেমন সচেতন প্রান উচ্ছল যুবক তরুনেরা শাহাদাতের গান গেয়ে এগিয়ে চলেছে, তেমনি পাশাপাশি তাওহিদী সুরের জাগরণী ঝংকার তুলে এগিয়ে এসেছে সত্যের দ্যুতি অগ্নি দুলালী বোনেরাও। আরব বিশ্বের কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর শিখন্ডী এবং সাম্রাজ্যবাদী চক্রের ক্রীড়নক হিসাবে ফেরাউন নাসের যখন মিশরের মুক্তিকামী জনগণের উপর অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে সন্ত্রাস ও বর্বরতার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করছিল, তখন রক্ত পিচ্ছিল পথের পুরুষ যাত্রীদের বিপ্লবী কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মহিলা যাত্রীরাও সিংহীর ন্যায় গর্জন করে উঠেছিল।

আজ প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বাতিল শক্তিবর্গ ইসলামী আন্দোলনকে স্তব্দ করার ষড়যন্ত্র করছে। তাঁরা সত্যের পতাকাবাহী বিপ্লবী মুজাহিদদের সমূলে উৎখাত করার প্রতিজ্ঞা করেছে। কারণ ইসলামী আন্দোলনের মর্দে মুজাহিদরা আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের বজ্র শপথ গ্রহণ করেছে। তাঁরা বাতিলের রক্ত চক্ষু উপেক্ষা করে ঘোষণা করেছে, আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের সুন্নাহ্ মুলতবী হয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকায়ে বন্দী থাকার জন্যে আসেনি বরং তার প্রতিটি অক্ষর দৃঢ়ভাবে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যে এসেছে।

ইসলামী আন্দোলনের পথ অত্যন্ত দুর্গম, এ পথ ধৈর্য্য ও সহনশীলতার কন্টকাকীর্ণ পথ। কোন ভীরু কাপুরুষ এ পথের যাত্রী হতে পারেনা। এ রক্ত পিচ্ছিল পথে তাঁরা পা পিছ্লে পড়ে যায়। আল কুরআনে কোন ভীরু কাপুরুষদের জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। আন্দোলনের ঈশান কোণে কালবৈশাখীর রুদ্র মেঘের অশনি সংকেত দেখলে যাদের হৃদকম্পন শুরু হয় সে সমস্ত দুর্বল ভীরু চিত্তের

অধিকারী ব্যক্তিদের জন্যে ইসলামী আন্দোলনের পথ নয়। এ পথের শেষ ঠিকানায় পৌছাতে যে মঞ্জিল পড়বে সে মঞ্জিল হলো, কারাগারের তমাসাচ্ছন্ন, কালো কুঠুরী, পৈচাশিক ও অমানষিক নির্যাতন, নিষ্ঠুর প্রাণ জল্লাদের চাবুকের নৃসংশতা সহ নির্যাতনের আধুনিক যাবতীয় সরঞ্জামাদীর সমাবেশ নির্মম ভঙ্গীতে স্বাগতম জানাবে এ পথের যাত্রীদের। যারা দুঃসাহস, ধৈর্য্য ও অসীম ত্যাগের মানসিকতা নিয়ে এপথে যাত্রা শুরু করবে তারাই এর শেষ ঠিকানায় পৌছতে পারবে।

এ কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, সমস্ত মানুষের সত্যিকার সাফল্য ও স্বার্থকতা নির্ভর করে ইসলামী আন্দোলনের সাফল্য ও স্বার্থকতার উপর। তাওহিদী আদর্শ শিক্ষা- দীক্ষা এবং আল্লাহর সাথে যথার্থ সর্ম্পক কায়েমের মাধ্যমে মুসলিম মিল্লাতকে তাঁর পূর্ণ যোগ্যতার সাথে ইসলামী কল্যাণ রাষ্ট্র পূনঃ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তীব্র সংগ্রামের মাধ্যমে বিভ্রান্তি ও জটিলতা সৃষ্টিকারী বিভিন্ন ধরনের মতবাদ মতাদর্শ, মূর্খতাপূর্ণ জড়বাদের কুসংস্কার ও রীতি নীতিকে উচ্ছেদ করতে হবে। এভাবেই পৃথিবীর বুক থেকে খোদাদ্রোহী ও অত্যাচারী লোকদের প্রভূত্ব মূলোৎপাটিত হবে। মানুষের উপর মানুষের কর্তৃত্বের অবসান ঘটবে। কেবল তখনই সোনালী যুগের সাহাবাদের সমাজের মতো জীবনের প্রকৃত রূপ তার বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে পূর্ণ প্রতিষ্টিত হবে।

মনে রাখতে হবে, বাতিল শক্তির পিরামিডের উপরে ইসলামের বিজয় কেতন উড়বেই ইনশাল্লাহ। কিন্তু এ বিজয় কেতন উড়ানোর জন্য কোন তাড়াহুড়া বা সময় নির্ধারণ করতে গেলে বিপর্যয় নেমে আসার সমূহ সম্ভাবনা আছে। ইসলামী আন্দোলনের রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের জীবনে তাড়াহুড়ার কোন গুরুত্ব নেই। এটার দিকেই সর্বদা অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ থাকতে হবে যে, ভুল ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থেকে এ অভিযাত্রীরা মঞ্জিলে মকছুদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কি–না? নির্যাতন এ পথের ঐতিহাসিক দাবী। বাতিলের বিরুদ্ধে যারা আপোষহীন সংগ্রামী, নির্যাতন তাদের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে আসে। এ পথের পথিকদের উপরে নির্যাতন আসা সৌভাগ্যের ব্যাপার। সবার ভাগ্যে নির্যাতন নামক এ নেয়ামত জোটে না।

শাস্তির পৈচাশিক রূপ, যন্ত্রণার কন্টক যুক্ত শাখা, বাতিল কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত জল্লাদ ও নির্যাতন বিশেষজ্ঞদের গবেষণাগারের নামই হচ্ছে পৃথিবীর জাহান্নাম। এই জাহান্নাম থেকে বেরিয়ে এসে যারা আবার বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা দেয়ঃ "আল্লাহর কুরআন ও নবীর সুন্নাহ্কে আমরা ক্ষমতার শীর্ষে না পৌছানো

পর্যন্ত নিরব হবোনা, নিস্তব্দ হবোনা," তাঁরাই তো সফলকাম- স্বার্থক জীবনের অধিকারী। সুতারাং শহীদি কাফেলার দুর্গমপথের যাত্রীদেরকে দূর্বার গতিতে এগিয়ে যেতে হবে। আন্দোলনের কাজে কোন ক্রমেই শিথিলতা আসতে দেওয়া যাবেনা। কোন অর্থেই গতি মন্থর হবেনা এবং পিছু হটা চলবেনা।

বাতিল যেথায় নতশির

পথহারা পথিক যখন সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে তখন তাকে নির্যাতন বা প্রলোভন দিয়েও সত্য পথের দিক থেকে তাঁর গতি ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। যে কোন ত্যাগের বিনিময়ে হলেও সে তাঁর কাংখিত পথের দিকেই দূর্বার বেগে অগ্রসর হয়। প্রতিটি নদীর লক্ষ্য সাগরের সাথে মিলিত হওয়া। চলার পথে নদী যদি বাঁধা প্রাপ্ত হয়, তাহলে নদী বাধ্য হয় তার দু'কূল প্লাবিত করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে। তেমনি কোন মানুষ যখন অন্ধকার জগত থেকে আলোর জগতের সন্ধান পায়, সে তখন দূর্বিনীত গতিতে আলোর পথেই ফিরে আসে। বাতিলের তমসাবৃত আবরণ ভেদ করে সত্যের মহাজাগতিক উজ্জল রশ্মির কিরণচ্ছটা যখন মানুষের হৃদয় জগতের অতল তলদেশ পর্যন্ত আলোকিত করে তুলেছে, তাওহীদের জ্যোতির্ময় দীপ্ত প্রভার শিখা শত শত বাহু মেলে মানুষের মন-মস্তিষ্ক বেষ্টন করেছে, তখন সে মানুষ দুঃখ-বেদনা, নির্যাতন-নিস্পেষণ, অভাব-অনটন, প্রলোভন-বঞ্চনার উর্ধের জগতে অবস্থান গ্রহণ করে বিপুল আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

ইতিহাসে দেখা যায় ঈমানের আলোয় আলোকিত হওয়ার পরে ঈমানদার- বাতিল কর্তৃক নিষ্ঠুরভাবে আক্রান্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে ইতিহাসের ধারা পরিক্রমায় ইসলামী আন্দোলনের কর্মীর অটল ঈমানের কাছে বাতিল মাথানত করতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাস বাতিলের নিষ্ঠুর কাহিনী ঘৃণা ও বেদনার সাথে সভ্যতার সামনে পেশ করেছে। আর ঈমানদার সত্যাশ্রয়ীদের আত্মত্যাগের স্বর্ণোজ্জল কাহিনী শ্রদ্ধা ও সম্মানের সাথে ইতিহাস উচ্চে তুলে ধরেছে। খোদায়ী দাবীদার ফেরাউনের অন্ধকার জগতে বাস করেও ফেরাউন স্ত্রী হযরত আছিয়া (আঃ) যখন হযরত মূছা (আঃ) এর কাছে থেকে মহাসত্যের সন্ধান পেলেন তখন তিনি কালবিলম্ব না করে সেই মহাসত্য গ্রহণ করলেন। শুরু হলো তাঁর উপরে ফেরাউনের পক্ষ থেকে নির্মম নিষ্ঠুর লোমহর্ষক নির্যাতন।

তাঁর চোখের সামনে কলিজার টুকরা সন্তানদেরকে পৈচাশিক কায়দায় হত্যা করা হলো। সন্তানদের মা, মা বলে করুণ আর্তনাদ তিনি নিজ কানে শ্রবণ

করেছেন। নির্যাতনের বিভৎস রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কিন্তু মহাসত্যের উপর থেকে বিন্দু পরিমাণ সরে আসেননি। তাঁর সন্তানদের দুনিয়া থেকে অকথ্য অত্যাচারের মাধ্যমে বিদায় করে দিয়ে এবার তাঁর উপরে নেমে এলো ফেরাউনের ঘৃণ্য অত্যাচার। প্রশস্ত কাঠের উপরে ঘন করে লোহার তীক্ষ্ণ পেরেক আটকিয়ে সেই পেরেকের উপরে হযরত আছিয়া (আঃ) কে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে ইসলামী আন্দোলন ত্যাগ করবে কি-না বলো? তিনি সেই চরম মুহূর্তেও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুছা কালিমুল্লাহ।

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহের উপরে আঘাত শুরু হয়েছে। আঘাতের চাপে তাঁর পিঠের নীচ থেকে তীক্ষ্ণ সরু পেরেকগুলো কোমল শরীর ভেদ করে হাড়ে গিয়ে বিদ্ধ হয়েছে। তবুও তিনি বাতিলের কাছে মাথানত করেননি। শাহাদাতের অমূল্য পেয়ালা পান করে তিনি তাঁর মহান বন্ধু আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। পরিশেষে সত্যের মুকাবিলায় বাতিল ফেরাউন লাঞ্ছিতাবস্থায় নীল নদীতে সলিল সমাধি বরণ করতে বাধ্য হয়েছে। সত্যের পতাকাবাহী মূসা (আঃ) ও তাঁর অনুসারীদের নিয়ে যখন নীল নদীর তীরে বাতিলশক্তি ফেরাউন কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁর সঙ্গীরা ভয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে। বাতিলশক্তি ফেরাউনের কাছে আত্মসমর্পণ করলেই প্রাণ বাঁচানো সম্ভব। এ ছাড়া সামনে দ্বিতীয় কোন পথ খোলা নেই। হযরত মূসা (আঃ) প্রশান্ত চিত্তে সঙ্গীদেরকে শান্ত্বনা দিয়েছেনঃ চিন্তার কোন কারণ নেই, মহান আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করবেন।

যথা সময়ে আল্লাহর সাহায্য পৌছিয়েছে, মহাসমূদ্রে পথ সৃষ্টি হয়েছে। সত্য বিজয়ী হয়েছে। বাতিলশক্তি দাম্ভিক ফেরাউন সদলবলে মুখ থুবড়ে ধ্বসে পড়তে বাধ্য হয়েছে। ইব্রাহিম (আঃ) যখন ইসলামী আন্দোলনের সূচনা করলেন তখনও মহাপ্রতাপশালী বাতিলশক্তি খোদায়ী দাবীদার নমরূদ শিশু আন্দোলনের টুটি চেপে হত্যা করার লক্ষ্যে তাঁর হিংস্র দন্ত নখর বিস্তার করেছে। নির্যাতনের স্টীম রোলার চালিয়েও যখন ইসলামী আন্দোলনের গতিস্তব্ধ করা যায়নি, তখন নমরূদ মহাসত্যের বাণী বাহক হযরত ইব্রাহিম (আঃ) কে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে সত্যের দৃপ্তকণ্ঠ চিরতরে নিথর করতে চেয়েছে।

ইতিহাস কথা বলে, এখানেও সত্যের বিক্ষুব্ধ ঘূর্ণির সামনে অত্যাচারী দাম্ভিক বাতিলশক্তি নমরূদ জুতা পেটা খেয়ে লাঞ্ছিত হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনকে শত্রু মনে করে যারাই এই মহান আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে তাদেরকে ইতিহাস ক্ষমা করেনি। নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছে। হুতাশনের প্রজ্জ্বলিত শিখা যখন উদ্বাহু নৃত্য করতে করতে এসে সত্যের বাহক ইব্রাহিম (আঃ) কে গ্রাস করতে চেয়েছে তখনও

তিনি অসীম নির্ভরতায় মহান আল্লাহর সাহায্য কামনা করেছেন। বাতিলের কাছে মাথানত করেননি। রব্বুল আলামীন তাঁর কুদরতী ব্যবস্থা দিয়ে অনলকুন্ড পুষ্প উদ্যানে পরিণত করেছেন।

নবী সম্রাট ইসলামী আন্দোলনের আল্লাহ কর্তৃক নির্বাচিত বিশ্ব নেতা জনাবে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যখন বাতিল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছেন তখন তিনি অস্ত্রবল জনবল কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে একমাত্র আল্লাহর উপরে নির্ভর করেছেন। ইতিহাস সাক্ষী, ইসলামী আন্দোলনের দুর্বার গতিবেগের সামনে মাত্র অর্ধ শতাব্দীর ব্যবধানে গোটা পৃথিবীর বাতিলশক্তি থর থর করে কেঁপে উঠেছে। পৃথিবীর দিক–দিগন্তে মহসত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মহানবী (সাঃ) এর বিংশ শতাব্দীর যোগ্য অনুসারী ইমাম মওদূদী (রাহঃ) কে ফাঁসির মঞ্চে নিয়েও বাতিল তাকে মাথানত করাতে ব্যর্থ হয়েছে। অবশেষে বাতিলই মওদূদীর সামনে শির নোয়াতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যখন ফাঁসির রশিকে তাদের পায়ের গোলাম মনে করেছে, কামানের গোলা আর বুলেটের তপ্ত শিশাকে হাসি মুখে স্বাগত জানিয়েছে তখন সত্য বিজয়ী হয়েছে। ইরানের আবাল বৃদ্ধ বনিতারা যখন মৃত্যুকে তাদের পায়ের ভৃত্য মনে করে বাতিল শক্তি আমেরিকার পদলেহী রেজাশাহ পাহলভীর গুলী বোমা আর কামানের গোলার সামনে সারিবদ্ধভাবে শিশাঢালা প্রাচিরের মত দাঁড়িয়ে গেছে তখন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আল কুরআনের রাজ।

ইসলামী আন্দোলনের রক্তঝরা ময়দানে রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী হিসেবে পুরুষেরাই শুধু ময়দানে আসেনি। অবরোধবাসিনী মা বোনেরা তাদের শিশু সন্তানদের কোলে নিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠার দাবীতে শাহাদাতের উদগ্র কামনায় ইরানের রাজপথে নেমে এসেছে। আটলান্টিক মহাসাগরের উর্মিমালার মত লক্ষ লক্ষ জনতার তরঙ্গে বাতিলশক্তি ভেসে যেতে বাধ্য হয়েছে। রেজাশাহ পাহলভী বাতিলশক্তিকে টিকিয়ে রাখার স্বার্থে তাঁর সৈন্যবাহিনীকে আদেশ দিয়েছে ইসলামী জনতার মিছিলে কামান দেগে মিছিল উড়িয়ে দিতে।

বাতিলশক্তি কামান দেগে মিছিল উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। ইরানের রাজপথে তাওহীদের নিরস্ত্র সেনাবাহিনীর রক্তের প্লাবন সৃষ্টি হয়েছে। কামানের গোলার আঘাতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের সামনের সারি ঢলে পড়ার সাথে সাথে পিছনের সারি এসে সে শুন্যস্থান পূরণ করেছে। মহাসাগরের তরঙ্গমালার মত একটির পর একটি তরঙ্গ এসে সাগরের তীরে আছড়ে পড়ে পানির সাথে সে তরঙ্গ যেমন মিশে যায় তবুও অবিরাম গতিতে তরঙ্গ আসতেই থাকে, তেমনি ইরানের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা কামানের গোলা উপেক্ষা করে মিছিলের গতি সামনের দিকেই দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

ইরানের ইসলামী আন্দোলনের মহিলা কর্মীরা কামানের গোলা নিক্ষেপকারী সৈন্যদের দিকে ফুল ছুড়ে দিয়েছে আর বলেছেঃ "তোমরা আমাদের সন্তান, আমাদের ভাই। তোমাদের কামানের গোলাকে আমরা ফুল দিয়ে স্বাগত জানাচ্ছি। তোমাদের অস্ত্রের নিষ্ঠুর আঘাতে আমাদের কোমল দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে রাস্তায় পড়বে এতে আমাদের কোন আফসোস নেই। আমরা তোমদের অস্ত্র দেখে মৃত্যু ভয়ে ভীত নই, মৃত্যু আমাদের পায়ের ভৃত্য। হন্যে হয়ে আমরা শহীদি মৃত্যু খুঁজে ফিরছি। কত মারবে আমাদেরকে মারো। গোটা ইরান আমাদের লাশ বুকে ধারণ করে কবরস্থানে পরিণত হয় হোক, তবুও ইরানের বুকে আল–কুরআনের রাজ কায়েম না হওয়া পর্যন্ত আমরা সংসার জীবনে ফিরে যাবনা।

কুসুমাস্তীর্ণ পথে পুষ্প শয্যায় জীবন অতিবাহিত করলে আল–কুরআনের রাজ পাওয়া যায়না। আল–কুরআনের রাজ পেতে হলে শহীদি ঈদগাহে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে রক্তের আয়নায় ইসলামের বিজয় প্রতীক এঁকে দিতে হয়। সমরাঙ্গণ– ব্যটলফিল্ড পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকরা এসে সিপাহসালার ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ খোমেনীকে হতাশার সুরে বলেছেনঃ "আমরা দেখে এলাম যুদ্ধের ময়দানে শুধু লাশ আর লাশ। আর সে লাশগুলো হলো ইরানী তরুণ যুবকদের লাশ। তরুণ যুবকেরা এভাবে নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকলে তো গোটা ইরানী জাতি বিশ্ব সভ্যতা থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?" সাংবাদিক কর্তৃক এধরণের হতাশা ব্যঞ্জক মর্মান্তিক বর্ণনায় ইমাম খোমেনীর চিত্ত চাঞ্চল্য দেখা দেয়নি। তিনি শাহাদাতের আত্মপ্রত্যয়ে দৃপ্তকন্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ "যাকনা! সব শেষ হয়ে যাক। তবুও আগামী দিনের সভ্যতায় একটি দৃষ্টান্ত থাকবে ইরানী মুসলমানেরা ইসলামকে টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পৃথিবীর ঘৃণ্য শয়তানী শক্তি পুঁজিবাদের ধ্বজাধারী আমেরিকার সাথে মুকাবিলা করতে যেয়ে নিজেদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছে, তবুও খালেদ তারিকের উত্তরসুরী মুসলমানেরা বাতিলশক্তি আমেরিকার কাছে মাথা নত করেনি।"

এর নাম নেতৃত্ব, এর নামই ঈমান। মুসলমানদের কলিজার রক্তে সবুজ শ্যমল ধরিত্রী লোহিত বর্ণ, শাহানাবেশ ধারণ করতে পারে, তবুও তাঁরা ক্ষণিকের জন্যেও বাতিলের কাছে পরাজিত হতে পারেনা। আত্মসমর্পন, পরাজয়, ভীতি, হতাশা, মাথানত আর আপোষ নামক কোন শব্দ ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের অভিধানে নেই। সাংবাদিকরা পুনরায় যখন ইমাম খোমেনীকে বললেনঃ "গোটা পৃথিবী ইরানকে বয়কট করেছে, আমেরিকার নির্দেশে সব দেশ ইরানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করেছে, খাদ্য শস্য ইরানে তাঁরা

বিক্রয় করবেনা। এ অবস্থায় ইরানের জনগণ তো দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে। জনগণকে খেতে দিতে পারবেন না, ব্যয় বহুল যুদ্ধ চালাবেন কি করে?

সাংবাদিকদের কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহর সৈনিক ইমাম খোমেনী সিংহের মত গর্জন করে বললেনঃ "সাংবাদিকরা, তোমরা কোন জাতিকে খাদ্যের ভয় দেখাচ্ছো? যে জাতি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন কায়েম করার দৃপ্ত শপথে প্রয়োজনে গাছের পত্র পল্লব আহার করে জীবন ধারণ করেছে, তবুও বাতিল শক্তির সাথে আপোষ করেনি। আমরা সেই নবীর উম্মত। যে নবী (সাঃ) শিহাবে আবি তালেবে তিন বছর সাহাবাদেরকে নিয়ে গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করেছেন, যুদ্ধের ময়দানে দিনের পর দিন অনাহারে থেকে পেটে পাথর বেঁধে বাতিলের সাথে লড়াই করেছেন, তবুও শয়তানী শক্তির সামনে মাথানত করেননি। তোমরা সেই নবীর (সাঃ) অনুসারীদেরকে ভয় দেখাও?

মহাকালের ঘূর্ণয়মান চক্রের আবর্তন বিবর্তনে বাতিল এখানেও মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। দূতের আলখেল্লা পরিহিত ইসলামের দুশমণ আমেরিকার গুপ্তচরদেরকে ইরানের ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা যখন বন্দী করলেন তখন সেই গুপ্তচরদেরকে চুরি করে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আমেরিকা রাতের অন্ধকারে ইরানে হেলিকপ্টারের বহরে তথা কথিত "রেসকিউ" টিম (RESCUE TEAM) প্রেরণ করে। ইরানের মরুপ্রান্তরে সেই হেলিকপ্টারের বহর আল্লাহর গযবে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। গোটা পৃথিবীর সামনে চোর আমেরিকার ভদ্রতার মুখোশ উম্মোচন হয়ে পড়ে, তাদের ঘৃণ্য চৌর্য্যবৃত্তি মানুষের সামনে প্রকট হয়ে ধরা পড়ে।

বিংশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ ইমাম মওদূদী (রাহঃ) কে বাতিলশক্তি যখন ফাঁসির রশি তাঁর গলায় পরিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে, তখন তিনি দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেনঃ 'জীবন মৃত্যুর সিদ্ধান্ত আসমানে গ্রহণ করা হয় পৃথিবীতে নয়।' এখানেও বাতিল নতমস্তকে ইমাম মওদূদী (রাহঃ) এর সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। ইসলামী মহা সম্মেলনে বাতিলশক্তি গুলী বর্ষণ আরম্ভ করেছে। আন্দোলনের কর্মীরা ইমাম মওদূদী (রাহঃ) কে মঞ্চে বসে আত্মরক্ষার জন্যে অনুরোধ করছে। রক্ত পিচ্ছিল পথের নির্ভীক যাত্রী ইমাম মওদূদী (রাহঃ) আহত সিংহের মত গর্জন করে বলছেনঃ "লাখো জনতার মধ্যে থেকে আমি মওদূদীই যদি বসে পড়ি তাহলে দাঁড়িয়ে থাকবে কে?"

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের ঈমানের অগ্নির লেলিহান শিখার সম্মুখে বাতিল চিরদিনই পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ইমাম অধ্যাপক গোলাম আযমকে জন্মভূমিতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি দীর্ঘ সাত বছর। তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল

করে দিয়েছে জড়বাদী ভারতের পদলেহী ধর্মনিরপেক্ষ বাতিল গোষ্ঠী। ২২বছর যাবৎ তাকে "ষ্টেটলেস পারসন" (STATELESS PERSON) হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টা চলেছে। ইমাম গোলাম আযম বাতিলের কাছে তবুও মাথানত করেননি। অবশেষে পবিত্র রমজান মাসে ১৯৯২সনের ২৪শে মার্চ রাতের অন্ধকারে বাতিলশক্তি তাকে দেশ থেকে বহিস্কারের উদ্দেশ্যে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। গ্রেফতারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে রাজধানী ঢাকার ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা তাদের প্রিয় নেতা ইমাম অধ্যাপক গোলাম আযমের জীর্ণ কুঠিরের সামনের অঙ্গণ– মগবাজার কাজি অফিস লেনে সমবেত হতে থাকে।

বাতিল সরকারের পুলিশ বাহিনী ইমাম আযমকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। প্রিয় নেতার বিচ্ছেদ বেদনায় আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মী বুকফাটা আর্তনাদ করছে। তাদের চোখে অশ্রুর বন্যা। তাঁরা করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে ইমাম গোলাম আযমের সদাহাস্য উজ্জল পূর্ণিমার পূর্ণ শশীর মত চেহারার দিকে। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ বেদনায় কর্মীদের আহাজারি রাজধানী ঢাকার মগবাজারের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। আল্লাহর দ্বীনের মুজাহিদরা রাস্তার ধুলি– কাকরের মধ্যে তাদের দেহ এলিয়ে দিয়েছে। এই পথেই তো তাদের নেতাকে পুলিশেরা গাড়ীতে করে নিয়ে যাবে।

না! না! কিছুতেই না। নেতাকে তাঁরা ছিনিয়ে নিতে দিবেনা। তাদের দৃষ্টির পলক স্পন্দনহীন না হওয়া পর্যন্ত এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি ইমাম গোলাম আযমকে তাদের কাছে থেকে ছিনিয়ে নিতে সক্ষম। তাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও বাতিলের অশুভ চক্রান্ত ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা রুখবেই। তাদের লাশের উপর দিয়েই বাতিলশক্তি দীনে হকের সিপাহসালার ইমাম গোলাম আযমকে ছিনিয়ে নিতে পারে– তার পূর্বে নয়। তাই তাঁরা সারিবদ্ধভাবে তাদের নেতাকে বহনকারী পুলিশের গাড়ীর সামনে শুয়ে পড়েছে। সুন্দর স্নিগ্ধ সৌম্যদর্শন ইমাম গোলাম আযমের হাস্য উজ্জল নূরানী চেহারায় এতটুকু উদ্বেগ উৎকন্ঠা নেই।

সুধাকরের ন্যায় দীপ্তমান তাঁর অবয়বে আল্লাহর প্রতি গভীর নির্ভরশীলতার উজ্জল দ্যুতি রাতের নিকষ কালো অন্ধকারকেও যেন প্রভাময় করে তুলেছে। সে জ্যোতির্ময় নূরের শিখায় বাতিলশক্তির আজ্ঞাবহ পথভ্রান্ত পুলিশ বাহিনীও বোধহয় সত্য পথের সন্ধান পাচ্ছে। বিরহ বিধুর বেদনা কাতর উদ্বেগাকুল কর্মীদের মাঝে নেমে এলেন নেতা। তিনি হাসিমুখে শান্তকণ্ঠে ইসলামী আন্দোলনের সুশৃংখল কর্মীদেরকে শান্তনা দিয়ে বললেনঃ

"চোখের পানির অনেক দাম, আপনারা চোখের পানি এখানে ফেলবেন না। আল্লাহর কাছে চোখের পানি ফেলুন। সত্য পথের পথিকদের তো এটাই পাওনা। প্রতিটি যুগেই সত্যের বাহকদের সাথে বাতিলশক্তি এই ব্যবহারই করেছে। নবী রাসূলরাও এই ব্যবহার পেয়েছে। আর এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই তো দক্ষ নেতৃত্ব গঠন হয়। আপনারা ইসলামের নির্দেশানুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করুন। কোন বিশৃংখলতা প্রদর্শন করবেন না।"

ইমাম অধ্যাপক গোলাম আযমের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট যে, তিনি যখন বাতিলের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে কোন কথা বলেন তখন তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলী যেন দৃঢ় প্রত্যয়ে মহাসত্যের বিজয় চিহ্ন এঁকে দেয়। ইমাম এবার মিথ্যে শক্তির প্রতি হুংকার দিয়ে শাহাদাত আঙ্গুলী প্রদর্শন করে বলে উঠলেনঃ

"আমার জন্মস্থান হিসেবে এই বাংলাদেশকে আল্লাহ নির্বাচিত করেছেন। আমার অথবা কোন মানুষের ক্ষমতা নেই তাঁরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন দেশে জন্ম গ্রহণ করবে। সুতরাং আমার এই জন্মভুমি বাংলদেশে এমন কোন শক্তি নেই, যে শক্তি আমাকে এ দেশ থেকে বহিষ্কার করবে।"

গোটা পৃথিবীর বাতিল শক্তি যাকে চিরতরে স্তব্দ করে দেওয়ার লক্ষ্যে অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে, যার চিন্তা শক্তি ও বিপ্লবী কন্ঠকে নিথর ও স্পন্দনহীন করার জন্যে সমস্ত বাতিলশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, মিথ্যে শক্তি যখন তার হিংস্র দন্ত নখর বিস্তার করে যার কন্ঠের দিকে পৈচাশিক নৃত্য উল্লাসে অগ্রসর হচ্ছে, জড়বাদী ভারতের বাংলাদেশী পোষ্যপুত্র ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মহীন গোষ্ঠী যার ফাঁসি দাবী করছে, বিশ্বের বাতিলশক্তির অনুগত প্রচার মাধ্যমগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে যার বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক সংবাদ ইথারের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রচার করছে আর তাঁর কন্ঠে কি দৃঢ় প্রত্যয়! কি অপূর্ব আত্মবিশ্বাস! আল্লাহর প্রতি কি অসীম নির্ভরশীলতা! ঈমানের কি দূর্বার দুর্বিনীত শক্তি! কি অটল অবিচল স্থিরতা! বিশাল জলধির ন্যায় যার গম্ভীরতা।

ঈমানের এ ধরণের হিমালয়সম দৃঢ়তা প্রদর্শনেই বাতিল পরাভুত হয়, সত্যের বিজয় হয়ে উঠে অবশ্যম্ভাবী। এখানেও বাতিল পরাজিত হতে বাধ্য হলো। ইমাম গোলাম আযমের নির্দেশে ইসলামী আন্দোলনের সুশৃংখল কর্মী বাহিনী ধৈর্যের কঠিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলো ইতিহাসের অধ্যায়ে। নেতার নির্দেশে কর্মীরা দায়িত্ব পালনরত পুলিশের প্রতি বাধার সৃষ্টি করেনি। ইমাম গোলাম আযমের প্রতি বাতিলশক্তির এ ধরণের ন্যাক্কারজনক আচরণে গোটা পৃথিবীর তাওহীদবাদী জঙ্গীসৈন্যরা বারুদের মত গর্জে উঠে। বাদ প্রতিবাদ আর মিছিলের পর মিছিল চলতে থাকে পৃথিবীর দেশে দেশে আর বাংলাদেশের অবস্থা হয় যেন বিষ্ফোরনোম্মুখ আগ্নেয়গিরি।

ইমাম গোলাম আযমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে রক্ত পিচ্ছিল পথের সাহসী যাত্রীরা তাদের দৈনন্দিন কর্মকান্ড দূরে ছুড়ে সমূদ্র গর্জনে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তোলে। বাংলাদেশ পরিণত হয় মিছিলের দেশে। শহর নগর বন্দর গ্রাম গঞ্জ পাড়া মহল্লায় তাওহীদি জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে থাকেঃ এই মুহূর্তে নেতার মুক্তি চাই। সাগরের উত্তাল উর্মিমালার মতই মিছিল বাংলাদেশের আনাচে–কনাচে আছড়ে পড়ে। ইসলামের বিপ্লবী সিপাহীরা বজ্রমুষ্টি উত্তোলন করে বাতিলের প্রতি হুশিয়ারী প্রদর্শন করে। বাতিল তার ক্ষয়িষ্ণু শক্তি নিয়ে তাওহীদের সৈনিকদের কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেওয়ার লক্ষ্যে মরণ আঘাত হানে। ইসলামের সৈনিকদের তপ্তলহু নদী মাতৃক বাংলায় প্লাবন সৃষ্টি করে। ইসলামী আন্দোলনের অকুতোভয় কর্মীরা রক্তঝরা ময়দানে দেহের তপ্তরক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়ে ইসলামের দুশ্‌মনদের মুকাবিলা করে।

অবশেষে বাতিলশক্তি ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের নিরস্ত্র প্রতিরোধের মুখে অন্ধকার গহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্যহয়। শহীদি মিছিলের অপ্রতিরোধ্য বিপ্লবী কাফেলার ময়দানী শক্তি ও আইন যুদ্ধে বাতিল পরাজিত হয়ে লজ্জার আবরণে তাদের ঘৃণ্য চেহারা আড়াল করতে বাধ্যহয়। বাতিলের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের আবরণ ভেদ করে অন্ধকার কারা প্রকোষ্ঠ থেকে ইমাম গোলাম আযম নাগরিকত্ব সহ ইসলামী আন্দোলনের মুক্ত ময়দানে রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রীদের সাথে মিলিত হন।

কবি বলেন ঃ

বাতিলছে দাবনে ওয়ালে আঁয় আঁছমা নেহী হ্যায় হাম্
ছাওবারক্যর চুকা হ্যায় তো ইম্‌তেহান হামারা।

মিথ্যার কাছে কখনো আমরা মাথানত করিনি। হে আল্লাহ! তুমি তা অনেকবার আমাদেরকে পরীক্ষা করে দেখেছো।

–ঃ সমাপ্ত ঃ–

PP

প্রফেসর'স পাবলিকেশন্স

৪২৩, ওয়ারলেছ রেলগেইট, আল ফালাহ বিল্ডিং
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৪১৯১৫, ৮৩৫৮৭৩৪, ০১৭১-১২৮৫৮৬
e-mail : professors_pub@yhaoo.com